বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

GIFT

এম ফিল অভিসন্দর্ভ

২০০৫

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন

গবেষক

শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান

403530

DIGITIZED

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

এম ফিল অভিসন্দর্ভ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

403530

গবেষক
শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান

ডিসেম্বর ২০০৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

M.

403530

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

এম ফিল অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০০৫

403530

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান
৫১ নিউ সার্কিট হাউজ
ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
তারিখ ঃ জানুয়ারী ২০০৬

প্রত্যয়ন পত্র

শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১। এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।
২। এটি সম্পূর্ণরূপে শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম।
৩। এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

ডঃ মু নুরুল আমিন
গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ফোন ৯৬৬১৯২০-৫৯/৪৪৭৮, ফ্যাক্স ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩, E-mail : duregstr@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধর্মীয় রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে বামপন্থী দলগুলো, বিশেষতঃ পিকিংপন্থী মাওবাদী দলগুলো শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে সামনে এনে পেটিবুর্জোয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আসতে পারে না–এই শ্লোগান সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় বিতর্কিত ভূমিকা পালন করে। কারণ তৎকালীন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট দলগুলি বিদ্যমান পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পাকিস্তানী সরকারের জাতিগত নিপীড়নকে শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতনের একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের কাজকর্ম শুধুমাত্র শ্রমিক কৃষকের কিছু অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ ধর্মীয় রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকে যে, পাকিস্তান ভেঙে গেলে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এমনকি তারা এই সন্দেহও পোষণ করতে থাকে যে, ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এ দেশটিকে একটি ভারত-নির্ভর দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় সামনে রেখে তারা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে। মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন আলবদর ও আলশামস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পাকিস্তানীদের সহায়তা করে এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী সবচেয়ে সক্রিয় দল ছিল জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সময়ে পিকিংপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হলেও তারা পর্দার অন্তরালে গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জিইয়ে রাখে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও জামায়াতে, রাজাকার ও আলবদরদের গোপন তৎপরতা বন্ধ ছিল না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী বাকশালী আমলে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আওয়ামী বাকশালী আমলে তারা নিজেরা সচেতনভাবে জারী করেছিল তারই পরিণতি ঘটেছিল জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাবে। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে সরকার রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষণা করে। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখনও তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। এরশাদের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীও বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জামায়াতে ইসলামী ১৯৮২ সাল থেকে, বিশেষতঃ ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট গঠনের পর থেকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অন্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করে।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকারবিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর সংসদের অধিবেশনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামীও অন্যতম শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। অতঃপর ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরায় ১৮টি আসন লাভ করে চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরীক দল হিসেবে মন্ত্রিসভায় অংশ নিয়ে সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে থাকে।

এই গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পটভূমি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তার গতি-প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান এবং ভূমিকা ও ফলাফল পর্যালোচনা করেছি।

পিতার চাকুরীর সূত্রে এবং নিজের পেশাগত সূত্রে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে নিবিড়ভাবে দেখা ও অনুধাবন করার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার জীবন থেকে অর্জিত সরেজমিন অভিজ্ঞতাও আমার এই অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করেছে।

এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে সর্বপ্রথম যাঁকে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মু নুরুল আমিন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, নিবিড় সাহায্য ও সহযোগিতা এবং গঠনমূলক ও কার্যকর উপদেশ অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ ও একাডেমিক পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের যারা আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তাছাড়া আমি আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষকমন্ডলীকে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সবশেষে আমার সহধর্মিনী আক্তার জাহান রহমান, যিনি আমাকে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য শুধুমাত্র উৎসাহ ও সাহসই প্রদান করেননি, বরং অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণবিন্যাস করতে

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিবিড় ও নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও সহযোগিতা ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল।

-শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বাংলাদেশের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সাথে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভূ-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের, যেমন, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে এর একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে রাজনৈতিক দলের ব্যাপক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেশে ১৩টি জোটভুক্ত প্রায় ২২৫টি রাজনৈতিক দলের এবং জোট বহির্ভূত ২০টি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেশে ১৬০টি দলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯০টি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে অংশ নেয়। ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৬২টি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট- ৯ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশের বত্রিশ বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলো গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তারা ধারাবাহিকতা ও অবাধ কার্যকলাপ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন স্বাধীনতার বত্রিশ বছরে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি দলগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এত বেশি যে দেশে কতগুলো রাজনৈতিক দল তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তা জনগণ সঠিকভাবে জানে না। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। এখানে যে কারও সংগঠন করার ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। সে কারণে এ দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকাই স্বাভাবিক। তবে মূল সংবিধানের ৪টি মূলনীতির একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। যার ফলে মূল সংবিধান কার্যকর থাকা অবস্থায় (১৯৭২-১৯৭৫) বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারেনি। পরে ধর্মভিত্তিক একাধিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-এ-ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস পার্টি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে ধর্মীয় দলগুলো বাংলাদেশের বিরোধিতা করায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এদের তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে ক্ষমতাসীন সরকারের শক্তিশালী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। আপন ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলবিধি জারি করেন। এতে বিধান করা হয় যে, রাজনৈতিক দল গঠনের পূর্বে সরকারের অনুমতি লাগবে। এ সময় ৬০টি দল সরকারের অনুমতি লাভের জন্য আবেদন করে। ১৯৭৬-এর শেষ নাগাদ ২১টি দলকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। এরই সুযোগে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে। গণঅসন্তোষের কারণে পরবর্তীতে ১৯৭৮-এর নভেম্বরে জিয়া সরকার রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে দলগঠন ও পরিচালনার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয় এবং রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে

Dhaka University Institutional Repository

(পরিশিষ্ট-১০ দ্রষ্টব্য)। স্বাধীনতা অর্জনের পর এ পর্যন্ত দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল ও ওয়ার্কার্স পার্টি। এদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন বিস্তৃত রয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধর্মীয় রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে বামপন্থী দলগুলো, বিশেষতঃ পিকিংপন্থী মাওবাদী দলগুলো শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে সামনে এনে পেটিবুর্জোয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আসতে পারে না–এই শ্লোগান সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় বিতর্কিত ভূমিকা পালন করে। কারণ তৎকালীন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট দলগুলি বিদ্যমান পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পাকিস্তানী সরকারের জাতিগত নিপীড়নকে শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতনের একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের কাজকর্ম শুধুমাত্র শ্রমিক কৃষকের কিছু অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ ধর্মীয় রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকে যে, পাকিস্তান ভেঙে গেলে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এমনকি তারা এই সন্দেহও পোষণ করতে থাকে যে, ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এ দেশটিকে একটি ভারত নির্ভর দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় সামনে রেখে তারা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে। মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন আলবদর ও আলশামস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পাকিস্তানীদের সহায়তা করে এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তানী দালাল ও মৌলবাদী ঘাতকদের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক ও ঘৃণ্য শক্তিই হলো জামায়াতে ইসলামী। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী সবচেয়ে সক্রিয় দল ছিল এই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সময়ে পিকিংপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হলেও তারা পর্দার অন্তরালে গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জিইয়ে রাখে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও জামায়াতে, রাজাকার ও আলবদরদের গোপন তৎপরতা বন্ধ ছিল না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী বাকশালী আমলে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আওয়ামী বাকশালী আমলে তারা নিজেরা সচেতনভাবে জারী করেছিল তারই পরিণতি ঘটেছিল জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাবে। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখনও তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। এরশাদের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীও বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জামায়াতে ইসলামী ১৯৮২ সাল থেকে, বিশেষতঃ ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট গঠনের পর থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অন্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকে।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকারবিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর সংসদের অধিবেশনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামীও অন্যতম শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। অতঃপর ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরায় ১৮টি আসন লাভ করে চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরীক দল হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে (অষ্টম জাতীয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ঃ পরিশিষ্ট-৮)।

এই গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পটভূমি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণপূর্বক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তার গতি-প্রকৃতির একটি বাস্তবধর্মী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র-১ ঃ বাংলাদেশ ঃ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ
মানচিত্র-২ ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমানা
মানচিত্র-২ ঃ বাংলাদেশ ঃ স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভিযান
মানচিত্র-৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব
মানচিত্র-৪ ঃ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উপাদান
মানচিত্র-৫ ঃ পার্বত্য এলাকায় অবৈধ অস্ত্রের পথ ও ট্রানজিট পয়েন্টসমূহ
মানচিত্র-৬ ঃ একনজরে সারাদেশে ১৭ আগস্টের বোমা হামলা

ব্যবহৃত ছকের তালিকা

ছক-১ ঃ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পার্থক্য
ছক-২ ঃ ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-৩ ঃ ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের বিবরণ
ছক-৪ ঃ ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-৫ ঃ ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-৬ ঃ ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের বিবরণ
ছক-৭ ঃ ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-৮ ঃ ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-৯ ঃ ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-১০ ঃ ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-১১ ঃ ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-১২ ঃ ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-১৩ ঃ ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের বিবরণ
ছক-১৪ ঃ মার্চ ১৯৯৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত বোমা হামলার বিবরণ
ছক-১৫ ঃ বাংলাদেশের নিষিদ্ধ ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠন
ছক-১৬ ঃ ভারতে বাংলাদেশবিরোধী ট্রেনিং ক্যাম্প
ছক-১৭ ঃ দিনাজপুর-১ আসনের ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল
ছক-১৮ ঃ দিনাজপুর-১ আসনের ২০০৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল
ছক-১৯ ঃ ২০০৫ সালের সাতকানিয়া পৌর নির্বাচনের ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	II-IV
মুখবন্ধ	V-VII
মানচিত্রের তালিকা	VIII
ব্যবহৃত ছকের তালিকা	VIII
সূচিপত্র	IX-XI
১.০ ভূমিকা	১
১.১ সাধারণ	১-২
১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২-৩
১.৩ গবেষণার পদ্ধতি	৩
১.৪ গবেষণার গুরুত্ব	৩-৪
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৪-৫
১.৬ গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ	৫-৬
প্রথম অধ্যায়	
২.০ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন	৮
২.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৮-১০
২.২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল পরিচিতি	১০-১৪
২.৩ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি	১৪-২৬
২.৪ রাজনৈতিক দলের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ	২৬-২৭
২.৫ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নাম ও পরিচিতি	২৭-২৮
২.৬ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ ও কর্মসূচিগত বৈশিষ্ট্য	২৮-২৯
২.৭ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পার্থক্য	২৯-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
৩.০ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩২
৩.১ ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস	৩২-৪১
৩.২ মানব ইতিহাসের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহ	৪১-৪৮
৩.৩ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান	৪৮-৪৯
৩.৪ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থানে ধর্মের ভূমিকা	৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ অবিভক্ত ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫০-৫২
৩.৬ পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১) ৫২-৫৬
৩.৭ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫৭
৩.৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি (১৯৭২-১৯৭৫) ৫৭
৩.৯ জিয়াউর রহমানের আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫৭-৫৮
৩.১০ এরশাদের আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫৮
৩.১১ খালেদা জিয়ার আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫৮
৩.১২ শেখ হাসিনার আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫৮-৫৯
৩.১৩ বর্তমান জোট সরকার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৫৯

তৃতীয় অধ্যায়

৪.০ বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৬২
৪.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৬২
৪.২ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ৬২-৬৫
৪.৩ ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৬৫-৬৬
৪.৪ ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৬৭
৪.৫ ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৬৭-৬৮
৪.৬ ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৬৮-৬৯
৪.৭ ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৬৯
৪.৮ ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৭০
৪.৯ ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৭০-৭৩
৪.১০ ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৭৩
৪.১১ ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

৫.০ বাংলাদেশে জাতীয়তার বিতর্ক ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ৭৬
৫.১ জাতীয়তার বিতর্ক ঃ বাংলাদেশী বনাম বাঙালি ৭৬-৭৯
৫.২ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা ৭৯-৮৩
৫.৩ ধর্ম ও মৌলবাদ ৮৪-৮৫

পঞ্চম অধ্যায়

৬.০ বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৮৭
৬.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা ৮৭-৯১
৬.২ ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান ৯১
৬.৩ লন্ডনে জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলা ৯১-৯২

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ মিশরে জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলা ৯২
৬.৫ বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদ ৯২-৯৬
৬.৬ বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক আত্মঘাতী জঙ্গী স্কোয়াড ৯৬
৬.৭ বাংলাদেশের নিষিদ্ধ ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনসমূহ ৯৬-৯৯
৬.৮ বাংলাদেশের গোপন ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনসমূহ ৯৯-১০০
৬.৯ বাংলাদেশে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের অর্থের উৎস ও আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা ১০০-১০৩
৬.১০ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জঙ্গী সন্ত্রাসের প্রভাব ১০৩-১০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

৭.০ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত ১০৬
৭.১ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ১০৬-১০৭
৭.২ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমস্যা ১০৭-১১৪
৭.৩ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সম্ভাবনা ১১৪-১১৯

সপ্তম অধ্যায়

৮.০ উপসংহার ১২৩
৮.১ সাধারণ ১২৩-১২৪
৮.২ এই অভিসন্দর্ভের গবেষণার প্রাপ্তিসমূহ ১২৪-১২৮
৮.৩ চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সুপারিশ ১২৯-১৩১
৮.৪ পরিশিষ্ট ১৩২-১৫৫
৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি ১৫৬-১৬২
৮.৬ যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

১.০ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকা

১.১ সাধারণ

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধর্মীয় রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে বামপন্থী দলগুলো, বিশেষতঃ পিকিংপন্থী মাওবাদী দলগুলো শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে সামনে এনে পেটিবুর্জোয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আসতে পারে না–এই শ্লোগান সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় বিতর্কিত ভূমিকা পালন করে। কারণ 'তৎকালীন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট দলগুলি বিদ্যমান পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পাকিস্তানী সরকারের জাতিগত নিপীড়নকে শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতনের একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের কাজকর্ম শুধুমাত্র শ্রমিক কৃষকের কিছু অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।'১ অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ ধর্মীয় রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকে যে, পাকিস্তান ভেঙে গেলে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এমনকি তারা এই সন্দেহও পোষণ করতে থাকে যে, ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এ দেশটিকে একটি ভারত নির্ভর দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় সামনে রেখে তারা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে। 'মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন আলবদর ও আলশামস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পাকিস্তানীদের সহায়তা করে এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়।'২ '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তানী দালাল ও মৌলবাদী ঘাতকদের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক ও ঘৃণ্য শক্তিই হলো জামাতে ইসলামী।'৩ '১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী সবচেয়ে সক্রিয় দল ছিল এই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।'৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সময়ে পিকিংপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হলেও তারা পর্দার অন্তরালে গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জিইয়ে রাখে। '১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও জামায়াতে, রাজাকার ও আলবদরদের গোপন তৎপরতা বন্ধ ছিল না।'৫

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। 'সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী বাকশালী আমলে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আওয়ামী বাকশালী আমলে তারা নিজেরা সচেতনভাবে জারী করেছিল তারই পরিণতি ঘটেছিল জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাবে।'৬ '১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে।'৭ জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখনও তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। এরশাদের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীও বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'জামাতে ইসলামী ১৯৮২ সাল থেকে, বিশেষতঃ ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট গঠনের পর থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অন্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছে।'৮

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর সংসদের অধিবেশনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামীও অন্যতম শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। অতঃপর ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরায় ১৮টি আসন লাভ করে চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরীক দল হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে (অষ্টম জাতীয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঃ পরিশিষ্ট-৮)।

আমি এ বিষয়ের উপর এম, ফিল গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করতে চাচ্ছি এ কারণে যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বিষয়ের উপরে বিশ্লেষণধর্মী তেমন কাজ হয়নি। ডঃ রাজিয়া আক্তার বানুসহ অন্যান্য গবেষকগণ ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদের গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছেন। আমি এ গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে নিম্নের উদ্দেশ্যাবলী ও গবেষণা পদ্ধতির উপরে গুরুত্ব আরোপ করব ঃ

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

ক. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বরূপ, দলীয় কর্মসূচী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে সম্পর্ক বিষয়ে সম্যক পরিচিতি লাভ করা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পটভূমি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করা।

গ. তৎকালীন ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে এতদঞ্চলের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।

ঘ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি কেন স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়–তার কারণ অনুসন্ধান করা।

ঙ. স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল কিভাবে পুনর্বাসিত হয় তা বিশ্লেষণ করা।

চ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

ছ. খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

জ. বর্তমান জোট সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

ঝ. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে আমি ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এছাড়া আমি এই গবেষণা কর্মে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী সোর্সের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে আমি প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এই গবেষণা কর্মে আমি সরকারী ও রাজনৈতিক দলের দলিলপত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এছাড়া আমি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন জার্নালের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। পরিশেষে আমার এই গবেষণার উপাত্তগুলো আমি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরন করেছি।

১.৪ গবেষণার গুরুত্ব

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধারা ক্রিয়াশীল রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এর সকল আন্তঃস্রোত বা ধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরী। বর্তমান বিশ্ব এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মেলবন্ধনে যুক্ত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সে কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির স্বরূপ ও গতিধারা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই গবেষণা কর্মটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে এই গবেষণা কর্মের বিভিন্ন গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ;

খ. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বরূপ, দলীয় কর্মসূচী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে সম্পর্ক বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ;

গ. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পটভূমি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ;

ঘ. তৎকালীন ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে এতদঞ্চলের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ;

ঙ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি কেন স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়–সে সম্পর্কে ধারণা লাভ;

চ. স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল কিভাবে পুনর্বাসিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ;

ছ. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ;

জ. খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ;

ঝ. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি একটি জটিল ও ব্যাপক বিষয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন উপাদান। একই সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে উপমহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও জাতিগত বিতর্কের সাথেও। পৃথিবীর নানাদেশের ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সাথেও এ বিষয়ের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার দাবী রাখে। একইভাবে দাবী রাখে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মুক্তিসংগ্রামে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের একক ও যৌথ ভূমিকা পর্যালোচনারও। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ সকল কারণে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণাকালে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সকল সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহসহ প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভটির কলেবর একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে অনেক বাহুল্য তথ্য পরিহার করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে আমার দীর্ঘদিনের

Dhaka University Institutional Repository

সরজমিন অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন এ গবেষণা কর্মের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, অপরদিকে তা সামান্য হলেও তাতে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত সকল তথ্য অবচেতনভাবে হলেও আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করেছি। ফলশ্রুতিতে পরিহার করার চেষ্টা থাকার পরেও বিভিন্ন বিষয়ে কিছুটা হলেও এ গবেষণাকর্ম আমার নিজস্ব মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাছাড়া আমার এ গবেষণাকর্মে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে সময়ের পরিক্রমায় অনেক তথ্য-উপাত্তের মৌলিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে, যা যৌক্তিকভাবে সন্নিবেশিত করার জন্য আমার সর্বাত্মক চেষ্টার পরেও হয়তো সেখানে কিছুটা ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে প্রতিদিনই নানা নতুন নতুন উপাদান যোগ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষেই এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলশ্রুতিতে এই গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে নতুন যে কোন উপাদান যে কোন সময় বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নতুন করে মূল্যায়নের অবকাশ সৃষ্টি করতে পারে।

১.৬ গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ ঃ

এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা করতে গিয়ে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির গুরুত্বের উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। মানবজীবনের সহজাত ধর্ম-ভাবনা ও ধর্মচিন্তার সাথে এর স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও গবেষণায় স্থান পেয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর একটির সাথে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মুক্তিসংগ্রামে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভূমিকা নিয়েও এ অভিসন্দর্ভে গবেষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বত্রিশ বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তারা ধারাবাহিকতা ও অবাধ কার্যকলাপ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন স্বাধীনতার বত্রিশ বছরে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি দলগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এত বেশি যে দেশে কতগুলো রাজনৈতিক দল তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তা জনগণ সঠিকভাবে জানে না। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। এখানে যে কারও সংগঠন করার ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। সে কারণে এ দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকাই স্বাভাবিক। তবে মূল সংবিধানের ৪টি মূলনীতির একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। পরে ধর্মভিত্তিক একাধিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-এ-ইসলাম, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস পার্টি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে ধর্মীয় দলগুলো বাংলাদেশের বিরোধিতা করায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এদের তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে ক্ষমতাসীন সরকারের শক্তিশালী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। আপন ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলবিধি জারি করেন। এতে বিধান করা হয় যে, রাজনৈতিক দল গঠনের পূর্বে সরকারের অনুমতি লাগবে। এ সময় ৬০টি দল আবেদন করে। ১৯৭৬-এর শেষ নাগাদ ২১টি দলকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। এরই সুযোগে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে। গণঅসন্তোষের কারণে পরবর্তীতে ১৯৭৮-এর নভেম্বরে জিয়া সরকার রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার করে নেন। ফলে দলগঠন ও পরিচালনার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয় এবং রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা অর্জনের পর এ পর্যন্ত দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল ও

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্কার্স পার্টি। এদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন বিস্তৃত রয়েছে।

এই গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পটভূমি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তার গতি-প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান এবং ভূমিকা ও ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সম্ভাব্য ভবিষ্যতও এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র, যেমন, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্যে বিভিন্ন Primary Source ও Secondary Source থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য এই অভিসন্দর্ভটি মোট ০৮টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচীগত বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মানব ইতিহাসের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থানে ধর্মের ভূমিকা, অবিভক্ত ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদ ও নির্বাচনী ফলাফলের আলোকে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংবিধান, বর্তমান জাতীয় সংসদ এবং ১৯৭৩-২০০১ কালপর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ও অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের আলোকে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে জাতীয়তার বিতর্ক, বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা, ইরাকে ও আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক আগ্রাসন এবং লন্ডন, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, স্পেন, ভারত ও বাংলাদেশে সন্ত্রাসী জঙ্গী হামলা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশের গোপন ও নিষিদ্ধ ধর্মীয় জঙ্গী সংগঠনসমূহের আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা ও অর্থের উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এর সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে গবেষণাটির উপর সার্বিক মূল্যায়ন ও সুপারিশসহ উপসংহার টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পল্লব পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৮৯, ঢাকা, পৃঃ ৫০
২। রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ভূমিকা অংশ।
৩। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৫৫-৫৬
৪। ড. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ডিসেম্বর, ১৯৯৪, কলিকাতা, পৃঃ ৪২৫
৫। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭১।
৬। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৯৮-৯৯
৭। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭৫।
৮। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৬২
৯। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৫ জানুয়ারী, ১৯৮৮
১০। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৯৬
১১। Parliamentary Elections in Bangladesh, 27 February, 1991, The Report of the Commonwealth Observer Group, pp. 56-59
১২। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

২.০ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন

২.১। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধর্মীয় রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে বামপন্থী দলগুলো, বিশেষতঃ পিকিংপন্থী মাওবাদী দলগুলো শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে সামনে এনে পেটিবুর্জোয়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আসতে পারে না–এই শ্লোগান সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় বিতর্কিত ভূমিকা পালন করে। কারণ 'তৎকালীন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট দলগুলি বিদ্যমান পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পাকিস্তানী সরকারের জাতিগত নিপীড়নকে শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতনের একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের কাজকর্ম শুধুমাত্র শ্রমিক কৃষকের কিছু অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।'১ অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ ধর্মীয় রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকে যে, পাকিস্তান ভেঙে গেলে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এমনকি তারা এই সন্দেহও পোষণ করতে থাকে যে, ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এ দেশটিকে একটি ভারত নির্ভর দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় সামনে রেখে তারা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে। 'মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন আলবদর ও আলশামস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পাকিস্তানীদের সহায়তা করে এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়।'২ '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পাকিস্তানী দালাল ও মৌলবাদী ঘাতকদের মধ্যে সব থেকে মারাত্মক ও ঘৃণ্য শক্তিই হলো জামাতে ইসলামী।'৩ '১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী সবচেয়ে সক্রিয় দল ছিল এই জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।'৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সময়ে পিকিংপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হলেও তারা পর্দার অন্তরালে গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জিইয়ে রাখে। '১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও জামায়াতে, রাজাকার ও আলবদরদের গোপন তৎপরতা বন্ধ ছিল না।'৫

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। 'সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী বাকশালী আমলে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আওয়ামী বাকশালী আমলে তারা নিজেরা সচেতনভাবে জারী করেছিল তারই পরিণতি ঘটেছিল জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাবে।'৬ '১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে।'৭ জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করে এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখনও তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। এরশাদের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীও বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'জামাতে ইসলামী ১৯৮২ সাল থেকে, বিশেষতঃ ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট গঠনের পর থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অন্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছে।'৮

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর সংসদের অধিবেশনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামীও অন্যতম শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। অতঃপর ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরায় ১৮টি আসন লাভ করে চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরীক দল হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে (অষ্টম জাতীয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঃ পরিশিষ্ট-৮)।

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বাংলাদেশের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সাথে বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ভূ-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের, যেমন, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে এর একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মায়ানমার এবং বর্তমান বিশ্বের স্বীকৃত পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীনের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় (বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উপাদান ঃ পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য) ভূ-রাজনীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও ব্যাপক গবেষণার দাবী সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনের প্রতিযোগিতামুখর আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার আলোচনায় বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ক্রমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের বত্রিশ বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তারা ধারাবাহিকতা ও অবাধ কার্যকলাপ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন স্বাধীনতার বত্রিশ বছরে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি দলগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এত বেশি যে দেশে কতগুলো রাজনৈতিক দল তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তা জনগণ সঠিকভাবে জানে না। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। এখানে যে কারও সংগঠন করার ও মত প্রকাশের অবাধ

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা রয়েছে। সে কারণে এ দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকাই স্বাভাবিক। তবে মূল সংবিধানের ৪টি মূলনীতির একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। পরে ধর্মভিত্তিক একাধিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-এ-ইসলাম, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি,কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস পার্টি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে ধর্মীয় দলগুলো বাংলাদেশের বিরোধিতা করায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এদের তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় সামরিক বাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে ক্ষমতাসীন সরকারের শক্তিশালী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। আপন ক্ষমতাকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলবিধি জারি করেন। এতে বিধান করা হয় যে, রাজনৈতিক দল গঠনের পূর্বে সরকারের অনুমতি লাগবে। এ সময় ৬০টি দল সরকারের অনুমতির জন্য আবেদন করে। ১৯৭৬-এর শেষ নাগাদ ২১টি দলকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। এরই সুযোগে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে। গণঅসন্তোষের কারণে পরবর্তীতে ১৯৭৮-এর নভেম্বরে জিয়া সরকার রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার করে নেন। ফলে দলগঠন ও পরিচালনার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয় এবং রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তার ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বমোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে (পরিশিষ্ট-১০)। স্বাধীনতা অর্জনের পর এ পর্যন্ত দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল ও ওয়ার্কার্স পার্টি। এদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন বিস্তৃত রয়েছে।

২.২। রাজনৈতিক দল পরিচিতি ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে রাজনৈতিক দলের ব্যাপক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেশে ১৩টি জোটভুক্ত প্রায় ২২৫টি রাজনৈতিক দলের এবং জোট বহির্ভূত ২০টি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।৯ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেশে ১৬০টি দলের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।১০ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯০টি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে অংশ নেয়।১১ ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।১২ কাজেই দেখা যাচ্ছে দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৬২টি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)
৪. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)
৫. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর)
৬. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৮. ওয়ার্কার্স পার্টি
৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)
১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)
১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (মহিউদ্দিন)
১২. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)

Dhaka University Institutional Repository

১৩.বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মাহবুব)
১৪.ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)
১৫.গণফোরাম
১৬.গণতন্ত্রী পার্টি
১৭.গণআজাদী লীগ (সামাদ)
১৮.গণআজাদী লীগ (আলম)
১৯.শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
২০.জনমুক্তি পার্টি
২১.বাংলাদেশ পিপলস লীগ
২২.ঐক্য প্রক্রিয়া
২৩.প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল
২৪.ফ্রিডম পার্টি (ফারুক)
২৫.ফ্রিডম পার্টি (রশীদ)
২৬.ডেমোক্রেটিক লীগ
২৭.ডেমোক্রেটিক লীগ (অলি আহাদ)
২৮.কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)
২৯.কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজ)
৩০.জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)
৩১.জাতীয় দল (হুদা)
৩২.যুক্তফ্রন্ট
৩৩.বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)
৩৪.ইউপিপি (সাদেক)
৩৫.ইউপিপি (আবেদিন)
৩৬.জাতীয় জনতা পার্টি (নুরুন)
৩৭.জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)
৩৮.প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি
৩৯.ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৪০.ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (জাহিদ)
৪১.বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি
৪২.বাংলাদেশ জনতা দল
৪৩.মুসলিম লীগ (কাদের)
৪৪.মুসলিম লীগ (মতিন)
৪৫.মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
৪৬.মানবতাবাদী দল
৪৭.বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি
৪৮.বাকশাল
৪৯.জাতীয় খেলাফত পার্টি
৫০.ফ্রিডমেটিক পার্টি
৫১.বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
৫২.পাকমন পিপলস পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

৫৩.ফ্রিডম লীগ
৫৪.বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
৫৫.স্বাধীনতা পার্টি
৫৬.বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৫৭.বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজ)
৫৮.খেলাফত আন্দোলন (আশরাফ)
৫৯.খেলাফত আন্দোলন (হাবিবুল্লাহ)
৬০.বাংলাদেশ ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি
৬১.বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন
৬২.জাতীয় ওলামা ফ্রন্ট
৬৩.জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
৬৪.জাস্টিস পার্টি
৬৫.লেবার পার্টি (মোস্তফা)
৬৬.বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার পার্টি
৬৭.ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
৬৮.লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৬৯.মুসলিম লীগ ঐক্য
৭০.নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি
৭১.ইসলামী ঐক্য আন্দোলন
৭২.ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
৭৩.বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট
৭৪.বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
৭৫.বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি
৭৬.আওয়ামী উলেমা পার্টি
৭৭.নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি
৭৮.মুসলিম জাতীয় দল
৭৯.বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি
৮০.বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোতালেব)
৮১.মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল
৮২.বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা-ই-ইসলামী
৮৩.জাতীয় উলেমা দল
৮৪.বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ
৮৫.বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)
৮৬.বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ
৮৭.লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৮৮.বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাইদ)
৮৯.নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)
৯০.নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ)
৯১.বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৯২.বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

৯৩.বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি
৯৪.বাংলাদেশ কংগ্রেস
৯৫.জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল
৯৬.বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস
৯৭.জাতীয় পল্লী দল
৯৮.ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি
৯৯.বাংলাদেশ পিপলস লীগ (কাজী)
১০০. বাংলাদেশ পিপলস লীগ (মাহবুব)
১০১. ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি
১০২. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (সুক্কু মিয়া)
১০৩. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (শরাফত)
১০৪. জাতীয় জনতা পার্টি (খান)
১০৫. জাতীয় জনতা পার্টি (ওয়াদুদ)
১০৬. জাতীয় জনতা পার্টি (সুজাত)
১০৭. গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট
১০৮. সাম্যবাদী দল (বড়ুয়া)
১০৯. প্রোগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্ট পার্টি
১১০. বাংলাদেশ ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক দল
১১১. জেহাদ পার্টি
১১২. বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ
১১৩. বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল
১১৪. জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট
১১৫. নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি
১১৬. বাংলাদেশ বেকার পার্টি
১১৭. জাতীয় বিপ্লবী পার্টি
১১৮. বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল
১১৯. বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ
১২০. বাংলাদেশ ফ্রিডম লীগ
১২১. বাংলাদেশ বেকার সমাজ
১২২. জাতীয় শ্রমজীবী পার্টি
১২৩. বাংলাদেশ আদর্শ পার্টি
১২৪. মুসলিম পিপলস পার্টি
১২৫. সমতা পার্টি
১২৬. বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি
১২৭. পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি
১২৮. বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (আ.নে.)
১২৯. বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি
১৩০. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্ম সংঘ
১৩১. বাংলাদেশ গরীব দল
১৩২. পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি
১৩৪. বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ
১৩৫. কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৩৬. বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট
১৩৭. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন
১৩৮. বাংলাদেশ জনপরিষদ
১৩৯. জাতীয় বিপ্লবী পার্টি
১৪০. আদর্শ পার্টি
১৪১. মুসলিম পিপলস পার্টি
১৪২. পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি
১৪৩. গণআজাদী লীগ
১৪৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
১৪৫. বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি
১৪৬. বাংলাদেশ প্রগতিশীল পার্টি
১৪৭. বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনীতিক পার্টি
১৪৮. বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
১৪৯. জামায়াতে-ই-রাব্বানিয়া-আসমা পার্টি
১৫০. গণতান্ত্রিক কর্মীশিবির
১৫১. বাংলাদেশ জাতীয় সেবক দল
১৫২. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ
১৫৩. বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তি আন্দোলন
১৫৪. ন্যাশনাল ইয়ুথ লিবারেল পার্টি
১৫৫. ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি
১৫৬. হুকুমতে রাব্বানী পার্টি
১৫৭. ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি
১৫৮. ইসলামী গণআন্দোলন
১৫৯. ইসলামী কৃষক পার্টি
১৬০. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি
১৬১. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
১৬২. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

২.৩। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ঃ

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঃ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালে গঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এই দলটি ৬-দফা কর্মসূচি প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে। যদিও এসময় শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এসময় ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের কারণে আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৭০-এর ১০ জানুয়ারী দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।১৩ পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

একদলীয় সরকার 'বাকশাল' কায়েম করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলে দেশে আওয়ামী লীগের শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬-এর মাধ্যমে পুনরায় আওয়ামী লীগের একক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে দলটি অংশ নিয়ে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।১৪ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে আওয়ামী লীগ ৮-দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হলে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের প্রত্যাশা ছিল এবার হয়তো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার মত আসন পেতে ব্যর্থ হয়েছে। ৮৮টি আসন নিয়ে আওয়ামী লীগকে এবারও জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আসন গ্রহণ করতে হয়।১৫ পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হয়ে ২১ বছর পর পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলেও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের নির্বাচনী ভরাডুবি ঘটে। তারা মাত্র ৬২টি আসন লাভ করে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিম্নে আওয়ামী লীগের মতাদর্শ ও কর্মসূচী আলোচনা করা হলো ঃ

মতাদর্শ ও কর্মসূচী ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চারটি মূলনীতিতে বিশ্বাসী। এগুলো হচ্ছে (১) জাতীয়তাবাদ, (২) গণতন্ত্র, (৩) ধর্মনিরপেক্ষতা ও (৪) সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ চারটি মৌল আদর্শের প্রবক্তা এবং তাঁরই নামানুসারে এদের সমষ্টিকে মুজিববাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আওয়ামী লীগ এই চার মূলনীতিকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছে-

(১) জাতীয়তাবাদ–জাতি হিসেবে দেশের উপর জনগণের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার;

(২) গণতন্ত্র–রাষ্ট্র শাসনের অধিকার;

(৩) ধর্মনিরপেক্ষতা–জনগণের স্ব-স্ব চেতনার আলোকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার;

(৪) সমাজতন্ত্র–জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা কায়েমের অধিকার।

আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে যে, জনশক্তিই দেশের প্রধান সম্পদ। রাষ্ট্রীয় কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে এবং জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগ-এর লক্ষ্য হচ্ছে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য দূর করা। এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির মালিকানা বাধ্যতামূলকভাবে সীমিতকরণ এবং সম্পদের সুষম বন্টন প্রয়োজন। দেশের সম্পদের মালিক হবে শ্রমিক এবং দেশের জনসাধারণ, এটাই আওয়ামী লীগের মতাদর্শ।১৬ তবে বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতির আলোকে আওয়ামী লীগ এখন বাজার অর্থনীতির পক্ষে কথা বলছে। আওয়ামী লীগের জাতীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারিত দলীয় মেনিফেস্টো থেকে। সেখানে দলের মূল লক্ষ্য হিসেবে চতুর্থ সংশোধনীপূর্ব ১৯৭২-এর সংবিধান পুনর্বহাল ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও অঙ্গীকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ও সংবিধানে গৃহীত চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল জাতীয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য, আদর্শ ও স্বপ্ন। বাঙালি জাতির আশা-আকা ঙ্ক্ষা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের ভূখন্ডে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি ও উপজাতির ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি ও সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান করা–বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার এটাই মূল বিষয়বস্তু। ইশতেহারে বলা হয়, অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়কের, নিয়ন্ত্রকের নয়। এ নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারী খাতের উন্নয়ন সাধন ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করা হবে এবং কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে না। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির খাজনা মওকুফ, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিঋণের সুদ মওকুফ এবং ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যুক্তিসংগত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান, সরকারী-বেসরকারী খাতের শ্রমিকদেও শ্রমসংগঠনের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক ও অন্যান্য প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজুরি নির্ধারণ। শিক্ষার সুযোগ প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার–এই নীতিতে শিক্ষার উন্নয়ন।

সরকারী কর্মচারীগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, সরকারের নয়–এ নীতিতে প্রশাসন যন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি সুদক্ষ, শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী নিশ্চিত করার দলীয় নীতি ও লক্ষ্যের কথাও ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন একনায়কত্বের কুফল হিসেবে সমাজজীবনে বিস্তৃত দুর্নীতির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে দুর্নীতিবাজ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা এবং আর যাতে কোন রাষ্ট্রপতিকে উচ্চাভিলাষী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হতে না হয় এবং ক্ষমতার পরিবর্তন কেবল সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়, সেই লক্ষ্যে খুন বা হত্যালীলার মাধ্যমে নয়, বরং সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে খুনীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।১৭

(২) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ঃ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, যিনি ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। বিএনপির প্রথম নাম ছিল জাগদল। জাগদলই পরবর্তীতে বিএনপি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।১৮ ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে দলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার।১৯ পরবর্তীতে বিচারপতি সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে বিচারপতি সাত্তার তথা বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়।২০ এরপর দেশের অন্য দলগুলির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে মরহুম জিয়াউর রহমানের পত্নী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকে। খালেদা জিয়ার সে সময়কার আপোষহীন নেতৃত্বের কারণে বিএনপি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।২১ এরপর গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।২২

মতাদর্শ ও কর্মসূচী ঃ বিএনপি সরকারের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে খালকাটা বিপ্লবের দ্বারা দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিএনপি মিশ্র অর্থনীতির প্রবক্তা। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলেও ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক ভূমিধ্বস বিজয়ের মাধ্যমে উক্ত দল পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। সংক্ষেপে বিএনপি দলীয় ১৯-দফা কর্মসূচি এখানে তুলে ধরা হলো-

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ;
২. শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাত্মক আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা ;
৩. সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা;
৬. দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে তার ব্যবস্থা করা ;
৭. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৮. কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা;
৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
১০. সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা;
১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুবসমাজকে সুসংহত করে জাতিগঠনে উদ্বুদ্ধ করা;
১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতকে প্রয়োজনীয় উৎসাহদান ;
১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা;
১৪. সরকারী চাকুরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশগঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
১৫. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা;
১৬. সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা;
১৭. প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা;
১৮. দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা;
১৯. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।২৩

বিএনপির কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়া যায় ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারিত দলীয় মেনিফেস্টো থেকে। মূলতঃ এই মেনিফেস্টো জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীর আলোকে তৈরি। এতে সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারের স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ৪টি মৌলনীতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে বলে এতে বলা হয়েছে। বিএনপি কৃষিখাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যাবে। এছাড়া মুক্ত অর্থনীতির কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ হবে এবং সেইসাথে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। প্রশাসনের সকল স্তর থেকে দুর্নীতিরোধেরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার কথাও এতে রয়েছে। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।২৪ ক্ষমতায় থাকাকালীন বিএনপি সরকার এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে বলে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন জনসভার মাধ্যমে জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

(৩) জাতীয় পার্টি ঃ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান এরশাদ তৎকালীন বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।২৫ সারাদেশে সামরিক আইন জারী করে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পরে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং বিরোধীদলকে মোকাবেলার জন্য এরশাদ রাজনৈতিক দলগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতার উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসানুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে জনদল গঠন করা হয়।২৬ জনদলে যোগদানকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান গ্রুপ)
২. বিএনপির একাংশ
৩. জাতীয় লীগ
৪. ডেমোক্রেটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম গ্রুপ)
৫. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের)
৬. ইউপিপি (কাজী জাফর)
৭. গণতান্ত্রিক পার্টি (জাহিদ)

উপরের দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জনদল পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে।২৭ এই দলের চেয়ারম্যান হন প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজেই। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'জাতীয় পার্টি' ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।২৮ কিন্তু দলটি তাদের সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখে বিকল্প কর্মসূচি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯০-এ বিরোধী দলের ডাকে এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে জাতীয় পার্টিও দেশের ক্ষমতার মঞ্চ থেকে অপসারিত হয়। ১৯৯১-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন লাভ করে সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।২৯ ১৯৯৬-এর সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টি ৩০টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগের 'ঐকমত্যের সরকার'-এ যোগ দেয়। পরবর্তীতে দলীয় আন্তঃকোন্দল ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে জাতীয় পার্টি নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত হয় ঃ

১. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)
২. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)
৩. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর-ফিরোজ)

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির উপরোক্ত তিনটি গ্রুপ পৃথকভাগে অংশগ্রহণ করে। তাতে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর-ফিরোজ) ৪টি ও জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। জাতীয় পার্টি (এরশাদ) অন্যান্য কয়েকটি ইসলামপন্থী দলের সাথে একত্রিত হয়ে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনপূর্বক উক্ত মোর্চার মাধ্যমে ২০০১ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে সর্বমোট ১৪টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়।

মতাদর্শ ও কর্মসূচী ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ন্যায় জাতীয় পার্টিও নিজেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে দাবী করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের ১৯-দফা কর্মসূচির ন্যায় এরশাদও জাতীয় পার্টির জন্য ১৮-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।৩০ জাতীয় পার্টির উক্ত ১৮-দফা কর্মসূচি হলো-

১. পল্লীর উন্নয়ন করা;
২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;
৩. ভূমি সংস্কারকে ত্বরান্বিত করা;
৪. গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মতৎপরতা পল্লী এলাকায় সম্প্রসারিত করা;
৫. শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
৬. ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পকলকারখানা স্থাপনকে উৎসাহিত করে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৭. সমবায় ব্যবস্থার এবং কুটিরশিল্পের উন্নয়ন;

Dhaka University Institutional Repository

৮. জাতীয় আয়ের সুষমবন্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা;
৯. উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন;
১০. সর্বাধিক চাকুরি-সুবিধা সৃষ্টি করা;
১১. সকলের জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
১২. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী মূল্যবোধের প্রবর্তন করা;
১৩. দুর্নীতি দূর করা;
১৪. বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা;
১৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা;
১৬. শুধুমাত্র রাজনীতি নয়, উৎপাদনের রাজনীতি শুরু করা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা;
১৭. বিচারব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা সকল পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;
১৮. মহিলাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

১৯৯১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারিত দলীয় মেনিফেস্টো থেকে দলটির কর্মসূচী আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এতে বলা হয়-

১. জাতীয় পর্যায় হতে স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে;
২. প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য করে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের ক্ষমতার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য সৃষ্টি করবে;
৩. উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের যে দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছে, তার দৃঢ় ভিত্তি প্রদান ও সম্প্রসারিত করা হবে;
৪. পর্যায়ক্রমে প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান–এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

শিল্পনীতি সম্পর্কে ইশতেহারে বলা হয়, জাতীয় পুঁজিবিকাশের পথ উন্মুক্ত, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যক্তি ও সমবায়ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ উৎসাহিত করা, কৃষিভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী খাতের মধ্যে পরস্পরের সহায়ক ও সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে তোলা হবে। এর বাইরে কৃষিনীতি সম্পর্কে বলা হয়, ভূমিসংস্কারকে প্রসারিত ও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, খাস ও সিলিং উদ্ধৃত জমি, আত্মসাৎকৃত খাস ও অনাবাদি জমি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বন্টন, আরও গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা, মহাজনি সূদ ও দাদন প্রথার অবসান। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের সহজ শর্তে বীজ, সার, সেচ, কৃষিঋণসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান, সেচযন্ত্র ও পাওয়ার টিলার ইত্যাদির ট্যাক্স মওকুফ অব্যাহত রাখা। ভারত ও নেপালের সাথে আলোচনাক্রমে আন্তর্জাতিক নদীগুলির প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলা হয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি শত্রুতা নয়–এই মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয় পার্টির পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে সকল দেশের সঙ্গে সার্বভৌম সহাবস্থান নীতি, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ঘোষণা এবং জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী কেউ কারও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুযায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিরক্ষানীতি সম্পর্কে বলা হয়, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তিতে শিক্ষিত ও সজ্জিত এবং জাতিগঠন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে। শ্রমনীতিতে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করাসহ জাতীয় পার্টির সরকার যে পে-কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেছিল, তা পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা। শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলা হয়, সার্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন, নারীশিক্ষা বিকাশে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং নিরক্ষর নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা হবে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

পৃথক করা এবং বিচারকের পবিত্রতা ও মর্যাদারক্ষার সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অগ্রাধিকারভিত্তিতে যমুনা সেতু নির্মাণ করা হবে।৩১

(৪) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঃ এ দলের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী। ইসলামী ধারার রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে একটি শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ক্যাডারভিত্তিক ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তাদের দলীয় শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ১০টি ও ১৮টি আসন লাভ করা থেকে।৩২ এছাড়া ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শরিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মোট ১৭টি আসন লাভ করে।৩৩ একমাত্র ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি ফলাফল বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৩টি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়।৩৪

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। এতে জামায়াতের কর্মতৎপরতাও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এর পর থেকেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করে।

মতাদর্শ ও কর্মসূচী ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মূল লক্ষ্য দেশে কোরআন-সুন্নাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রসঙ্গে দলটির প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের নিকট খোদা, ইসলামী আন্দোলন এবং সমগ্র মানবের মুক্তির জন্যই ইসলামের আহ্বান। সুতরাং কোন বিশেষ জাতি বা দেশের সাময়িক সমস্যাবলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। বরং তা সমগ্র মানবতা ও বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত।'৩৫ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৭-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। যেমন-

১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা
   ক. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি
   খ. কোরআন সুন্নাহ্‌র আইন জারি
২. ঈমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করা
   ক. খোদাবিমুখ অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করা
   খ. সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন কায়েম করা
৩. বাংলাদেশের আজাদির হেফাজত করা
৪. আইন-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে বহাল রাখা
৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুকরণ
৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন
৭. কোরআন হাদিস অনুযায়ী মহিলাদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ৩৬

জামায়াতের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারিত তাদের দলীয় ইশতেহার থেকে। এতে বলা হয়-

কোরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণই জামায়াতের লক্ষ্য। জামায়াতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষপাতী। সেই পরিবর্তন কোরআন সুন্নাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শের অনুসারী হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিচার কায়েম করবে। এই রাষ্ট্র হবে সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচারভিত্তিক একটা কল্যাণ রাষ্ট্র যা প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক প্রয়োজন পূরণে নিশ্চয়তা বিধান করবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জানমাল, মানবাধিকার, ইজ্জত-আবরুর পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে। দেশের স্বাধীনতা, সংহতি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাউকে কাজ করতে দেয়া হবে না। দেশের সরকার পরিচালনা করা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ। গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে জনমত গঠনের অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির ও দলের থাকবে। জাতীয় সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদসংস্থার ন্যায় প্রচারমাধ্যমগুলি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

ইসলামী আইন জারীর মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়, আল্লাহ্ মানুষের উপর জুলুম করার জন্য কোরআন নাজিল করেননি। মানুষের সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে, জনগণকে আল্লাহ্র আইন মেনে চলার পরিবেশ সৃষ্টি না করে এবং জনগণের চরিত্র উন্নত করার ব্যবস্থা না করে আল্লাহ্ তাদের উপর ফৌজদারী শাস্তি চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার সরকারকে দেননি। একশ্রেণীর লোক প্রচার করে থাকে যে, ইসলামী সরকার কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে সব চোরের হাত কেটে ফেলা হবে এবং জেনাকারীদের পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এ প্রচারণা মিথ্যা ও অযৌক্তিক। কারণ অভাবের কারণে কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া নিষেধ। নারীসমাজের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি না করে এবং নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ চালু রেখে জেনার জন্য সামান্য শাস্তি প্রদানও চরম জুলুম।

ইশতেহারের বক্তব্য অনুযায়ী জামায়াতে ক্ষমতায় গেলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা ও শাসনতন্ত্রের সকল ধারাকে ইসলামী ধারায় পরিবর্তন করবে। মৌলিক অধিকার হরণকারী সকল কালাকানুন বাতিল, বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও পুরোপুরি স্বাধীন করা হবে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পকলার প্রতিটি শাখায় ইসলামী জীবনদর্শন সন্নিবেশিত করা হবে। অমুসলিম শিক্ষার্থীদের তাদের ধর্মীয় শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে। মসজিদকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হবে ও মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে সশস্ত্রবাহিনীকে সর্বাধুনিক উপকরণে সুসজ্জিত করে গড়ে তোলা হবে। ভূমিব্যবস্থাকে এমনভাবে সংস্কার করা হবে যাতে চাষীরা ভূমিহীন হয়ে না পড়ে। যাকাতব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রবর্তন করা হবে যাতে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পায়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলির মালিকানা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হবে। সূদবিহীন ব্যাংক ও বীমাব্যবস্থা চালু করা হবে। ভারী শিল্পের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমমর্যাদার সম্পর্ক রক্ষা করা হবে।৩৭

(৫) **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ঃ** সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সংক্ষেপে সিপিবি। বাংলাদেশে এ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রয়াত কমরেড মণি সিং। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ৫ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং এর একটি অংশ সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের নেতৃত্বে গণফোরামে যোগ দেয়। বাকি অংশ সিপিবি নামে এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

মতাদর্শ ও কর্মসূচী ঃ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সহিংস বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাস করে না। এই দল সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের মূলনীতিগুলিতে বিশ্বাসী। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তারা মনে করে, দল থেকে ক্ষমতা আসে না, এটা আসে মেহনতি মানুষের বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্য থেকে। শ্রমিক-কৃষকের সচেতনতা না আসা পর্যন্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নির্বাচনী প্রচারণা ও সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের এই চেতনা জাগ্রত করা যেতে পারে। একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত–এই নীতিতে তারা বিশ্বাসী। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

১. জাতীয়করণকৃত শিল্পগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত পুঁজিকে উৎসাহ, সাহায্য দান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলির মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
২. পরিবারপ্রতি জমির সর্বোচ্চ সীমা ৫০ বিঘায় আনা হবে এবং বাড়তি জমি বিনামূল্যে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বর্গাজমি হতে বর্গাচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ এবং আধি প্রথার পরিবর্তে তেভাগা প্রথা চালুকরণ।
৩. শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত করা হবে। ১৪ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক ও বিনাখরচায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে।
৪. স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করা হবে।৩৮

(৬) ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (ইনু), বাসদ (খালেকুজ্জামান), বাসদ (মাহবুব), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ঃ এই দলগুলো এরশাদ সরকারের শাসনামলে *পাঁচদলীয় ঐক্যজোট* নামে একটি জোট গঠনপূর্বক ঐক্যবদ্ধভাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়। উক্ত পাঁচদলীয় ঐক্যজোটের ঘোষণা ও কর্মসূচী বিশ্লেষণ করে এই দলগুলির কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, যা নিম্নরূপ-

মতাদর্শ ও কর্মসূচী ঃ ধনিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য গণআন্দোলন করে ভোটের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই পাঁচদলের আশু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ জোটের কর্মসূচি হলো,

১. ক. বাক, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন করার, সভা-সমিতি-মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা ও ধর্মঘট করার স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট, স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, জরুরি ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে।
খ. ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম সংশোধনীসহ অগণতান্ত্রিক সংশোধনী বাতিল করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হবে।
গ. আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে প্রশাসনের সর্বস্তরে গণতন্ত্রায়ন করা হবে।
ঘ. জাতীয় সংসদ থেকে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটদাতা জনগণ কর্তৃক যে কোন সময় প্রত্যাহার করে নেবার এবং পুনর্নির্বাচনের আইনগত ব্যবস্থা করা হবে।
ঙ. বিচারবিভাগের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং প্রশাসন থেকে বিচারবিভাগকে পরিপূর্ণরূপে পৃথক করা হবে।
চ. হত্যা, ক্যু ও অবৈধ ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। এরশাদসহ সকল অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত সকল হত্যা ও নির্যাতনের তদন্ত ও বিচার করা হবে।
ছ. দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সংহত করার স্বার্থে দেশের সকল সক্ষম যুবক-যুবতীকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেয়া হবে।
২. বর্তমানে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী শ্রমআইন বাতিল করে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নতুন আইন তৈরি করা হবে যাতে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারে।
৩. ক্ষেতমজুরদের জন্য সারাবৎসরের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।
৪. ক. খোদ কৃষকের হাতে জমি ও সমবায়নীতির ভিত্তিতে আমূল ভূমিসংস্কার করা হবে। জমির সিলিং ৫০ বিঘায় নির্ধারণ করতে হবে।
খ. বর্গাচাষীদের জমির উপর স্থায়ীভাবে চাষ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ঋণ-সালিশি বোর্ড গঠন করা হবে।

ঘ. সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, সেচযন্ত্র ইত্যাদি কৃষি-উপকরণের দাম শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা হবে।

৫. বেকার যুবকদের যথোপযুক্ত কাজ দেয়া হবে, অন্যথায় বেকারভাতা দেয়া হবে।

৬. ক. সার্বজনীন অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে। দশমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হবে। কম মূল্যে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা হবে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হবে।

খ. জীবনবিমুখ অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ অপসংস্কৃতি বন্ধ করা হবে।

৭. দেশের সকল মানুষের জন্য অভিন্ন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসানীতি চালু করা হবে।

৮. বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি বাতিল করা হবে।

৯. সবরকম অপচয় বন্ধ করা হবে।

১০. নারীসমাজের জন্য জাতিসংঘের নারীর সমঅধিকারের সনদ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ ও কার্যকরী করা হবে। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হবে।

১১. পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক নিপীড়ন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হবে।

১২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হবে।[৩৯]

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন ঃ এই দলের পূর্বনাম ছিল 'বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ'। ১৯৮৩ সালের ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত দলের জাতীয় কাউন্সিলের ৪র্থ অধিবেশনে উক্ত নাম সংশোধনপূর্বক 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' করা হয়।[৪০] এই সংগঠনের মতাদর্শ ও কর্মসূচি নিম্নরূপ-

(১) মৌলিক বিশ্বাস ঃ এই সংগঠনের মৌলিক বিশ্বাস-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসুল। একমাত্র আল্লাহ্ই সকল প্রকার সার্বভৌমত্বের অধিকারী। মুহাম্মদ (দঃ) এই জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির নেতা। কুরআন ও সুন্নাহই আইনের উৎস।

(২) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশে আল্লাহ্র দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

(৩) দাওয়াত ঃ এই সংগঠন যাবতীয় স্বৈরাচার, জালেম, শোষক ও তাগুতি শক্তিকে অস্বীকার করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব, রাসুলের নেতৃত্ব কবুল ও জীবনের সকল পর্যায় থেকে অসৎ-অযোগ্য ও খোদাদ্রোহী নেতৃত্বের উৎখাত ও সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের মূলোৎপাটন করে সৎ, খোদাভীরু, দক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনসাফভিত্তিক ইসলামী সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাধারণভাবে সকল নাগরিকদের প্রতি এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায়।

(৪) কর্মসূচি ঃ এই সংগঠনের কর্মসূচি হলো-

(ক) ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন

(খ) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা

(গ) ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

(ঘ) ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন

(ঙ) মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির অব্যাহত চেষ্টা।[৪১]

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঃ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস বাংলাদেশের অন্যতম একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। এই দলের গঠনতন্ত্রে দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া এবং আখেরাতের মুক্তি ও প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায় হিসাবে বাংলাদেশ খেলাফত

Dhaka University Institutional Repository

মজলিস প্রচলিত অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রথমে বাংলাদেশে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে চায়।'৪২ এই দলের মৌল কর্মনীতি হলো, সকল বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ।৪৩ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই দলের কর্মসূচি নিম্নরূপ-

(১) বাংলাদেশে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনগণকে 'জেহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্'র জন্য সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা।

(২) দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং সর্বস্তরের জনগণকে দ্বীন পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

(৩) খেলাফত মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের আদর্শিক সচেতনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্র খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলা।

(৪) বাংলাদেশের জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনগণের সকল প্রকার মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

(৫) শোষিত-বঞ্চিত-মজলুম নারী, পুরুষ ও শিশুদের সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা এবং আর্ত-মানবতার সেবায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে সচেষ্ট থাকা।

(৬) দেশের প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শহীন, সুবিধাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ, ফাসেক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হক্কানী ওলামা, দ্বীনদার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

(৭) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মৌলিক মানবিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো।

(৮) মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রকার বিরোধ-বিভেদ অবসান এবং ইসলামের জন্য কর্মরত বিভিন্ন দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো।

(৯) সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতা, মজলুম জাতিসমূহের পক্ষাবলম্বন এবং সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষে জনমত গঠন।৪৪

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ঃ বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন গঠিত হয় ১৯৮২ সালে। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আহমদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর। তিনি ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণপূর্বক পরাজিত হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ৩,৮৭,২১৫টি ভোট পান।৪৫ ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে এই দল ৪৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে সবগুলো আসনেই পরাজিত হয়। তাদের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৯৩,০৪৯ এবং জামানত হারানো প্রার্থীর সংখ্যা ৪১।৪৬ ১৯৯১ সালের পর থেকে দলটি অন্যান্য কয়েকটি ইসলামভিত্তিক দলের সাথে যৌথভাবে ইসলামী ঐক্যজোট নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে। দলের সভাপতি হাফেজ্জী হুজুরের মৃত্যুর পর নেতৃত্বের কোন্দলকে কেন্দ্র করে দলটি ভেঙে চারটি পৃথক দলে পরিণত হয়। একভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে মওলানা আহমদউল্লাহ আশরাফ। অন্য তিনটি ভাগের নেতৃত্বে যথাক্রমে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী এবং মুফতি ইজাহারুল ইসলাম।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ঃ এই সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ ফজলুল করিম যিনি সাধারণভাবে পীরসাহেব চরমোনাই নামে পরিচিত। বর্তমানে এই সংগঠনের একটি সক্রিয় ছাত্র সংগঠনও রয়েছে, যার নাম ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন,

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও নেজামে ইসলাম একত্রিতভাবে ইসলামী ঐক্যজোট গঠনপূর্বক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ৩টি আসনে জয়লাভ করে।৪৭

নেজামে ইসলাম ঃ নেজামে ইসলাম-এর জন্ম ভারত বিভাগোত্তর পশ্চিম পাকিস্তানে। দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। পরবর্তীতে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত মাওলানা আশরাফ আলী এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত মৌলভি ফরিদ আহমেদ উক্ত দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে নেজামে ইসলাম-এর সভাপতির দায়িত্বে আছেন ব্যারিস্টার কোরবান আলী। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে অংশগ্রহণ করে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২টি আসন লাভ করে।৪৮ ১৯৫৩ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম যুক্তভাবে ১০ দফা দাবীনামা উপস্থাপন করে। এ সকল দাবীর মধ্যে ছিল-

১. দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের আজাদীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন;
২. কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন;
৩. শরিয়তবিরোধী সকল আইন বাতিল।৪৯

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারী তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও এনডিএফ-এর সাথে নেজামে ইসলামও একত্রিত হয়ে Combined Opposition Parties (COP) গঠন করে এবং মিস ফাতেমা জিন্নাহ্কে আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনোনীত করে।৫০ কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ও দখলদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞে সমর্থন জানিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়।

মুসলিম লীগ ঃ মুসলিম লীগ বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন। তৎকালীন বিভাগ-পূর্ব ভারতবর্ষে ১৯০৬ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্র নেতৃত্বে দলটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ভারত বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন হিসেবে দলটি কার্যক্রম চালাতে থাকে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে সম্মিলিত বিরোধী জোট যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয়। নির্বাচনে সর্বমোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে (মুসলিম আসন ২৩৭, সংখ্যালঘু আসন ৭২) যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি ও মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে।৫১ পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ ভেঙে কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই তিনটি গ্রুপই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং দখলদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞে সমর্থন জানিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার দেশে সকল প্রকার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে মুসলিম লীগও কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে জারীকৃত রাজনৈতিক দলবিধির সুযোগে আবদুস সবুর খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৮২ সালের ২৫ জানুয়ারী আবদুস সবুর খানের মৃত্যুর পর দলটি মুসলিম লীগ (মতিন), মুসলিম লীগ (কাদের), মুসলিম লীগ (আয়েনউদ্দিন) ও মুসলিম লীগ (ইউসুফ) নামে চারটি পৃথক উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র মুসলিম লীগই তুলনামূলকভাবে উদার চরিত্রের। এই দলটি মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী হলেও কোনরূপ ধর্মভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন কিংবা ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করে না। বরং পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ভাবধারায় দলটি পরিচালিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ) ঃ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারি। তিনি ২০০৫ সালের গোড়ার দিকে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগপূর্বক উক্ত নতুন দল গঠন করেন। দলের উপদেষ্টা ও প্রেসিডিয়াম সদস্য হলেন আলহাজ্ব সৈয়দ মুনঈম হোসাইন চিশতি, শাহজাদা সৈয়দ গোলাম মোসাব্বির হোসাইনী চিশতি ও আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুল বশর

Dhaka University Institutional Repository

মাইজভান্ডারি প্রমুখ। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব শাহজাদা সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী। দলটি গত ৩০ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে পল্টন ময়দানে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি ঃ এই সংগঠনগুলো বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ, অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু জাতীয়ভিত্তিক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার মত জনসম্পৃক্ততা কিংবা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করার মত সাংগঠনিক বিস্তৃতি এ দলগুলোর নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৪ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল সি, আর, দত্ত (অবঃ)। বাকি দুটো সংগঠনের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু লীগ ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যথাক্রমে ৬টি ও ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয় ।৫২ নির্বাচনে তাদের মোট আটজন প্রার্থীই জামানত হারায়

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বেশকিছু বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। যে সকল বিষয়ে বিরোধ নেই, সেগুলো হলো-

(১) বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা;
(২) নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি;
(৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা;
(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান;
(৫) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমঅধিকার;
(৬) মৌলিক চাহিদাপূরণ;
(৭) নারী ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(৮) মানবসম্পদের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান;
(৯) দারিদ্র্য দূরীকরণ;
(১০)মুদ্রাস্ফীতি রোধ;
(১১)বিচার বিভাগের স্বাধীনতা;
(১২)রেডিও-টিভির নিরপেক্ষতা;
(১৩) শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা;
(১৪)বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ;
(১৫)প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার;
(১৬)সহজলভ্য চিকিৎসাসুবিধা প্রদান।

তবে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কর্মসূচিগত অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে কর্মসূচিগত অনেক অমিলও রয়েছে। যেমন, আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকান্ডের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। বামদলগুলো বেকারভাতা চালু করতে চায়। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের আলোকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে চায়। এসব বিষয়ে দলগুলোর মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

২.৪ রাজনৈতিক দলের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্যে আপাতদৃষ্টিতে জনগণকে রাজনীতিসচেতন বলে মনে হলেও কার্যত এই বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক দলের অধিকাংশই জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের বিকাশের ধারায় ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬-এই দুটি বছর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে অন্যান্য দলগুলোকে বিলুপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর) নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা সংযোজন করা হয় ।৫৩ এই ধারা জারি করার পরপরই অনেক

Dhaka University Institutional Repository

নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন ১৯৭৬ সালের দলবিধি জারি করার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মূলত দেশের প্রধান প্রধান বিরোধী দলে ভাঙন সৃষ্টি করে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি হাস্যকর ও সংকটজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।৫৪ পিপিআর-এর প্রয়োগের ফলে পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়–যাদের অধিকাংশেরই বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য ছিল বিরোধিতার নামে শাসকদলের হাতকে শক্তিশালী করা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধি বাংলাদেশে প্যাডসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পেছনে প্রধানত কাজ করেছে। ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণের তাগিদও নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের অন্যতম কারণ। তাছাড়া শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকার কারণেও অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে।

২.৫ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নাম ও পরিচিতি ঃ বর্তমান গবেষণায় জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্বমোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যেমন,

১. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২. মুসলিম লীগ (কাদের)
৩. মুসলিম লীগ (মতিন)
৪. মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
৫. মুসলিম লীগ (জমির আলী)
৬. জাতীয় খেলাফত পার্টি
৭. বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
৮. পাকমন পিপলস পার্টি
৯. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
১০. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (মুফতি আমিনী)
১১. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজুল হক)
১২. খেলাফত আন্দোলন (আশরাফ)
১৩. খেলাফত আন্দোলন (ইজাহারুল ইসলাম)
১৪. বাংলাদেশ ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি
১৫. বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন
১৬. জাতীয় ওলামা ফ্রন্ট
১৭. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
১৮. মুসলিম লীগ ঐক্য
১৯. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন
২০. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
২১. বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট
২২. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
২৩. বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি
২৪. আওয়ামী উলেমা পার্টি
২৫. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি
২৬. মুসলিম জাতীয় দল
২৭. বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি
২৮. মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল
২৯. বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা-ই-ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

৩০.জাতীয় উলেমা দল
৩১.বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ
৩২.বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)
৩৩.বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ
৩৪.বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাইদ)
৩৫.নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)
৩৬.নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ)
৩৭.বাংলাদেশ ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক দল
৩৮.জেহাদ পার্টি
৩৯.বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ
৪০.মুসলিম পিপলস পার্টি
৪১.বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি
৪২.বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট
৪৩.মুসলিম পিপলস পার্টি
৪৪.বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনীতিক পার্টি
৪৫.জামায়াতে-ই-রাব্বানিয়া-আসমা পার্টি
৪৬.ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি
৪৭.হুকুমতে রাব্বানী পার্টি
৪৮.ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি
৪৯.ইসলামী গণআন্দোলন
৫০.ইসলামী কৃষক পার্টি
৫১.বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি
৫২.ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট
৫৩.বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

২.৬ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ ও কর্মসূচিগত বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ ও কর্মসূচি বিশ্লেষণপূর্বক তাদের মধ্যে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ঃ

৮. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা
   ক. আল্লাহ্ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি
   খ. কোরআন সুন্নাহ্র আইন জারি
৯. ঈমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করা
   ক. খোদাবিমুখ অসৎ লোকদের নেতৃত্ব খতম করা
   খ. সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন কায়েম করা
১০.বাংলাদেশের আজাদির হেফাজত করা
১১. আইন-শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে বহাল রাখা
১২.ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুকরণ
১৩.ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন
১৪.কোরআন হাদিস অনুযায়ী মহিলাদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ[৩৬]
১৫.বাংলাদেশে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।
১৬.ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা
১৮. ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
১৯. ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন
২০. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত চেষ্টা।
২১. বাংলাদেশে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনগণকে 'জেহাদ ফিসাবিলিল্লাহ'র জন্য সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা।
২২. দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং সর্বস্তরের জনগণকে দ্বীন পালনে উদ্বুদ্ধ করা।
২৩. খেলাফত মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গেও আদর্শিক সচেতনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদেও আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেওকে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলা।
২৪. বাংলাদেশের জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনগণের সকল প্রকার মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।
২৫. শোষিত-বঞ্চিত-মজলুম নারী, পুরুষ ও শিশুদেও সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা এবং আর্ত-মানবতার সেবায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে সচেষ্ট থাকা।
২৬. দেশের প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শহীন, সুবিধাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ, ফাসেক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বেও অবসান ঘটিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হক্কানী ওলামা, দ্বীনদার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গেও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
২৭. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মৌলিক মানবিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো।
২৮. মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রকার বিরোধ-বিভেদ অবসান এবং ইসলামের জন্য কর্মরত বিভিন্ন দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো।
২৯. সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদেও বিরোধিতা, মজলুম জাতিসমূহের পক্ষাবলম্বন এবং সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে জনমত গঠন।

২.৭ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পার্থক্য ঃ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে উভয়প্রকার রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটি সারণীর সাহায্যে উক্ত পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

ছক-১

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের পার্থক্য

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
১.একটি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।	১.ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।
২.রাষ্ট্র ও সরকারকে পুরোপুরিভাবে একটি বিশেষ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে।	২.রাষ্ট্র ও সরকারকে কোন বিশেষ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে না। বরং রাষ্ট্রের ও সমাজের অভ্যন্তরে একাধিক ধর্মের অস্তিত্ব ও সহাবস্থান স্বীকার করে নেয়।
৩.একটি বিশেষ ধর্মের আলোকে প্রণীত	৩.জনগণের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচি নির্বাচকদের সামনে হাজির করে।	অন্যান্য সমস্যার আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচি নির্বাচকদের সম্মুখে পেশ করে।
৪.রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশ্বাসী।	৪.ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমানাধিকারে বিশ্বাসী।
৫. সমাজ জীবনের যাবতীয় সমস্যা ও তার সমাধানসমূহ ধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করে থাকে।	৫.সমাজ জীবনের যাবতীয় সমস্যা ও তার সমাধানসমূহ বাস্তব ও ইহজাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে থাকে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৫০
২। রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, ভূমিকা অংশ।
৩। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৫৫-৫৬
৪। ড. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৪২৫
৫। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭১।
৬। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৯৮-৯৯
৭। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭৫।
৮। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৬২
৯। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৫ জানুয়ারী, ১৯৮৮
১০। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৮৬
১১। Parliamentary Elections in Bangladesh, 27 February, 1991, The Report of the Commonwealth Observer Group, pp. 56-59
১২। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
১৩। দৈনিক বাংলা, ১১ জানুয়ারী, ১৯৭২
১৪। S. R. Chakravarty, *Bangladesh : The Nineteen Seventy Nine Election* (South Asian Publishers, New Delhi, 1988), P. 73
১৫। Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics-The Shahabuddin Interregnum* (UPL., Dhaka, 1993), P. 54
১৬। ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আষাঢ় ১৩৭৯
১৭। দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১
১৮। S. R. Chakravarty, *Bangladesh : The Nineteen Seventy Nine Election* (South Asian Publishers, New Delhi, 1988), P. 73
১৯। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১ জুন, ১৯৮১
২০। Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics- The Shahabuddin Interregnum* (UPL., Dhaka, 1993), P. 11
২১। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০
২২। Muhammad A. Hakim, H P. 54
২৩। Ibid, P. 122
২৪। The Bangladesh Observer, January 29, 1991

Dhaka University Institutional Repository

২৫। Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics- The Shahabuddin Interregnum* (UPL., Dhaka, 1993), P. 11
২৬। Ibid, P. 20
২৭। Ibid, P. 20
২৮। Ibid, P. 25
২৯। Ibid, P. 55
৩০। Ibid, P. 22
৩১। দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১
৩২। Far Eastern Economic Review, (Hongkong, March 14, 1991), p. 12
৩৩। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৩৪। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৩৫। তরজমানুল কোরআন, ১৯৩৪, ডিসেম্বর সংখ্যা
৩৬। জামায়াতে ইসলামী প্রচার পুস্তিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
৩৭। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৯১
৩৮। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় প্রচারপত্র
৩৯। পাঁচদলের ঘোষণা ও কর্মসূচি, ৩ জানুয়ারী ১৯৮৭
৪০। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর গঠনতন্ত্র, ভাইনামিক প্রেস, ঢাকা, পৃঃ ৫
৪১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫-৬
৪২। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর গঠনতন্ত্র, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯৭, পৃঃ ৬
৪৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬
৪৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬-৭
৪৫। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
৪৬। প্রাগুক্ত
৪৭। প্রাগুক্ত
৪৮। এস, সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, ঢাকা, ২০০৪, পৃঃ ১৯
৪৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০
৫০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬
৫১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯
৫২। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৫৩। S. R. Chakravarty, *Bangladesh : The Nineteen Seventy Nine Election* (South Asian Publishers, New Delhi, 1988), P. 3
৫৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩.০ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

৩.১ ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস ঃ ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয় মাত্র গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে টাইলর (Tylor)-এর 'আদিম সংস্কৃতি' (Primitive Culture) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনার পূর্বে কয়েকটা প্রাচীন ও বর্তমানে অপ্রচলিত মতবাদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই মতবাদগুলোর বৈজ্ঞানিক মূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য আছে, আর সেই কারণেই ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনায় তাদের নির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। এ ব্যাপারে দুটি মতবাদের আলোচনা প্রয়োজন, যেগুলো বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও একসময় বহুল প্রচলিত ছিল। এ দুটি মতবাদ হলো (১) ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ (Theory of Revelation) এবং (২) অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism)।

(১) ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ (Theory of Revelation) ঃ ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদ অনুযায়ী ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল কোন আদিম ও বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ থেকে। ঈশ্বর বহু প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং ধর্মীয় আদেশ প্রেরণ করেছিলেন। সেই বিশেষ ব্যক্তি পরবর্তীকালে ঈশ্বরের আদেশ-উপদেশ মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। অতএব এই মতানুসারে ঈশ্বর-আদিষ্ট ব্যক্তিরাই জগতে ধর্মের প্রচার করেছেন। মানুষের মন যেন প্রত্যাদেশের পূর্বে ধর্মহীন ছিল এবং ঈশ্বর যেন তার কাছে সহসা ধর্মের তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ ধরনের কল্পনা অমনোবিদ্যাসুলভ। কারণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের পূর্বে মানুষের চেতনা ধর্মশূন্য ছিল এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কি করে তার পক্ষে ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্মের তত্ত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হলো? যে মন বা চেতনার স্বরূপের মধ্যে ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই, সেই মন বা চেতনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বাইরে থেকে আসা ধর্মের তত্ত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব। অবশ্য প্রত্যাদেশবাদে ধর্মের বাস্তবতার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম যে মানুষের ব্যক্তিগত কল্পনা ও ইচ্ছাপ্রসূত ব্যাপার নয়, মানবজীবনে ধর্মচেতনার যে একটি বাস্তব ভিত্তি আছে, তা এই মতবাদে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ধর্ম যদি প্রকৃতই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের চেতনার কাছে এসে থাকে, তাহলে তা এসেছে পর্যায়ক্রমে মানুষের চেতনার ক্রমবিবর্তনের পথে। বিবর্তনবাদ এ কথা প্রমাণ করেছে যে, সবকিছুর মত মানুষের মনেরও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিককালে। আধুনিক সুসভ্য, সুসংস্কৃত মানুষের কাছে যা সহজগ্রাহ্য, আদিম মানবের চেতনায় তা ছিল দুর্বোধ্য, অজ্ঞেয়। সুতরাং ধর্মের আদিম রূপ যে প্রত্যাদেশের মত এত সুসম্পূর্ণ ও সুসংহত ছিল না তা সহজেই অনুমান করা যায়।

(২) অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism) ঃ এই মতটি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মত। এঁরা প্রত্যাদেশবাদ খন্ডন করে মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তি ক্ষমতার মধ্যে ধর্মের উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। এঁদের মতে ধর্মের মূল সত্যগুলো অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতা, নীতির প্রাধান্য ইত্যাদি সত্যগুলো যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যেহেতু বুদ্ধি ও যুক্তি ক্ষমতা মানুষের সহজাত, অতএব এসব সত্য স্বাভাবিকভাবেই আদি মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ধূর্ত পুরোহিত সম্প্রদায় অনুষ্ঠানগত ও আচারগত ধর্মের সৃষ্টি করে। এসব পুরোহিতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাস ও ভয়ের সুযোগ নিয়ে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ও তাদের উপর কর্তৃত্ব করা। সুতরাং বিশুদ্ধ ধর্ম ছিল আদি মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম পুরোহিত প্রবর্তিত প্রথা ও অনুষ্ঠানের দ্বারা দূষিত হয়নি। সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মই পুরোহিতদের কপটতা ও স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য নয় বলে অনেকে মনে করেন। যদিও এ কথা ঠিক যে, পুরোহিতগণ অনেক সময়ই মানুষের ধর্মীয় আবেগকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে মানুষ পূর্ব থেকেই ধর্মীয় ভাবনায় ভাবিত ছিল বলেই। যা

Dhaka University Institutional Repository

স্বাভাবিকভাবে মানুষের চেতনার মধ্যে বর্তমান ছিল তাই তারা কাজে লাগিয়েছে এবং এখনও লাগাচ্ছে। পুরোহিতশ্রেণী ধর্মের স্রষ্টা নয়–ধর্মের রক্ষাকর্তা। ধর্মের প্রকৃত প্রবক্তা ও স্রষ্টা ছিলেন মহাপুরুষ ও অবতারগণ। এঁদের কেউ ধর্মের আচারগত দিকটার বিশেষ কোন মূল্য দেননি। প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ ধর্মের ঐতিহাসিক উৎপত্তিই পুরোহিতদের থেকে হয়নি। এই অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (উবরংস) অবশ্য খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করেনি এবং বাইবেলকেও অগ্রাহ্য করেনি। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে খ্রিস্টীয় প্রত্যাদেশ বা বাইবেলে এমন কিছু নেই বা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য নয়। অবোধ ও রহস্যময় প্রত্যাদেশকেই তারা সমালোচনা করেছেন। বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করায় এবং ধর্মকে স্বাভাবিক মনে করায় এই ঈশ্বরবাদীদের এক অর্থে বুদ্ধিবাদী বলা হয়। তাদের মতবাদকে স্বভাববাদও বলা চলে। যাই হোক, অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের মতে ধর্মের দুটি প্রধান উৎস–মানুষের বুদ্ধি হলো স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ধর্মের উৎস এবং পুরোহিতদের স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা হলো আচারগত ঐতিহাসিক ধর্মগুলোর উৎস। স্বাভাবিক ধর্ম বলতে তারা সমস্ত ধর্মের মধ্যে যেসব সাধারণ বা সামান্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেগুলোর কথা বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ, তাদের মতে এগুলোই হলো সমস্ত ধর্মের মূল কথা। এই মতবাদ সরবেরির লর্ড হার্বার্ট (Lord Herbert of Cherbury) ও জন টুল্যান্ড (John Toland) প্রথম প্রবর্তন করেন। পরে অবশ্য কিছু ফরাসী চিন্তানায়ক এই মত গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। এই বিষয়ে প্রথমোক্ত দুই দার্শনিকের লেখা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৬৬৩ ও ১৬৯৩ সালে (সূত্র ঃ ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ্, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, ঢাকা, পৃ: ১১-১৩)।১

ধর্ম সংক্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হলো, (১) প্রবর্তিত সর্বপ্রাণবাদীয় মতবাদ (Animism) ও (২) প্রেতবাদ (Ghost Theory)। টাইলরের (Tylor) 'আদিম সংস্কৃতি' (Primitive Culture) নামক পুস্তকে 'প্রবর্তিত সর্বপ্রাণবাদীয় মতবাদ' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। তাঁর এই গ্রন্থকে এ বিষয়ে প্রথম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাথমিক গ্রন্থ বলে ধরা হয়। দু'খন্ডে রচিত টাইলর-এর এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। টাইলর এই গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের কোন এক স্তরে মানুষ পর্বত, গাছ, নদী, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে তার নিজের মত সজীব বলেই মনে করত। এইসব প্রাকৃতিক বস্তুর উপর তিনি তার নিজের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা আরোপ করতেন। তিনি কল্পনা করতেন যে, তাঁর নিজের ক্রিয়াকলাপ যেমন তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, ঠিক সেভাবেই প্রাকৃতিক বস্তুগুলোর ক্রিয়াকলাপের মূলেও তাদের ইচ্ছা কাজ করে থাকে। আর টাইলরের মতে, এই ধরনের প্রাণবাদী ধারণাকে ভিত্তি করেই আদিম মানুষের জীবনে ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। মানুষ যখন কল্পনা করতো যে, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্ত বস্তুই সজীব ও সপ্রাণ, তখন সে তাদের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে, যাদের সে বিশেষভাবে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করতো, সন্তুষ্ট করতে চাইতো এবং যাদের সে দুষ্ট বা শত্রু বলে কল্পনা করতো, তাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতো। এসব বিভিন্ন নৈসর্গিক শক্তির সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই আদিধর্মের সৃষ্টি।

অবশ্য টাইলরের এই মতবাদ নির্বিচারে গ্রহণীয় হয়নি। অনেকের মতে সর্বপ্রাণবাদ ও ধর্ম ঠিক এক জিনিস নয়। বরং সর্বপ্রাণবাদকে একধরনের আদিম বা প্রাথমিক দর্শন বলা যেতে পারে। তবে এ কথা ঠিক যে টাইলর নিজেও সর্বপ্রাণবাদকে প্রাথমিক ধর্ম বলেননি। তাঁর মতে সর্বপ্রাণবাদ হলো আদিধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। তাই অনেকে অনুমান করেন, সর্বপ্রাণবাদ মানুষের মনে ধর্মচেতনা ও ধর্মীয় আবেগের প্রধান উৎস। পূজার মধ্যে পূজারী এমন কিছু পায়, যা তার চেতনা, তার অনুভূতিকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করতে পারে। পূজার মধ্যে আছে নির্বাচন। মানুষ, সে আদিমই হোক আর আধুনিকই হোক, যাকে পূজা করে, শ্রদ্ধা করে, তাকে অপর সকল থেকে পৃথকরূপে দেখে। এই নির্বাচন সবসময়ই কোন না কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং আদিমানবের ধর্মীয় আচরণের মূলেও কোন উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচরণের মূল কথা হলো, মানুষ অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃতিক ধারণা ও সর্বপ্রাণবাদ এক নয়। নদী, পাহাড়, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে সপ্রাণ কল্পনা করলেও এগুলো আদিম মানবের কাছে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলেই বিবেচিত হতো। তবে এগুলোর প্রত্যেকটিই যে তার কাছে শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় ছিল, তা ঠিক নয়। সুতরাং, যাকে সে পূজা করতো, তাকে অতিপ্রাকৃত বলে বিশ্বাস করতো, আর তার সেই বিশ্বাসের সাথে যুক্ত থাকতো

Dhaka University Institutional Repository

রহস্যবোধ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভক্তিমিশ্রিত ভয় ইত্যাদি। সুতরাং, ধর্ম যে সর্বপ্রাণবাদকে ভিত্তি করে উদ্ভূত হয়েছিল, তা নয়, বরং বলা যায়, আদি মানুষের ধর্মচেতনা তাঁর সর্বপ্রাণবাদের ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্যার জেমস ফ্রেজার (Sir James Frazer) বলেছেন, 'Thus a polytheism evolved out of animism, so polytheism in its turn passed into monotheism, the belief in a single sovereign lord of heaven and earth. (Frazer : The Worship of Nature (1926). সূত্র ঃ The History of Religions, E.O. James, Page-6)।২

ধর্মতত্ত্বের পূর্বসূরি হিসেবে হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)-এর প্রেতবাদ বা Ghost Theory মতবাদকে অনেকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই মতের প্রধান প্রবক্তা স্পেন্সার বলেন, 'ধর্মের উৎপত্তি হয় প্রেতরূপে আবির্ভূত পূর্বপুরুষ পূজার মাধ্যমে।' অতি প্রাচীনকাল থেকেই সর্বদেশে মৃত পুরুষের আত্মার প্রতি পূজা-উপাচার ইত্যাদি নিবেদন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। স্পেন্সারের মতে, এটাই ছিল প্রাথমিক ধর্ম। সজীব মানুষের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত মৃত পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে ভীতি থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। তাঁর মতে, সর্বপ্রাণবাদ প্রকৃতপক্ষে এই প্রেতপূজা বা মৃত পূর্বপুরুষ পূজা থেকেই গৃহীত। কারণ, আদি মানুষ কল্পনা করতো যে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষরাই কতকগুলো প্রাকৃতিক বস্তুকে আশ্রয় করে বাস করে এবং এ কারণেই সেসব প্রাকৃতিক বস্তু (নদী, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি) পূজা করা উচিত।

প্রেতপূজা বা মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মার শান্তির জন্য এখনও অনেক ধর্মে এই প্রথা প্রচলিত। হিন্দুদের মধ্যে পিন্ডদান, ভস্মাধারের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিংবা স্মৃতিসৌধ নির্মাণের দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মাকে স্মরণ করার প্রথা এখনও প্রচলিত। ব্রাহ্মণভোজ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদির মাধ্যমে মৃতব্যক্তির পক্ষে সৎকর্ম সাধনও এর আওতাভুক্ত বলা যায়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআনখানি, মিলাদ পড়ানো, চেহলাম ও চল্লিশার মাধ্যমে মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মার শান্তি ও বেহেস্ত নসীবের কামনায় ফকির-দরবেশ ভোজন ও দানখয়রাতের ব্যাপার এখনও প্রচলিত। এমনকি ধর্মীয়ভাবে বিদআদ হওয়া সত্ত্বেও মাজার জিয়ারত, শবে বরাতের রাতে আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃতব্যক্তির কবরপূজাও প্রচলিত আছে। অন্যান্য ধর্মেও পুরোহিত-পাদরীদের দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মার প্রশান্তির জন্য বিস্তর আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। সুতরাং, ধর্মের উৎস না হলেও অঙ্গ হিসেবে এই প্রেতবাদ বা আত্মার প্রশান্তিবাদ বেশ শক্তভাবেই সমাজে একটা স্থান করে নিয়েছে।

তবে এই মতবাদ প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা দিলেও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এই প্রথা গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। কারণ, প্রেতপূজা ও ধর্ম ঠিক এক বস্তু নয়। মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মৃত ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তার উদ্দেশ্যে আচার-উপাচার ইত্যাদি নিবেদন করে। কিন্তু সেই কারণে মৃত পূর্বপুরুষমাত্রকেই সে দেবতা জ্ঞান করে-এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অনেকক্ষেত্রেই মৃতব্যক্তির আত্মাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, যাতে সে কোনরকম ক্ষতির কারণ না হয়। প্রেতপূজা ব্যাপারটা নায়কপূজার আরেক রূপ। কিন্তু নায়কপূজা ও দেবপূজা বা ঈশ্বরপূজা ঠিক এক জিনিস নয়। এমন অনেক আদিজাতি বা উপজাতি আছে, যারা প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রেতকে ঈশ্বর বলে পূজা করে না।

প্রেতবাদ বা Ghost Theory মতবাদকে এখনও আমাদের সমাজ ভালভাবেই জিইয়ে রেখেছে। প্ল্যানচেটের মাধ্যমে এবং মিডিয়ামের মাধ্যমে মৃতব্যক্তির আত্মাকে অন্ধকার ঘরে আহ্বান করে তার সাথে ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিংবা ভূত সম্বন্ধে আলোচনা করার কথা এখনও শোনা যায়। আমরা এখনও অনেকেই বিশ্বাস করি যে, নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতায় ভোগে এবং অদৃশ্যভাবে আবির্ভূত হয়ে হত্যাকারীকে নিধন করার চেষ্টা করে। তারপর শিবের ত্রিশূল কিংবা ক্রাইস্টের ক্রস দেখিয়ে ঐসব প্রেতাত্মার হাত থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

ধর্মের মূল হিসেবে পূর্বপুরুষ পূজা বা প্রেতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে হার্বার্ট স্পেনসার গ্রিক লেখক Euhemeros (খ্রিস্টপূর্ব ৩২০-২৬০)-এর মতবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এই গ্রিক লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন যে, মাউন্ট অলিম্পাসে জিউস ও অন্য গ্রিক দেবতাগণ সেসব মানুষের ভালোই করে গেছেন, যারা ওইসব দেবতাকে পূজা-উপাচারে তুষ্ট করতো এবং তাদের মৃত্যুর পর স্বর্গীয় মর্যাদা দিয়ে স্বর্গে অমরত্ব দেয়া হতো ও দেবতার পর্যায়ভুক্ত করা হতো। সূত্র ঃ(The History of Religions, E.O. James, Page-6) ।৩

Ghost সম্বন্ধে Bible Dictionary-তে বলা হয়েছে, 'The spirit of a man as distinguished from the physical body. The Bible speaks of giving up or yielding up the ghost when it refers to death as of Abraham (Gen. 25:8), Isaac (Gen 35:29), Job (3:11), Jesus (Matt. 27:50) etc. Holy Ghost is used in the A.V. (Authorised Version) for the third person of the Trinity."৪

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবরা প্রেতবাদে বেশ বিশ্বাসী ছিল। Encyclopedia of Religions and Ethics থেকে দেখা যায়, 'Besides the Gods to whom they devoted a regular cult, the ancient Arabs recognised a series of inferior spirits, whom they conciliated or conjured by magical practiced...It may be said however, that the Quran traces out all the main divisions of the system : angels, servants of Allah, Satan and his horde who animate the images of false gods, lastly the jinns, some of whom are believers and some unbelievers...From Judaism and Christianity Islam learned the names of spirits not known before and it gave them definite forms, in descriptions which grew in bulk during the favourable stages of anthropomorphism (প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপবাদ) and the haushiya, and then gained in coherence (সঙ্গতিশীল হওয়া) under the influence of Mutazilitism.'৫

ধর্মতত্ত্ববিদগণের মতে 'টোটেম প্রথা'ই (Totemism) পৃথিবীর প্রাচীনতম পূজাপদ্ধতি। উত্তর আমেরিকার লোহিত ভারতীয় (Red Indian) জাতির মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের কাছে 'টোটেম' একজাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ এবং দৃষ্টান্ত বিরল হলেও কখনও কখনও তা জড়বস্তু যার সাথে তারা বংশগতভাবে সম্পর্ক স্বীকার করে থাকে। তারা মনে করে যে, এ জাতীয় প্রাণী (সর্প, বৃষ, মেষ ইত্যাদি) তাদের সমগোত্রীয় এমনকি তাদের পূর্বপুরুষ। এই 'টোটেম'-এর সাথে সম্পর্ক থাকার জন্যই তারা নিজেদের একই গোষ্ঠী বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এবং অনেক সময় 'টোটেম' অনুযায়ী তাদের গোত্রের নামকরণও হয়। ডঃ জেমস তাঁর 'History of Religions'-এ বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এ ব্যাপারে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করতো এবং এসব পবিত্র প্রাণীদের যাদের 'টোটেম' বলা হতো, তাদের চিত্র গুহাগাত্রে এঁকে রাখা হতো। আসলে উদ্দেশ্য ছিল গোত্রের বংশবৃদ্ধি।' ডঃ জেমস আরও বলেছেন, 'পোলিওলেথিক সমাজে যদিও গুহাগাত্রে অনেক রকমের প্রাণী ও পশুর চিত্র আঁকা হতো, তাতে মনে করা যাবে না যে এরা টোটেম ব্যবস্থায় প্রভাবিত ছিল। তবুও পশুপ্রাণীর চিত্র যে আঁকা হতো গুহাগাত্রে তার ধারা বা প্রচলনটা 'টোটেম' প্রথার সাথে অভিন্ন ছিল না।'৬

Father Leo Booth তাঁর 'When God Becomes A Drug' পুস্তকে পাপ সম্পর্কে বলেছেন, 'Sin results in alienation from God and others and this has its roots in the Biblieal story Adam and Eve...The symbolism in the story of the Fall implies, that, prior to Eve eating the fruit, Adam and Eve were unified. They were part of each other, as symbolised by Eve having been created from Adam's rib (Page 27).৭

এ ব্যাপারে বাবা জাহাঙ্গীর বাঈমান আল সুরেশ্বরী বলেছেন, 'আদম-হাওয়ার গন্ধম খাওয়া রূপক মাত্র। প্রায় সবাই আবোলতাবোল কথার পাহাড় তৈরি করেছেন। কিন্তু আসলে উহা হলো যৌনমিলন। কারণ গম

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে অনেকটা নারীজাতির লজ্জাস্থানের মতো। অসম্ভব প্রকার শালীনতার আশ্রয় গ্রহণ করতে গিয়ে রূপকের সাহায্য নেয়া হয়েছে আর তারই দরুণ অনেকেই এর আসল অর্থটা বুঝে উঠতে পারেন না।'৮

টোটেম প্রথা সম্পর্কীয় মতবাদ একসময় (উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ) বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রবার্টসন স্মিথ (Robertson Smith)। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সেমিটিয়দের ধর্ম (Religion of the Semites) গ্রন্থে তিনি যুক্তি সহকারে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেন।৯ পরবর্তীকালে জেভন্স (Jevons) তাঁর ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'ধর্মের ইতিহাসের ভূমিকা' (An Introduction to the History of Religions) গ্রন্থেও এই মত সমর্থন করেন।১০ জেভন্স টোটেম প্রথাকে প্রাথমিক ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই প্রাণীপূজার স্তরে মানুষ ছিল একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং বহুবাদ বা বহুদেববাদ পরবর্তীকালে আসে এই বিশ্বাসের বিচ্যুতি থেকে।

আদিধর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে টোটেমবাদ সর্বজনগ্রাহ্য নয়। নৃবিদ্যার আধুনিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মই যে টোটেম প্রথার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে, এ কথা সত্য নয়। যেমন, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বা সিংহলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে টোটেম প্রথা দেখা যায় না। আবার কোন কোন জাতির মধ্যে টোটেম প্রথার প্রচলন থাকলেও টোটেমকে তারা ঠিক দেবতা বা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতো না। তাই অনেকে টোটেম প্রথাকে আদিম ধর্ম না বলে একে একটি আদিম সমাজ ও গোষ্ঠীবন্ধন প্রথা বলে অভিহিত করেছেন। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী দুর্খ্যাঁ (Durkhiem)-এর মতে এটি একটি সামাজিক ব্যাপার। ধর্মের মূল কথা হলো এক রহস্যময় শক্তির অনুভূতি। এই শক্তিকে আদিম মানুষ অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করতো।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে আদিম মানবের মনে ধর্মের উৎপত্তি হয় এক রহস্যময় অতিমানবীয় ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অনুভূতি থেকে এবং তৎসম্পর্কিত আবেগ থেকে-কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তা বা আত্মার ধারণা থেকে নয়। তাই তাদের ধারণা মানুষের মনে প্রথম ধর্মানুভূতির জন্ম একটি প্রাকপ্রাণবাদীয় (Pre-animistic) অবস্থা থেকে। এই Pre-animistic অবস্থাকেই 'মানা' বলা হয়। আধুনিক নৃবিদ ও গবেষকদের মতেও ধর্মের উৎপত্তি হয় প্রাকপ্রাণবাদীয় অবস্থায়, অর্থাৎ যে অবস্থায় মানব মনে 'প্রাণ' ও 'চেতনা' সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট হয়নি। তাদেও মতে ইন্দ্রজাল বা সধমরূপ-এর মতোই ধর্মেও উৎপত্তি হয় আদিম মানব মনে এক বা একাধিক নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময় শক্তিও অস্পষ্ট ধারণা এবং সেই শক্তি বা শক্তিসমূহের প্রতি ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের অনুভূতি থেকে। এই শক্তিকে মেলানেশীয় (Melanesian) দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদেও ভাষায় 'মানা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।১১

'নৃবিদ্যায় 'মানা' শব্দ সর্বপ্রথম সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করেন বিশপ কর্ডিন্টন (Bishop Cordinton) তাঁর The Melanesians গ্রন্থে। বস্তুত আদিমানবের কাছে 'মানা' এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় শক্তি যা অদ্ভুতভাবে কাজ করতে পারে। এই রহস্যময় শক্তিই অসাধারণ ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়। কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজে বিশেষ পারদর্শিতা বা শক্তির পরিচয় দেয়, তাহলে তার মধ্যে মানা আছে বলেই তা সম্ভব বলে মনে করা হয়। এই মানা কোন জড়বস্তুকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে এবং তা ধারণ করলে মানুষ সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এই পদ্ধতি থেকেই মাদুলি বা ঐ জাতীয় বস্তু ধারণ প্রথার প্রচলন হয়। এই মানার জন্যই টোটেম প্রাণীর মধ্যে বিশেষ শক্তি থাকে বা সেই প্রাণী বিশেষভাবে পূজিত হয় এবং টোটেম-আশ্রিত মানাকে আহরণ করার জন্যই বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে 'টোটেম' ভক্ষণ করা হয়। সুতরাং আদিমানবের কাছে মানা কেবল একটি বাস্তব শক্তি মাত্র নয়। মানা হলো এমন একটি শক্তি, যার ব্যাপাওে তার আছে গভীর আবেগ, আছে ভয়মিশ্রিত ভক্তি, আছে বিস্ময়। এই মানার ধারণার মধ্যেই ইন্দ্রজাল বা magic ও ধর্মের এক ও অভিন্ন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাকপ্রাণবাদীয় ধর্ম ছিল অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এক শক্তিও ব্যাপাওে মানুষের ভক্তিমিশ্রিত ভয়, রহস্যবোধ ও বিস্ময় থেকে উদ্ভূত। তাই অতিপ্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের সাথে ম্যাজিকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।'১২

Dhaka University Institutional Repository

দার্শনিক হেগেল বিশ্বাস করেন যে, ধর্মের যুগের পূর্বে ম্যাজিক যুগের প্রচলন ছিল। ফ্রেজার (Fraiser) মনে করেন, একটা সময় ছিল যখন মানুষ চিন্তা করতো যে সে প্রকৃতির সবকিছুকে মন্ত্র বা তুকতাক করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। যখন এই পদ্ধতি বাঞ্ছিত বস্তুকে অর্জন করতে অপারগ হলো, তখন মানুষ অতি মানবীয় বস্তু-যেমন আত্মা (Spirit), দেবতা (Gods) এবং পূজনীয় পূর্বপুরুষেরা (Ancestors) তন্ত্রমন্ত্রের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনে বা প্রাপ্তিতে এইসব অতিমানবীয় বস্তু সাহায্য করতে পারে, এই উপলব্ধিই ম্যাজিক যুগের পরিবর্তে ধর্মযুগের প্রবর্তন করে। তাই তান্ত্রিক ও ম্যাজিশিয়ানরা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে পুরোহিত-পাদরি-মোল্লাদেও জায়গা কে দেয় আর এরাই আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা ও বলিদান-বিসর্জনের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে চেষ্টিত হয়। আর এই পরিস্থিতির পরেই ম্যাজিক যুগের অবসান হয়। ডঃ জেমস (James) বলেছেন, 'The distinction between magic and religion is not chronological. That is to say, magic is not earlier in time than religion since the two approaches to the supernatural order appear always to have coexisted...While religion is personal and supplicatory, magic is coercive, constraining the mysterious forces of the universe by its own machanical manupulation flawlessly performed"[১৩]

বাইবেলে বলা হয়েছে, হিব্রুধর্মে অর্থাৎ সেমিটিক ধর্মে ম্যাজিকের অনুপ্রবেশ ঘটে যখন মিসর থেকে জ্যাকব গোষ্ঠী পালিয়ে এসে কেনানে বসতি শুরু করল। বনি ইসরাইলগণ তখন এই ম্যাজিকের পাল্লায় পড়ে।[১৪] মিসরের ম্যাজিশিয়ানদের দ্বারা মোজেস যে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা আই, জি, ম্যাথিউসের (I. G. Matthews) The Religious Pilgrimage of Israel গ্রন্থেও বর্ণিত আছে।

পবিত্র কোরআন মজিদে আছে, 'তারপর মুসা তার লাঠি ছুঁড়ে ফেলল আর সাথে সাথে সেটি এক অজগর সাপ হয়ে গেল, আর যখন সে তার হাত বের করল তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে উজ্জ্বল শুভ্র মনে হলো।'[১৫]

ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, এ তো একজন ওস্তাদ জাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। এখন তোমরা পরামর্শ দেবে?

তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময় দাও। আর শহরে শহরে যোগানদারদের পাঠাও। তারা তোমাদের সামনে সকল ওস্তাদ জাদুকরকে হাজির করুক। জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে বলল, আমরা যদি জিতি আমাদের পুরস্কার দেবেন তো? সে বলল, হ্যাঁ, তোমরা হবে আমার খুব কাছের (লোক)। তারা বলল, 'হে মুসা! তুমি ছুঁড়বে, না আমরা ছুঁড়ব?' সে বলল, তোমরাই ছোঁড়।

যখন তারা ছুঁড়ল, তখন তারা লোকের চোখে লাগাল ভেলকি, লোকেরা ভয় পেয়ে আর একরকমের বড় ভোজবাজি দেখল। মুসার প্রতি আমি হুকুম করলাম, তুমিও তোমার লাঠি ছোঁড়। হঠাৎ লাঠিটা ওদের ভুয়া সৃষ্টি গ্রাস করে ফেলতে লাগল; ফলে সত্য প্রতিষ্ঠা পেল, আর তারা যা করেছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সেখানে তারা হার মানল ও অপদস্থ হলো। আর জাদুকররা সিজদা করল। তারা বলল, আমরা বিশ্বাস করলাম বিশ্ব প্রতিপালকের ওপর, যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক।'[১৬]

বাইবেলে বলা হয়েছে, 'Daniel, God-inspired interpreter of dreams (1:20, 2:2), displaced Babylonian wisemen, Chaldaeans, Soothsayers and magicians at the court of Nebuchadnezzar and Balshazzar. He became the head of the guild magicians (5:10) because of his excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams.[১৭]

ফ্রেজার তাঁর গ্রন্থ 'Golden Bough' গ্রন্থে বলেছেন, মানব-সংস্কৃতি ও চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে ম্যাজিকের অস্তিত্ব দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নিম্নতর পর্যায়ে এবং ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে। ফ্রেজার মনে করেন, ভাবানুষঙ্গের ভ্রান্ত প্রয়োগ থেকেই ম্যাজিকের উৎপত্তি। ম্যাজিক ও ধর্ম এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। তাই ধর্মের উৎপত্তিতে ম্যাজিকের কোন প্রত্যক্ষ অবদান নেই, আছে পরোক্ষ অবদান। ম্যাজিকের ব্যাপারে মানুষের অসফলতা ও হতাশা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি।

ফ্রেজারের মতবাদের বিরুদ্ধেও মত রয়েছে। ম্যারেট (Marret) তাঁর `Threshhold of Religion' গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন, 'যে সব নিম্নতম সামাজিক সংস্কৃতির তথ্য আমাদের জানা আছে, সেসব ক্ষেত্রে যে অনুষ্ঠান বা আচারগুলোকে ম্যাজিক বলা হয় এবং যে আচার ও অনুষ্ঠানগুলোকে ধর্মীয় বলা হয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। এ জন্য এদের কোন্‌টি সম্পূর্ণ ম্যাজিক আর কোন্‌টি বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচার, তা স্থির করা সম্ভব নয়। কারণ, এই পার্থক্য ভেদ করা আদিম মানুষের অজ্ঞাত ছিল।'[১৮] ফ্রেজারের মতে, ম্যাজিকের অসফলতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, উভয়ের মূল উৎস একই। এই উৎস হলো মানুষের রহস্যময় শক্তির অভিজ্ঞতা। ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো, উচ্চতর শক্তির কাছে বিনম্রতা ও আত্মনিবেদন। অন্যদিকে ম্যাজিকের বৈশিষ্ট্য হলো ঔদ্ধত্য, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অহংকার। উভয়েরই সম্পর্ক অতীন্দ্রিয় ও রহস্যময় শক্তির সঙ্গে। ম্যাজিক এইসব শক্তিকে কাজে লাগাতে বাধ্য করে, কিন্তু ধর্ম প্রার্থনা, পূজা ও অনুনয়ের মাধ্যমে এইসব শক্তির সাহায্যলাভের চেষ্টা করে। ধর্মের দেবতা কেবল অমিত শক্তির আধার নন-তিনি মঙ্গলময়ও বটে। অন্যদিকে ম্যাজিক অনুষ্ঠান মঙ্গলময়ের ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। ধর্ম প্রধানত সামাজিক, এটা মানুষকে পরস্পরের সাথে সামাজিক ও গোষ্ঠীবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু ম্যাজিক অসামাজিক, কখনও বা সমাজবিরোধী এবং গুপ্ত-তাই গুপ্তবিদ্যা বলে পরিচিত। ধর্মের আছে ধর্মীয় সংস্থা (চার্চ, মন্দির, মঠ), কিন্তু ম্যাজিকের কোন সামাজিক সংস্থা নেই।

হিব্রুদের মধ্যে ম্যাজিকের যে আচার-অনুষ্ঠান তা পার্শিয়ান ম্যাগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। মন্ত্র, ট্যাবু এবং অভিশাপ-এগুলো ম্যাজিক-আচারের অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-হিব্রুরা কোন অপবিত্র স্থান বা জিনিসকে 'পবিত্র' করতে 'পবিত্র জল' ব্যবহার করে। এই পবিত্র জলের ব্যবহার কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেও দেখা যায়। মন্ত্রপূত জল বা পানিপড়া দিয়ে অনেক সময় রোগী বা বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার কাজে লাগানো হয়। বাণিজ্যিকভাবেও এসব বিদ্যা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। গঙ্গাজল প্রায়ই 'বিশ্বাসী' ব্যক্তিদের ঘরে বোতলবন্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে তা কাজেও লাগানো হয়।

ধর্মচেতনার অনিবার্যতা মানুষের মনে আছে-তা সে আদিম হোক আর আধুনিক। আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, আদিমকাল থেকে মানুষের মনেই ধর্মচেতনা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং আবশ্যিক। আবশ্যিক এ কথাটার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই ধর্মচিন্তা বা ধর্মপিপাসা থাকবে। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাদের মনে ধর্ম সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নাও থাকতে পারে। মানুষের পক্ষে ধর্ম আবশ্যিক বলতে এটা বোঝানো হয় যে, আত্মসচেতন, বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব অর্থাৎ মানুষের মনে এমন কিছু আছে, যার ফলে মানুষ যে পরিমাণে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে সেই পরিমাণেই সে নিজের সসীম ব্যক্তিত্বের গন্ডি ছাড়িয়ে এক অনন্ত, সর্বগ্রাহী চৈতন্যময় সত্তার সাথে মিলিত হবার জন্য প্রেরণা পায়। J. Caird তাঁর `Introduction to the Philosophy of Religion' গ্রন্থে বলেছেন, `The phrase `necessity of religion' implies that in the nature of man as an intelligent self conscious being there is that which forces him to rise above what is material and finite and to find rest nowhere short of an infinite, all comprehending mind.'[১৯]

Suzanne Haneef (ধর্মান্তরিত মুসলিম) বলছেন, 'Islam is not a mere belief system and ideology or religion in the usual sense in which these words are understood. Rather it is a total way of life, a complete system governing all aspects of man's existences, both individual and collective. It is in fact a religion which frees human beings from domination by their material and animal aspects and makes them truly human'.[২০]

Dhaka University Institutional Repository

ভগবান রজনীশ বলেন, `Religion is neither objective not subjective, Religion conceives of the whole in terms of its wholeness....this wholeness has to be created. Religion is individual truth. You can be a Hindu, a Christian simply by belief. But that is bogus; you are not authentic, simply being born in a Christian family or a Hindu family, you can be a Christian or a Hindu, but whatsoever you believe is borrowed. It is not authentic, you are not true to it.'২১

'ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের 'বিশ্বাস' অন্য ধর্ম থেকে ধার করা, এ সত্যটা দেখা দেয় যখন আমরা পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর উপাদানকে একত্র করে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করি। কিন্তু এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের আবর্তে প্রবেশ করলেও ধর্মান্তরিত মানুষেরা তাদের পূর্ব ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচারগুলো ভুলতে পারে না। নতুন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে বাঁচিয়ে রাখে এবং পালনও করে। ইতিহাসে এর প্রমাণের অভাব নেই। দুর্ধর্ষ টিউটোনিক ও কেলটিক উপজাতি যখন তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মাচার ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, তখন অনেকেরই ধারণা ছিল, এই ধর্মান্তর খ্রিস্টান পাদরিদের প্রচারের জোরেই সম্ভব হয়েছে কিংবা হয়েছে তাদের নেতাদের ইঙ্গিতে। কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা যখন বিষয়টিকে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন, তখন দেখা গেল, এই ধর্মান্তরে সেসব উপজাতির পূর্ব-বিশ্বাসের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু খ্রিস্টবাদের কতগুলো মতবাদ বা ডগমা এদের পুরনো ধর্মবিশ্বাসের মাঝে মিশে গেছে। তারা তাদের পুরনো প্রধান দেবতা 'ওডিন'কে এবং অন্য ছোটখাটো দেবদেবীকে পূজা করার বদলে পূজা করতে লাগল খ্রিস্টকে, ভার্জিন মেরিকে এবং সাধুসন্তদের। এইসব নতুন পূজনীয় দেবতার গুণাবলির মাঝে তারা মিশিয়ে ফেলল তাদের পুরনো দেবদেবীর গুণাবলি; ধরে রাখল তাদের পুরনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং খ্রিস্টানধর্মকে তারা যেন তাদের পুরনো ধর্মের কাঠামোয় ভরে ফেলল। এই ধর্মান্তর শুধু যেন নামের পরিবর্তন, বিশ্বাসের নামাবলি বদল-যদিও খ্রিস্টবাদের নৈতিকতা তাদের বর্বর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু নতুন ধর্মের তত্ত্বকথা ও আচার-অনুষ্ঠান পুরনো ধর্মের সাথে এমনভাবে মিশে গেল যে, আজও পর্যন্ত তাদের আলাদা করে দেখা মুশকিল।'২২

প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর পূর্বে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং মধ্য এশিয়ায় একটি ভ্রাম্যমাণ নীলচক্ষু জাতি বাস করতো। এরা নরডিক জাতি বলে পরিচিত ছিল। এরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার করলেও খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-এর দিকে লোহা আবিষ্কার করে এবং অশ্ব চালনায় পারদর্শী হয়। তাদের পারিবারিক জীবন পরিবারপ্রধানের নেতৃত্বাধীন ছিল। পরবর্তীতে এরাই আর্যজাতি বলে খ্যাত। প্রথমে ভ্রাম্যমাণ হিসাবে জীবন যাপন করলেও শেষে যখন তারা চাষবাসে মন দেয়, তখন কৃষিবিদ্যায় যুগান্তর সৃষ্টি করে।

আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা পূর্ব-পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের একটি শাখা পশ্চিমে পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। অন্যরা এথেন্সে ও ল্যাসডেমে প্রতিষ্ঠা করে গ্রিক সাম্রাজ্য। এরাই গ্রিক জাতি। এদের আর একটি শাখা ইতালীতে প্রতিষ্ঠা করে রোম সাম্রাজ্য। জার্মানীতে আর্য জাতির আর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই জাতির অন্য একটি শাখা মধ্য এশিয়া থেকে হিমালয়ের পাহাড় টপকে পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই প্রধানত ভারতের ব্রাহ্মণকূল ও রাজপূত বংশ।

আর্যরা যেখানেই গেছে, সাথে নিয়ে গেছে তাদের সূর্য পূরাণ (Sun-Myths) এবং তাদের ধর্মের সাথে সূর্য-পুরাণ কাহিনী মিশিয়ে তৈরি করেছে আর একটি ধর্ম। তৈরি করেছে মহাকাব্য, গল্পগাঁথা এবং নার্সারী গীতি, উপকথা। এইসব পুরাণকাহিনীর সাথে প্রাচীন সনাতন ধর্মের (বর্তমান হিন্দু ধর্ম) সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে বহু দেবদেবী ও দৈত্যদানবের কাহিনী। যেমন, পার্সিয়ান দেব দেউ আর জিনদের জন্ম হয়েছে। তেমনি গ্রিক উপকথায় ও কাব্য-কবিতায় জন্ম নিয়েছে জলপরী সাতির, দেবতা, উপদেবতা ও দৈত্যদানব। জার্মানীর বনজঙ্গলে দেখা দিয়েছে বামন (Dwarf) এবং ইংল্যান্ডে গ্রীষ্মের রাতে চন্দ্রালোকে দেখা দেয় ডাইনীদের নৃত্য ও ভবিষ্যৎবাণী (শেক্সপিয়রের নাটকগুলো দ্রষ্টব্য)। তেমনি আয়ারল্যান্ডের পাহাড়-পর্বতে দেখা যায় পরীদের ও অপদেবতাদের।

Dhaka University Institutional Repository

এই আর্যজাতির মধ্যে যারা তাদের প্রাচীন কবিতা, সূত্র, গাথা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে এখনও সূর্য পুরাণে বিশ্বাস রেখে ধর্মকর্ম করে চলেছে, তাদের মধ্যে হিন্দুজাতি অন্যতম। বেদের প্রার্থনার মাঝে কবিরা এখনও বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, সূর্য আবার দেখা দেবে কিনা এবং স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌছানো যাবে কিনা। খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে ১০০০ শতাব্দীতে বেদের প্রার্থনায় সূর্যকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছাড়া সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও শাসনকর্তা হিসেবে ধরা হয়েছে।

প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে সংকলিত সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় যে, বিষ্ণুর অবতার রূপে শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, যে সময় পৃথিবী দুর্দশা ও পাপকর্মে নিমজ্জিত ছিল। তিনি জন্ম নিলেন কুমারী দেবকীর গর্ভে (বিষ্ণু পুরাণ দ্রষ্টব্য)। তাঁর এই জন্ম আকাশের তারা ও স্বর্গের দেবতাদের দ্বারা ঘোষিত হয় এবং মাতা দেবকীর উদ্দেশ্যে স্তবগীতি প্রচারিত হয়। স্বর্গেও অপ্সরীরা নৃত্যগীতে মেতে উঠল আর আকাশ নেমে এসে করল পুষ্পবৃষ্টি। যদিও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যদুরাজ বংশে, তবুও তার জন্ম হলো অন্ধকার গুহার মাঝে যখন তার মাতা সৎ পিতার সাথে শহরে যাচ্ছিলেন রাজার কর পরিশোধ করতে। কৃষ্ণের জন্মের সময় সে গুহা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হলো এবং তার মাতাপিতার মুখ দিয়ে বিচ্ছুরিত হলো স্বর্গীয় আলোকরশ্মি। এই স্বর্গীয় শিশুকে গো-পালকগণ অতিমানব হিসেবে চিনতে পেরে তার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলো এবং চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করলো। তার জন্মের পরেই মহর্ষী নারদ দেখা দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে স্বর্গীয় দেবাংশ-সম্ভূত তা ঘোষণা করলেন। এমনই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সৎপিতার ওপর দৈববাণী হলো যে, রাজা কংস এই শিশুকে হত্যা করতে চায় সুতরাং তিনি যেন শিশুসহ সকলকে নিয়ে যমুনার ওপারে গোকুলে আশ্রয় নেন। যখন তারা সকলে যমুনার তীরে পৌঁছলেন, তখন যমুনার জল সসম্মানে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল (বাইবেলে বর্ণিত মোজেস দলবলসহ লোহিত সাগর পার হওয়ার কাহিনীর সাথে তুলনীয়)। শিশু কৃষ্ণকে বধ করার জন্য রাজা কংস ঐ সময়কার রাজ্যের সকল শিশুহত্যার আদেশ দিয়েছিলেন (শিশু মোজেস ও যিশুকে হত্যার জন্য অনুরূপ রাজাদেশ ছিল)।

শ্রীকৃষ্ণ শিশুকাল থেকেই মিরাকল (মোজেজা) দেখাতে পারতেন যিশুর মতো। যেমন, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মানুষের আরোগ্য লাভ, বোবার মুখে ভাষা দেয়া, অন্ধের দৃষ্টিদান আর বধিরের শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়া। এমনকি মৃতের জীবনদানও এঁরা করে গেছেন। কৃষ্ণকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। অবশ্য মহাভারতে আছে এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীকৃষ্ণ নরক দর্শন করেন। মৃত্যুর তিনদিন পরে তিনি পুনর্জীবন লাভ করে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। কিন্তু বলা হয়, তিনি আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন কল্কিরূপে, পক্ষযুক্ত শাদা ঘোড়ায় চড়ে যোদ্ধার বেশে পৃথিবী জয় করবেন। তারপর পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি বিচারকরূপে মৃতব্যক্তিদের বিচার করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কুমারী মাতা দেবকীকে অদিতিও বলা হয়, ঋকবেদে যাকে উষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। উষার পর পূর্বদিক থেকে উদয় হয় নবসূর্য, তাই উষাকে সূর্যের জন্মদাত্রী বলা হয়। আলেকজান্ডারের সময় থেকে ভারতের মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা চলে আসছে। কৃষ্ণকে দেবতারূপে গ্রহণ করা হয়েছে খ্রিঃ পূঃ ৪০০ বছর আগে, কিন্তু সাধারণ মতে তাঁর ইতিহাসের ঘটনা খ্রিঃ পূঃ ৯০০ বছরে হোমারের সাথে যুক্ত; তবে খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে কৃষ্ণের গল্পগাথাকে যুক্ত করা হয়েছে বাক্কাসের সাথে-অর্থাৎ গ্রিক Dionysos-এর উৎসবের সাথে।

সনাতন ধর্মের প্রাচীন ট্র্যাডিশনের মধ্যে জীবনবৃক্ষকে (Tree of Life) সংস্কৃতে 'সোমা' বলা হতো, যার রস সোমরস নাকি মানুষকে অমরতা এনে দিতো। এই বৃক্ষ পাহারা দিতো প্রেতাত্মারা। বাইবেলের জেনেসিস-এর কথিকায় পাওয়া যায় চেরুবিম (Cherubim) ইডেন উদ্যান পাহারা দিতো এবং তাদের দেবদূত মনে করা হতো। কিন্তু অধুনা প্রমাণিত হয়েছে যে, চেরুবিম দেবদূত কিংবা ফেরেস্তা নয়, একটি কিংবদন্তি পশু, যার দেহ সিংহের মতো আর মাথাটা অন্য পশু কিংবা মানুষের মতো এবং পাখির মতো ডানাযুক্ত। এই বর্ণনা মিরাজের বোরাকের সাথে অনেকখানি মিলে যায়, যার দেহ ঘোড়ার মতো, মুখটা সুন্দরী নারীর আর পিঠে পক্ষযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সনাতন ধর্ম বলে যে, শিব ব্রহ্মাকে প্রলোভিত করার জন্য স্বর্গ থেকে পবিত্র ডুমুর-বৃক্ষের ফুল ফেলে দেন। ব্রহ্মা, স্ত্রী শতরূপা কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে অমরতা ও স্বর্গীয় প্রকৃতি পাওয়ার ইচ্ছায় ঐ ফুল গ্রহণ করলে শিব কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হন। তাই ডুমুর বৃক্ষ জ্ঞানবৃক্ষ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় জাতির কাছে পবিত্র।

হিন্দুদের পুরাণে মহাপ্লাবনের কথা আছে, যা বাইবেলের কথিত নোয়ার প্লাবনের সাথে তুলনীয়। এই প্লাবনের কথা ব্যাবিলনীয় রূপকথায় ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগাথায় পাওয়া যায়। যেমন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেবকাহিনী ও চীনদেশীয় রূপকথায় এই প্লাবনের কথা উল্লেখ আছে।

বাইবেলের স্যামসনের সাথে বলরামের (হলধর) তুলনা করা হয়। হিন্দুধর্মে শক্তিদেবকে এক বিরাট মাছে গিলে ফেলে, পরে তিনি অক্ষত দেহে বের হয়ে আসেন। তেমনি বাইবেলে জোনাকে (Jonah) তিমিতে খেয়ে ফেললেও তিনি জীবিত ছিলেন। সূর্যকে 'জোনা' নামে অভিহিত করা হয় এবং পৃথিবীকে মাছের সাথে তুলনা করা হয় (সূর্যগ্রহণ দ্রষ্টব্য)। সনাতন ধর্মে অনেক ঋষি, মহর্ষী সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন, তেমনি হিব্রুর এলাইসা (Elisah) স্বর্গে আরোহণ করেন। হিব্রুতে যোশুয়া (Joshua) সূর্যের গতিরোধ করেছিলেন। তেমনি বিন্ধ্যপর্বতও সূর্যের গতিরোধ করে। পরে অগস্ত্য মুনি সূর্যকে মুক্ত করেন।২৩

৩.২ মানব ইতিহাসের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহ ঃ

বৌদ্ধধর্ম ঃ বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত ধর্মগুলোর অন্যতম। অনুসারীদের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে এই ধর্মের স্থান দ্বিতীয়। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তকের নাম গৌতম বুদ্ধ যিনি ভক্তদের মাঝে বুদ্ধদেব নামেই সর্বাধিক পরিচিত। গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান নেপাল ও বিহারের সীমান্তবর্তী রাজ্যে। অন্য এক স্থানে আছে, `Five hundred and sixty years before Christ a religious reformer appeared in Bengal-Buddha'।২৪ কথিত আছে, বুদ্ধদেব মায়াদেবীর দক্ষিণাংশ ভেদ করে বের হয়ে আসেন। তাঁর জন্মের সাতদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। বুদ্ধের পারিবারিক নাম ছিল গৌতম। শাক্যবংশের গৌরব বা সিংহসদৃশ মহাপুরুষ বলে আর এক নাম ছিল শাক্যসিংহ। এছাড়া শাক্যমুনি, সুগত, জিন (বিজয়ী), ভার্গব এরূপ আরও অনেক নাম ছিল।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে কুমারী মহামায়ার কাছে এক দেবদূত এসে বললেন ঃ দেখো বাছা, তুমি এমন একটি সন্তান ধারণ করবে যে রাজকীয় বংশের কুমার হয়েও সংসারধর্ম ছেড়ে 'বুদ্ধ' হবেন এবং মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবেন।

মহামায়া লজ্জিত হয়ে বললেন, 'হে দেবদূত, আমি তো কুমারী, বিবাহিত নই-সুতরাং...।'

দেবদূত বললেন, 'চিন্তার কোন কারণ নেই ভদ্রে, সবই প্রজাপতির ইচ্ছা। তুমি সৌভাগ্যবতী।' এই বলে দেবদূত অন্তর্হিত হলেন।

বুদ্ধের জন্মের সময় সেই নির্দিষ্ট তারকার আবির্ভাব হয়েছিল এবং স্বর্গ থেকে বহু দেবদেবী নেমে এসে তার জন্মোৎসবে মেতেছিল। বলা হয়েছিল : A hero, glorious and incompatible, has been born, a saviour unto all nations of the earth.২৫

বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন ২৫ ডিসেম্বর, যখন নতুন সূর্য ওঠে। ডিসেম্বরে মকর রাশি (২১ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারী)-কে হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঋকবেদেও মার্তন্ডের শিশুকে সূর্য বলে ধরা হয়। যেমন, সেখানে বলা হয়েছে, `The elephant (Marttanda of Rig-Veda) is the symbol of his son, the solar God-man; therefore Buddha comes to earth in the form of an elephant.'২৬

কথিত আছে, বিশাখা তারা থেকে বোধিসত্ত্ব শুভ্র হস্তী শাবকের আকারে নেমে এসে মহামায়ার শরীরের দক্ষিণদিকে প্রবেশ করে। এ ঘটনা মহামায়াও স্বপ্নে দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, বোধিসত্ত্ব প্রবেশের সঙ্গে একটা পদ্মফুলের আবির্ভাব হয়, যা ব্রহ্মার প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধ এক পূর্বজন্মে হস্তীদের রাজা ছিলেন। তাঁর দুই রাণী ছিল সুভদ্রা আর মহাসুভদ্রা। মহাসুভদ্রা ছিল বুদ্ধের প্রিয় রাণী। সেই জন্য সুভদ্রা তাকে হিংসা করতো। ইতোমধ্যে সুভদ্রা মারা গেল এবং পরজন্মে কাশীর মহারাণীরূপে জন্মলাভ করল। একদা সে এক শিকারীকে হাতির দাঁত আনার জন্য বনে পাঠাল। শিকারী খুঁজে খুঁজে হস্তীরূপী বুদ্ধকে বের করল। তার নিকট সব কথা শুনে বুদ্ধ নিজেই তাঁর দাঁত কেটে শিকারীকে দিলেন। কিন্তু যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি মারা যান। এই গল্পটির নাম 'ছন্দক দাতক'। সাঁচী স্তূপের পশ্চিম তোরণে সহচরসমেত হস্তীরূপী বুদ্ধের চিত্র খোদাই করা আছে।২৭

বুদ্ধ তাঁর মত প্রচারের পূর্বে রুদ্রক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর তিনি উরুভেলায় তপস্যা শুরু করে উপবাস করেন। পরে নিরঞ্জন নদীতে স্নান করেন। তিনি যখন তপস্যা শুরু করেন, তখন 'মার' অর্থাৎ দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান তাঁকে প্রলুব্ধ করে ফেরাতে চেয়েছিল। কিন্তু বেদের মন্ত্রের জোরে শয়তান তার চেষ্টায় সফল হয়নি। বুদ্ধত্ব লাভের পর দেবদূতেরা তাঁকে অভিবাদন জানায়।

পবিত্র ডুমুর বৃক্ষের তলে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য সংগ্রহ শুরু করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জুডাস-এর মতো (যে শিষ্য যিশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল) এক শিষ্য ছিল-দেবদত্ত। এই দেবদত্ত বুদ্ধকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

বুদ্ধ গঙ্গানদীর উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গেছেন। তিনি রুগ্ন ব্যক্তিদের স্পর্শের দ্বারা আরোগ্য করেছেন। কিছু সন্দেহবাদীর ভ্রম নিরসনে বুদ্ধদেব গভীর নদীর উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন। অথচ তাঁর পায়ে একফোঁটা জল স্পর্শ করেনি। এক দুষ্কৃতকারী রাজা তার এক শিষ্যের পা কেটে দিলে তিনি তা জোড়া দিয়ে সবল করেন। তাঁর দর্শনে রোগীদের রোগ সেরে যেতো, অন্ধ তার দৃষ্টি ফিরে পেতো এবং বধির ফিরে পেতো তার শ্রবণশক্তি। তাঁর শিষ্যেরাও মোজেজা দেখাতে পারতো। যেমন, এক জাহাজডুবির ফলে এক ভক্ত বিপদাপন্ন হলে তাঁর এক শিষ্য মন্ত্রের প্রভাবে তাকে উদ্ধার করে। এমনকি তাঁর শিষ্যেরা বিদেশী ভাষা বুঝতে ও বলতে পারার ক্ষমতাও অর্জন করেছিল।

সংস্কারক হিসেবে বুদ্ধদেব যা করেছিলেন, তা হলো, তিনি পুরোহিতশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করেন, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রয়াসী হন, বহুবিবাহ ও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, নারীদের তিনি পুরুষের সমান অধিকার দেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যে তাদেরও অধিকার আছে, এর স্বীকৃতি দেন, রক্তক্ষয় বন্ধ করেন।

বুদ্ধদেবই প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, অনুষ্ঠান ও পশুবলির মাধ্যমে পুণ্যলাভ করা যায় না। আত্মশুদ্ধির জন্য সংযম ও অনুশীলনের প্রয়োজন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রচারকদের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করে মানুষের চেতনা জাগাতে প্রয়াসী হন।২৮

বুদ্ধদেব প্রায় ৪৫ বছরকাল ধর্মপ্রচার করেন এবং খ্রিঃপূঃ ৪৮৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক পরে (খ্রিস্টের জন্মের একশ বছর পর) রাজা কণিষ্কের সময় কয়েকজন বৌদ্ধ পন্ডিত মহাযান বলে বৌদ্ধধর্মের এক নতুন শাখা প্রবর্তন করেন। এরা বলেন, বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ করলে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। যে প্রাণী বুদ্ধত্ব লাভের চেষ্টা করছেন, অথচ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধ হননি, তিনিই পৃথিবীর যথার্থ উপকার করতে পারেন। এ প্রাণীর নাম বোধিসত্ত্ব। সুতরাং ধর্ম উপার্জন করতে হলে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বকে পূজা ও ভক্তি করা এবং বোধিসত্ত্বদের মতো লোকসেবা করা উচিত। অতি সংক্ষেপে এটাই মহাযানদের মত। যাঁরা মহাযান মত মানতেন না, তাদের হীনযান বলা হতো। চীন-জাপানের বৌদ্ধরা মহাযানী, আর শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশের লোকেরা হীনযানী।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যগণ তাঁর মৃতদেহ জ্বালিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। ফলে তাঁর হাড়গুলো রক্ষা পায়। ভক্তগণ এই হাড়গুলো আটভাগে ভাগ করে আটটি পাত্রে রেখে একেকটি স্তূপ নির্মাণ করেন। কথিত আছে, সম্রাট অশোক (খ্রিঃপূঃ ২৬৯-২৩২) এই আটটি স্তূপ ভেঙে হাড়গুলো বের করে নেন এবং এগুলো ভাগ করে ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হবার পর প্রায় ৪০০-৫০০ বছর পর্যন্ত বৌদ্ধগণ মূর্তিপূজা করতেন না। এমনকি বুদ্ধের কোন ছবিও আঁকা হয়নি। বুদ্ধের জন্ম দেখাবার দরকার হলে একটি পদ্ম এঁকে দেখানো হতো। সম্ভবতঃ খ্রিস্টের

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম শতক হতে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা শুরু হয়। এসময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার দেশে বহু শত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি নির্মিত হয়। গান্ধার ছাড়া মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব ব্যতীত আরও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, তারা প্রভৃতি।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে ভারতে আর বৌদ্ধধর্ম নেই। ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টাব্দ ৩২০-৪৫৪ কুমার গুপ্ত পর্যন্ত) হিন্দু রাজাগণ বৌদ্ধদের উৎখাতে উৎসাহ যোগান এবং খ্রিস্টের দ্বাদশ শতকের দিকে ভারতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পায়। কিন্তু যদিও ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেই, তবুও বুদ্ধদেবের পূজা যে একেবারে হয় না, তা নয়। হিন্দুরা প্রথম প্রথম বুদ্ধকে ঘৃণা করলেও পরে তাকে বিষ্ণুর এক অবতার বলে মেনে নেয়। জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র'-এ আছে :

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।'

অর্থাৎ যজ্ঞের নিয়ম যে সকল বেদবাক্য দেয়া আছে, তুমি তার নিন্দা কর; কারণ যজ্ঞে পশুবধ দেখে তোমার হৃদয় করুণায় গলে যায়; হে বুদ্ধরূপী কৃষ্ণ, তোমার জয় হোক।'[২৯]

বুদ্ধদেব ভগবান মানতেন না। কিন্তু তাঁর অনুসারী ও ভক্তগণ তাঁকে ভগবান বানিয়ে ছেড়েছে। সূর্যপুরাণের মাহাত্ম্য এখানেই। আর্থার লিলি তাই বলেছেন : A new Sun-Myth had to be made for Buddha, and not a Buddha for a Sun-Myth।[৩০]

বুদ্ধদেবের দশটি প্রধান উপদেশবাণী হলো ঃ

১. কাউকে হত্যা করবে না।
২. কোন জিনিস কেউ না দিলে গ্রহণ করবে না।
৩. অবৈধ যৌনকর্মে লিপ্ত হবে না।
৪. মিথ্যা কথা বলবে না।
৫. নেশাগ্রস্ত হবে না অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সেবন করবে না।
৬. দুপুরের পর খাদ্যগ্রহণ করবে না।
৭. জাগতিক আমোদ-প্রমোদে মত্ত হবে না।
৮. অলংকার ও সুগন্ধিদ্রব্য ভূষিত হবে না।
৯. উঁচু ও গদিযুক্ত আরামদায়ক বিছানায় শোবে না।
১০. স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য গ্রহণ করবে না।

ইহুদি ধর্ম ঃ ইহুদী ধর্মের প্রবর্তন হয় প্রাচীন মিশরে। এই ধর্মের প্রবর্তকের নাম মোজেস যিনি মুসলমানদের নিকট হযরত মুসা (আঃ) নামে পরিচিত। মিশরের রাজা ফেরাউনের রাজত্বকালে মোজেসের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত এরকম: এক জ্যোতিষীর নিকট রাজা ফেরাউন জানতে পারেন যে, তাঁর রাজ্যে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করবে এবং তার রাজ্য ও রাজত্ব উভয়ই কুক্ষিগত করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর রাজা ফেরাউন তাঁর রাজ্যের সকল শিশু পুত্রকে জন্মের সাথে সাথে হত্যার নির্দেশ দেন। কিন্তু শিশু মোজেস তাঁরই রাজপ্রাসাদে দত্তক পুত্র হিসেবে লালিত-পালিত হতে থাকেন। পরবর্তীতে মোজেস যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশানুযায়ী রাজার নিকট নতুন ধর্মমত গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। রাজা ফেরাউন তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে মোজেস নীল নদী অতিক্রম করেন কিন্তু ফেরাউন তাঁকে তাড়া করতে গিয়ে সদলবলে নীল নদীতে সলিলসমাধির শিকার হন।

Dhaka University Institutional Repository

আদিপুস্তকে মোজেস-এর যে দশটি আদেশ যা বিখ্যাত Ten Commandments নামে পরিচিত, সেগুলো হলো,

১. আমিই তোমাদের একমাত্র ঈশ্বর। আমার সম্মুখে অন্য কোন অচেনা ঈশ্বরদের আনবে না।
২. কোন কারণ ছাড়া অযথা তোমার প্রভুর নাম উচ্চারণ করবে না।
৩. ঈশ্বরের পবিত্র দিনটি স্মরণ করবে।
৪. পিতামাতার সমাদর করো ও ভক্তি করো।
৫. নরহত্যা করো না।
৬. ব্যভিচার করো না।
৭. চুরি করো না।
৮. তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না।
৯. তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর উপর কু-নজর ফেলবে না।
১০. প্রতিবেশীর দাসদাসীতে ও ধনসম্পত্তিতে লোভ করো না।৩১

ইসলাম ধর্ম ঃ এটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম। আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে (৬১০-৬৩২ খ্রি:) তৎকালীন আরবে এই ধর্ম প্রবর্তিত ও প্রচারিত হয়। পরবর্তিতে আরবদেশের সীমানা পেরিয়ে এই ধর্ম বিশ্বের সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের নাম হযরত মুহম্মদ (দঃ)। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবের এক সম্ভ্রান্ত কোরেশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম আমিনা ও পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তিনি শৈশবে ও কৈশোরে চারিত্রিক মাধুর্য ও সত্যবাদিতার জন্য সাধারণের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। আরবে তখন চলছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শোষণ ও নিপীড়নের এক অন্ধকার যুগ যাকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বলা হয়। আরবের সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো বহু দেবদেবীর দ্বারা। মক্কার মূল উপাসনাগারে ছিল ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি। একেকটি মূর্তি একেকটি গোষ্ঠীর ভাগ্যের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হতো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল লাত, মানাত ও উজ্জা। এই অন্ধকার থেকে মুক্তির উপায় সন্ধানকল্পে হযরত মুহম্মদ (দঃ) পবিত্র হেরা গুহায় আল্লাহ্‌র ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর বয়সের সময় তিনি স্বর্গীয় দূত জিবরাইলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ও ঐশী বাণী বা 'ওহী' প্রাপ্ত হন। এই ঐশী নির্দেশাবলিই পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মের মূল বিধান হিসেবে গ্রন্থাকারে পবিত্র কুরআন হিসেবে সন্নিবেশিত হয়।

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী 'মানুষ (আদিতে) ছিল একজাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করলো)। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করতো।'৩২ পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণকে অবিশ্বাস করে আর ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ ও রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে যে আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি এবং এদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।'৩৩ অর্থাৎ সকল নবীকে মান্য করেও মাত্র একজনকেও যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে তা পূর্ণ বিশ্বাস বলে গণ্য হবে না। এই হিসেবে ইসলাম ধর্ম চরিত্রগতভাবে উদার ও অসাম্প্রদায়িক।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করার পর মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তা-ও ছিল অসাম্প্রদায়িক। উক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মদিনার ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে যে আন্তঃসম্প্রদায় চুক্তি (যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে পরিচিত) সম্পাদিত হয়, তাতে বলা হয় : প্রত্যেক ব্যক্তি (সে ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, সাবিয়্যিন হোক বা মুসলিম) তার নিজস্ব ধর্ম পালন করার অধিকার পাবে এবং রাষ্ট্রের মূল কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন সাধারণ জনগণ দ্বারা, আর সংখ্যালঘুকে দেয়া হবে সংখ্যাগুরুর মতো সমস্ত অধিকার। মানবজীবনে যে সব মূল্যমানের

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হবে, তারই আলোকে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'৩৪

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মুসলিম নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে যা ৮০০ মিলিয়নেরও অধিক। উত্তর আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ৪৫টি মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়াও ইউরোপ মহাদেশে ৯ মিলিয়ন, অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে ৪০ থেকে ৬০ মিলিয়ন এবং আমেরিকায় ৩ মিলিয়ন মুসলিম রয়েছে। নবম শতাব্দী থেকে ইসলামী শাসন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুরু হলে তা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে এসকল মহাদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটে যা আরবদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। একসময় মুসলিম সম্প্রদায়ের আধিক্য দেখা যায় ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে। এদেশগুলোর জনসংখ্যা সমগ্র আরব বিশ্বের জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়।

কনফুসিয়াস ধর্ম ঃ এই ধর্মের প্রবর্তক কনফুসিয়াস। তিনি খ্রিঃ পূঃ ৪৫১ সালে চীনদেশে শানটুং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিঃ পূঃ ৪৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মানুষের সমাজকে ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, বনে গিয়ে কি পশুপাখিদের ধর্মোপদেশ দেব? তাঁর ধর্মমত জ্ঞানমূলক বলে চীনদেশের শিক্ষিত সমাজে আদরণীয়। তিনি বলতেন, নৈতিক জীবনের মহত্ব অনুধাবন করা এবং পিতামাতাকে মেনে চলা মানবজীবনের প্রধান কাজ। তাঁর ধর্মে স্বর্গে যাবার আশা কিংবা নরকবাসের আশংকা নেই।

কনফুশিয়াস বলেছেন, কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলো। ভুল করলে সংশোধন করতে বিলম্ব করো না। মানুষ দেবতা নয়। মানুষের মতো মানুষ দেখলেই আমরা খুশি হই। পৃথিবীতে নিষ্কলংক ধার্মিক লোক বিরল। এক অকপট মানুষের হৃদয় পেলে ধন্য হওয়া উচিত। সত্যবাদী হও, লোকে বিশ্বাস করবে। জ্ঞানার্থী সমুদ্রে আনন্দ লাভ করে, ধর্মার্থী পর্বতে সুখী হয়। কারণ, জ্ঞানার্থী চঞ্চল, ধর্মার্থী প্রশান্ত। যে উত্তম সে গভীর, অথচ গর্বিত নয়। যে অধম সে গর্বিত, অথচ গম্ভীর নয়। অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান যদি সদ্ব্যবহার হয়, তবে সদ্ব্যবহারের প্রতিদান কেমন হবে? যে হিতকারী, তারই হিতসাধন কর্তব্য। অন্যায়কারীর প্রতি কেবল ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। কনফুসিয়াস ধর্ম অনুযায়ী 'মানুষের প্রতি উদারতাকে 'জেন' বলা হয় এবং সাধু ব্যক্তিদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনধারণকে 'লি' বলা হয়। 'বিবাহ' শব্দটা সত্যিকার অর্থে নৈতিকতার মধ্যে ধরা হয় মন্ত্রপূত করে। পিতামাতাকে সম্মান করাকে বলা হয় 'হিসাও'।'৩৫

জরথুস্ত্র ধর্ম ঃ এই ধর্মের প্রবর্তক জরথুস্ত্র পারস্যের পূর্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতকে সাধারণভাবে পার্সী ধর্ম বলা হয়। বেদ যেমন অপৌরুষের ছিল বলে বিবেচিত হতো, পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ-আবেস্তা'কেও তেমনি অপৌরুষের বলে পার্সীরা মনে করে। জন্মের পর ২৩ বছর জরথুস্ত্র অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। ধ্যান ও ধারণার দ্বারা যখন জরথুস্ত্রের নিকট সত্য প্রকাশিত হলো, তখন তিনি পাহাড়ের উঁচু শিখর থেকে নেমে এলেন। সে সময় নাকি আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সে অগ্নি তাঁর কোন ক্ষতি করেনি।

জরথুস্ত্র প্রত্যেক পদার্থকে সৎ ও অসৎ দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং এর জন্য দু'জন দেবতা ছিল-একজন সুদেবতা আর একজন কুদেবতা। তারা হলেন যথাক্রমে আহুরা মাজদা ও আহ্‌রিমান। কল্যাণকামী বস্তু সুদেবতার সৃষ্টি আর দুঃখ, কষ্ট, বিরোধ, হত্যাকান্ড ইত্যাদি কুদেবতার।

জরথুস্ত্রের মতে, মৃত্যুর পর আত্মা 'হিসাবরক্ষকের সেতু' ছাড়া আর কোথাও যেতে পারে না। সেই সেতু পার হবার সময় সেতুরক্ষক হিসাবের খাতা খুলে আত্মার পাপ-পুণ্যের হিসাব করে এবং পাপ ও পুণ্যের গুরুত্বে স্বর্গ বা নরকবাস হয়। পাপ-পুণ্যের হিসাব সমান হলে আত্মা শেষবিচারের দিন পর্যন্ত 'ছায়ারাজ্যে' অবস্থান করে।

জরথুস্ত্রের ধর্মমত সরল ও সহজ। মানুষ সুমতির প্রভাবে ভাল কাজ করে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেয়। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এসে বলে 'কর'। এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে যে জয়ী হয়, মানুষ তার বশবর্তী হয়ে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই 'সু' ও 'কু'-এর দ্বন্দ্ব নিয়েই পৃথিবীর ইতিহাস। যেমন, সুর ও অসুর, এঞ্জেলস ও ডেভিল, ফেরেস্তা ও শয়তান।

জরথুস্ত্র বলেন : ঈশ্বর এক-দুই নয়। ধর্ম আপনা হতেই প্রচারিত হয়। প্রচারক বাহন মাত্র। লক্ষ্যবিহীন জীবন ব্যর্থতা আনে। নদী যেমন লক্ষ্য ঠিক রেখে সাগরে মেশে, তেমনি লক্ষ্য ঠিক রেখে সংসারে কন্টকময় পথে চলেও লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

তিনি আরও বলেছেন, 'পুণ্য অর্জন করা শক্ত, কারণ পাপ মানুষের নিত্যসঙ্গী, যেমন আলোর পাশে আঁধার। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা যে মানুষের নিত্যসঙ্গী, তাকে ত্যাগ করা উচিত। সত্যকে আশ্রয় কর, কারণ সত্যপথের যাত্রী ঈশ্বরের প্রিয়জন, নিকটতর ব্যক্তি। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।'

তিনি বলেন, জ্ঞানীব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী অনুভব করেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে ঈশ্বরই পরিচালনা করেন। ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া মানুষের কোনকিছুই করার শক্তি নেই। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। সত্য রক্ষা না করলে বাক্যের অপলাপ হয়। অর্থ, সম্পত্তি, গরু, ভেড়া ইত্যাদি গ্রহণ করাও চুরির শামিল। কারণ, এগুলো কষ্টার্জিত সম্পদ নয়, দান। যারা দান গ্রহণ করে তারা করুণার পাত্র। মনে ও বাক্যে এমন কোন কাজের প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়, যাতে লোকে চোর বলে আখ্যা দিতে পারে। চোর নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

জরথুস্ত্র নামের অর্থ পন্ডিতরা বিভিন্নভাবে করে থাকেন। 'জরথ' মানে জরাগ্রস্ত আর 'উরত্র' অর্থ উষ্ট্র বা উট। অর্থাৎ বৃদ্ধ-উষ্ট্ররক্ষক। অন্যদিকে 'উষত্র' শব্দ 'উষ' (দীপ্তি) ধাতু থেকে উদ্ভুত। তাই অনেকে 'স্বর্ণবর্ণ-তারকা' বলে এই ধর্মপ্রচারককে অভিহিত করে থাকেন।৩৬

খ্রিস্টধর্ম ঃ যিশুখ্রিস্টের জীবন ও বাণীই খ্রিস্টধর্মের উৎস। অবশ্য ঐতিহাসিক বিচারে খ্রিস্টধর্মকে ইহুদি ধর্মের অনুসৃতিও বলা হয়। যিশু ইসরাইলের জুদিয়া রাজ্যের বেথেলহেম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম জোশুয়া; জিসাস ক্রাইস্ট বিদেশী নাম।

যিশুখ্রিস্ট হিব্রু বা আরমাইক ভাষায় কথা বলতেন এবং তাঁর বাণী এবং প্রচার আরমাইক ভাষায় হতো। কিন্তু নতুন নিয়ম (New Testament) সেই ভাষায় রচিত হয়নি, গ্রিক ভাষায় হয়েছিল এবং তা হয়েছিল খ্রিস্টের মৃত্যুর অনেক বছর পরে। যিশু একেশ্বরবাদ প্রচার করলেও পরে তাঁর অনুসারীরা এই মতবাদকে ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত করে। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit-এই তিন ঈশ্বরকে নিয়েই ত্রিত্ববাদের সৃষ্টি হয়। চার্লস প্যানাটি বলেছেন, 'ইহুদিরা একেশ্বরবাদকে উন্নত করে, গ্রিকরা করে আরও উন্নত। খ্রিস্টানরা একে বিকৃত করে ত্রিত্ববাদের মাধ্যমে এবং অনেক শতাব্দী পরে ইসলাম এর মূলতত্ত্বে ফিরে যায়।৩৭

ইসলামের দৃষ্টিতে হযরত ঈশা (আঃ) পয়গম্বরদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। মুসলমানরা বিশ্বাস করে হযরত ঈশাই (আঃ) ক্রাইস্ট এবং তাঁর জন্ম হয়েছে অলৌকিকভাবে, কোন পুরুষের ঔরস থেকে নয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশে ঈশ্বরের দূত মরিয়মের কাছে শুভবার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল : 'তোমার প্রতিপালক তো আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।'

মরিয়ম বলল : কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিনীও নই।

সে বলল : 'এইভাবেই হবে'। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এ আমার জন্য সহজ, আর আমি তাকে সৃষ্টি করব মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে এক আশীর্বাদ হিসেবে। এ তো এক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত।'

তারপর মরিয়ম গর্ভে সন্তান ধারণ করল ও তাঁকে নিয়ে দূরে চলে গেল এক জায়গায়। প্রসববেদনা তাকে এক খেজুরগাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, হায়! এর আগে যদি আমার মরণ হতো, আর কেউ মনে না রাখতো।

ফেরেশতা গাছের নিচ থেকে ডেকে বলল : 'তুমি দুঃখ করো না, তোমার পায়ের কাছে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুরগাছের ডাল ঝাঁকাও, তোমাকে পাকা-তাজা খেজুর দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং খাও, পান করো ও চোখ জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখো, তখন বলো, আমি করুণাময়ের উদ্দেশে মৌনতা পালনের মানত করেছি। তাই আমি কিছুতেই কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না। তারপর সে (মরিয়ম) তাঁকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে হাজির হলো। ওরা বলল : মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছ। ওহে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না আর তোমার মা-ও তো ব্যভিচারিণী ছিল না। তারপর মরিয়ম শিশু ঈশার দিকে ইঙ্গিত করল। ওরা বলল, কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব?

সে (শিশু ঈশা) বলল : আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে আশিস-ভাজন করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার উপর শান্তি ছিল যেদিন আমি জন্মলাভ করেছিলাম ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমার পুনরুত্থান হবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'এই-ই মরিয়ম পুত্র ঈশা, যে বিষয়ে ওরা তর্ক করে।'৩৮

আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ঈশা (আঃ) মৃতব্যক্তির প্রাণদান করতে পারতেন। মাটির পাখির মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে পারতেন। তাছাড়া আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি অন্ধকে দৃষ্টিদান ও কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলেছিলেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈশা (আঃ)-এর নাম পঁচিশ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 'ইবনে মরিয়ম', 'মসিহ', 'আবদুল্লাহ্', 'রাসুলুল্লাহ্'। এছাড়া তাঁকে 'ঈশ্বরের বাণী', 'রুহুল্লাহ্', 'ঈশ্বরের চিহ্ন' এবং অন্য নামে ১৫টি বিভিন্ন সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে 'জেসাস'-কে 'ঈশা' বলা হয়েছে। হিব্রু 'ইসাও' থেকে আরবীতে 'ঈশা' হয়েছে, লাতিনে হয়েছে 'জেসাস' তার ক্ল্যাসিক্যাল নাম 'জোশুয়া' থেকে। 'ইসাও' হিব্রুদের একটা সাধারণ নাম। এই নামটি ষাটবারেরও বেশি ব্যবহার করা হয়েছে বাইবেলের প্রথম পুস্তক জেনেসিস-এ।

সনাতন ধর্ম ঃ ভারতবর্ষের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও কবি পতঞ্জলি তাঁর যোগশাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য যে ৪টি পন্থা নির্দেশ করেছিলেন, বলা হয়ে থাকে সেগুলোই ভারতবর্ষের সনাতন বা হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি। পন্থাগুলো হলো,

১. ঈশ্বরের ধ্যান
২. ঈশ্বরবাচক প্রণব (জপ)
৩. মহাপুরুষদের সম্বন্ধে চিন্তা
৪. যা অভিরুচি তার ধ্যান।

ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় পুস্তক হিসেবে সনাতন ধর্মের অনুসারী আর্যরা যে পুস্তক ব্যবহার করতো, তা ঋকবেদ। এতে ১০২৮টি স্তোত্র বিধৃত ছিল। যা সম্ভবত ১৫০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত ও গ্রন্থিত। পরে যে তিনটি বেদ রচিত হয়, তা মূলত ঋকবেদেরই ধারক ও বাহক। যেমন, শামবেদে ঋকবেদের কয়েকটি স্তোত্র সংকলিত আছে, যা ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যহীন। যজুর্বেদ (ঋকবেদের দুই শতাব্দী পরে সংকলিত) ঋকবেদের বলিদান বিষয়ক বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়া। আর অথর্ববেদ হলো পুরোহিতদের ব্যবহারিক বিধানমালা বা হ্যান্ডবুক।

ঋকবেদে আরও কয়েকটি দেবীর কথা আছে। যেমন, পৃথ্বী, অদিতি, ঊষা, রাত্রি ও অরণ্যানী (বনদেবী)। পরবর্তীতে আর্যজাতির আর একটি শাখা যখন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে গ্রিক জিউস ও রোমান জুপিটারের ধারায় পুরুষ প্রকৃতিকে ধরে মাতৃদেবীর স্থলে পিতৃদেব স্থান পায় এবং স্বর্গদেবতা দাউসের আবির্ভাব হয় যা পরবর্তীতে ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে। তারপর বায়ু, সূর্য, বিষ্ণু, অগ্নি, অশ্বিনী ইত্যাদির কথা এবং আনুষঙ্গিক আরও সব।৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতে, 'ধর্মের মূলভিত্তি বেদ। ঋকবেদ অর্থাৎ ঋকসংহিতা জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, যা তিলকের মতে ৪৫০০ খ্রিঃপূর্বে রচিত। এখানে একটি মহাদেবের অর্থাৎ মহাদেবতা উপাসনার কথা আছে। ঋকবেদের পুরুষসুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে রয়েছে : 'পুরুষ এবেদং সর্বম যদ্ ভূতম যচ্চভব্যম' অর্থাৎ বর্তমানে যা আছে, অতীতে যা ছিল এবং ভবিষ্যতে যা হবে, সে সমস্তই পুরুষ। দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্রে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'-এই দেবতা একই, বিপ্রগণ বহু বলেন।'[৪০]

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, 'অনেক হিন্দু মনে করেন বেদ একটি প্রেরিত পুস্তক। 'বিদ' শব্দ থেকে 'বেদ'-এর উৎপত্তি, যার অর্থ 'জানা'। এটি সেকালের চলমান জ্ঞানের সংকলন মাত্র। সেকালে কোন পৌত্তলিকতা ছিল না, দেবতাদের জন্যও কোন মন্দির ছিল না। আস্তে আস্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা জন্ম নেয়। প্রথমে অলিম্পিয়ানদের মতো ঈশ্বরের অবস্থান ছিল, পরে একেশ্বরবাদ, তারপর Monism-এর ধারণা বা মনিবাদের জন্ম। এসব ঘটনা ঘটতে প্রায় একশো বছর লেগে যায়। তারপর বেদের শেষ অবস্থা। অর্থাৎ বেদযুক্ত অন্ত থেকে বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি। আদিম বেদের কালে আর্যদের জীবন সম্পর্কে বেশি সচেতনতা ছিল, আত্মার প্রতি তত দৃষ্টি দেয়ার সময় ছিল না। পরে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে, অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদের উৎপত্তি হয়।[৪১]

৩.৩ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ঃ মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে ধর্ম ও রাজনীতির ইতিহাস যতখানি পুরাতন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ইতিহাসও প্রায় ততখানিই পুরাতন। যখনই কোন জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব বা প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে, তখনই সে তার নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিজিত জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। অতঃপর শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছে ধর্মের নামে। শাসকশ্রেণীর সকল কাজকে তার স্বধর্মীয় পুরোহিতশ্রেণীও অকপটে বৈধতাদান করেছে। এভাবেই ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে গীর্জাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যা দীর্ঘকাল যাবত বহাল থাকে। একারণেই লাতিন ভাষায় একটা কথা প্রচলিত আছে-Cujus Regio, ejus religio-অর্থাৎ দেশ যার, ধর্ম তার।

এরকম উদাহরণ আরও আছে। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা জেরুজালেম ধ্বংস করে এবং ইহুদিরা বিতাড়িত হয়। কালক্রমে ইহুদিদের মন্দিরের উপর সম্রাট হাড্রিয়ান (১১৭-১৩৮ খ্রি:) রোমান মন্দির খাড়া করে এবং জুপিটারকে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বার কচবার নেতৃত্বে ১৩২ খ্রিস্টাব্দে ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে সেই বিদ্রোহ সর্বাত্মকভাবে দমন করা হয় এবং ইহুদিদের জেরুজালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৮ সালের আগে ইহুদিরা এই নগরে আর প্রবেশ করতে পারেনি। আরবরা যখন পারস্য জয় করে, তখন (৬৪১ খ্রি:) পারসিকদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা ও অগ্নিপূজারীরা পালিয়ে ভারতে ও অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। ইমাম মালেককে শিয়া প্রীতির জন্য খলিফা মনসুর নির্মমভাবে নির্যাতন করেন। ইমাম হাম্বলীকে খলিফা আল-মামুন নির্যাতন করে কারারুদ্ধ করেন। আব্বাসীয় শাসনামলে ৯২২ খ্রিস্টাব্দে সুফি মনসুর হাল্লাজকে শুলে চড়ানো হয়। শামস তাবরিজের জীবন্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়। খলিফা ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে হত্যা করা হয় রাজনৈতিকভাবে-সবই ধর্মের কারণে। ১৪৯২ সালে স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্দ ও রাণী ইসাবেলা মুসলমানদের স্পেন থেকে বিতাড়িত করেন। মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:) দেশের শাসনকর্তা হিসেবে নতুন মতবাদ 'দ্বীন-ই-ইলাহি' প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবে চলছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শোষণ ও নিপীড়নের এক অন্ধকার যুগ যাকে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বলা হয়। এই অন্ধকার থেকে মুক্তির উপায় সন্ধানকল্পে পবিত্র হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র ঐশী বাণী প্রাপ্ত হন। উক্ত ঐশী বাণীর ভিত্তিতে তিনি তৎকালীন আরবে যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, তা ছিল বহুলাংশে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও ন্যায়বিচারভিত্তিক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত ঘটনাবলি ইসলামের মৌলিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অধ্যক্ষ মোহাম্মদ দেওয়ান আজরফের ভাষায়,

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজের গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের উদাহরণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান গণি (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদাতবরণ বিশ্ববাসীর কাছে মুসলিমসমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। উমাইয়া বংশের তথাকথিত খলিফাদের অনাচার ও আব্বাসীয়দের পাশবিক প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ মুসলিম চরিত্রের দূরপনেয় কলঙ্ক। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়, মুসলিম সমাজজীবনে এ অত্যাচার দেখা দিয়েছে ব্যক্তিগত বা বংশগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধির ফলে। বর্ণ ও রক্তের যে প্রতিমা ধ্বংস করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, সে বর্ণ ও রক্তের পুতুলগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম সমাজে আত্মকলহ দেখা দিয়েছিল।'৪২

৩.৪ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থানে ধর্মের ভূমিকা ঃ ধর্মকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাও কম নয়। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উক্ত কাহিনীগুলোতে ক্ষমতার জন্য ধর্মের ব্যবহারকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। 'ধর্মের নামে যুদ্ধ করতে শুধু বাসুদেব নন, স্বর্গের অন্য দেবতারাও একপক্ষের সাথে সহযোগিতা করে অন্যপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে ছাড়েননি। তার মূলে ছিল রাজনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ট্রয়ের যুদ্ধের সময়ও অলিম্পাসের দেবদেবীরা তাঁদের প্রিয় রথী-মহারথীদের পক্ষ নিয়ে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করেছেন। জিতিয়েছেন হেক্টরের বিরুদ্ধে একিলিসকে, একিলিসের বিরুদ্ধে প্যারিসকে।'৪৩ মহাভারতেও দেখা যায়, 'কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি যুদ্ধ করবেন না, তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের সারথী হবেন। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজের আত্মীয়স্বজন ও আপন লোকদের সংহার করতে অর্জুন অস্বীকার করলে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মবাক্যে তাকে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যগুলোই ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'য় পরিণত হয়। ফলে ধর্মের নামে নরহত্যা অনুমোদিত হয়। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ধর্মযুদ্ধে মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নেন-'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলে হত্যা করা হয় দ্রোণাচার্যকে। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শিখন্ডির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। তারই আড়ালে ভীষ্মকে নিরস্ত্র করে মারা হলো। এসবই হলো শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে। কর্ণকে বধ করতে উপদেশ দিলেন অর্জুনকে। তিনি বলেছিলেন, অর্জুনের মঙ্গলের জন্য তিনি জরাসন্ধ ও শিশুপাল, একলব্য এবং হিড়িম্ব, কির্মীর বক অলায়ুধ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসকে নানা উপায়ে বধ করেছিলেন।৪৪ অথচ শিশুপাল ছাড়া অন্য সব ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না। বলেছিলেন, অর্জুনের হিতার্থে তাই বাড়িয়ে বলতে বাধেনি। অর্জুনকে যে কোন উপায়ে শ্রেষ্ট করে তোলার একটি পরিকল্পনা ছিল ত্রিলোকের মধ্যে। তাই শুধু কৃষ্ণ নন, ভীষ্ম দ্রৌণ, উলুপি (নাগরাজ কন্যা), গন্ধর্ব, অঙ্গারপর্ণ ও চিত্রসেন এবং স্বর্গের প্রধান প্রধান দেবতা অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন। অর্জুন যেন বিশ্বপ্রকৃতির আদুরে পুত্র, দেবগণের প্রিয়পাত্র। তিনি বিরল মানুষের একজন, যাকে ভাগ্যদেবীর হাজার হাত উজার করে দান করেন মানুষের যা কিছু কাম্য।৪৫

একইভাবে ইসলাম ধর্মেও রাজনীতির প্রতি সমর্থন রয়েছে মর্মে যারা দাবী করেন, তারা তাদের দাবীর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি ব্যবহার করে থাকেন ঃ

- 'তিনিই (আল্লাহ্ই) তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করবার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'৪৬
- 'তিনিই তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'৪৭
- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের আনুগত্য কর।'৪৮
- 'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করবে না; অতঃপর তোমার দেয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধাও থাকবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।'৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের অন্যতম শরীক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাঁর 'রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'ইসলামের মূল ভিত্তি কালেমা তাইয়েবাই ইসলামী রাজনীতির উৎস। কালেমার মূল ঘোষণা ও অন্তর্নিহিত বাণী হলো-এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করা। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর সকলের ও সব কিছুর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা। গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব পরিহার করে বা বর্জন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ জীবন যাপনের সকল ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অনুসরণের অঙ্গীকারই কালেমার ঘোষণার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক। তাই এটাকে কোন অবস্থায়ই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই।'৫০

প্রফেসর স্যানটিলানা বলেন, 'Islam is the direct government of Allah, the rule of god, whose eyes are upon his people. The principle of unity and order which in other societies is called civitas, polis, state, in Islam is personified by Allah: Allah is the name of supreme power, acting in the common interest. Thus the public treasury is the `treasury of Allah the army is the army of Allah, even the public functioneries are the `employees of Allah'. ৫১

৩.৫ অবিভক্ত ভারতবর্ষের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

সেই প্রাচীন ভারতেই দেখা যায়, রামায়ণের রাম 'ধর্মের নামে পিতৃআজ্ঞা পালনে বনবাসে গমন করেন। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণে বালকের ন্যায় রোদন করলেন পত্নীর প্রেমে। কিন্তু লঙ্কা জয় করে যখন অযোধ্যার রাজা হয়ে বসলেন, তখন সীতাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করলেন না। নির্বাসিত সীতাকে আবার মনে পড়ল অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়। কারণ, পত্নী ছাড়া যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকে। তবুও সীতাকে সশরীরে আনলেন না, স্বর্ণ-সীতা তৈরি করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন।'৫২ মহাভারতেও একই রকম উদাহরণ পাওয়া যায়। 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলে কৌশলে 'ধর্মযুদ্ধে' দ্রোণাচার্যকে নিহত করালেন। এই দ্রোণাচার্য শিষ্যের স্বার্থের কারণে গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিষাদ-বালক একলব্যের ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।'৫৩

আর্যরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তখন দ্রাবিড়দের অনার্য পরিচয়ে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। তখন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সাথে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, `Out of this synthesis and fusion grew the Indian races and the basic Indian culture which had distinctive elements of both.৫৪ অর্থাৎ ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির উৎপত্তি এই আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণের মাধ্যমে, যেখানে উভয় জাতির উপাদান ও অবদান বর্তমান।

ভারতে বর্ণাশ্রম রীতি প্রবর্তনের পর অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের শুধু যে শোষণ করতে লাগলেন তা নয়, তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতেও শুরু করলেন। চতুর্বর্ণের বাইরে অন্ত্যজশ্রেণীর লোকেরা এবং বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোকেরাও ছিলেন উচ্চবর্ণের অভিজাতশ্রেণীর লোকদের কাছে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। প্রাচীন বাংলায় বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের ভাল চোখে দেখতো না। বাংলার শশাংক ও সেন রাজাদের বৌদ্ধ বিদ্বেষ কারও অজানা ছিল না।

উপরের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতের আর্য-শাসকশ্রেণীর হাতে যে ধর্মভিত্তিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির গোড়াপত্তন, তারই ধারাবাহিকতায় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব (বাদশাহ্ আলমগীর উপাধিধারী) কর্তৃক আপন ভ্রাতাকে 'মুরতাদ' ফতোয়াদানপূর্বক ভ্রাতৃহত্যার মাধ্যমে রাজ সিংহাসন দখল করার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। ফলে ১৮৫৭ সালে তার প্রতিক্রিয়ায় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে। উপমহাদেশের বহু ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধূর্ত ইংরেজ শাসকগণ 'Devide and rule' পদ্ধতির সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। নিজেদের দেশে সংসদীয় শাসনপদ্ধতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে তারা একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার কায়েম করে। একইভাবে নিজেদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা থাকলেও এ উপমহাদেশে তারা স্বীয় ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য কৌশলে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। ফলে ১৮৫৭ সালে তার প্রতিক্রিয়ায় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গোটা ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৮৫ সালে হিন্দু নেতৃত্বনির্ভর রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। পরবর্তীতে মুসলিম নেতৃত্বনির্ভর রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর নেতৃত্বে গঠিত হয় জামাতে ইসলামী নামক আরও একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। এই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাওলানা মওদুদী তাঁর 'সিয়াসী কাশমকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই কাজের (হুকুমতে ইলাহী প্রতিষ্ঠার) জন্য একটি প্রবল সমালোচনামুখর, ধ্বংসাত্মক ও সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজন যা একদিকে জ্ঞান-গরিমার শক্তি দ্বারা পুরনো সভ্যতার বুনিয়াদ উঁড়িয়ে দেবে এবং অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে নিজের বিশেষ চিন্তাধারার বুনিয়াদের উপর নতুন করে গড়ে তুলবে। এমনভাবে করতে হবে যাতে চিন্তা জগৎ পুরোপুরি প্রভাবান্বিত হয় এবং মানুষ এই পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনা ও অনুভব করতে আরম্ভ করে।'[৫৫] এই দলগুলোর পারস্পরিক বিরোধ ও কোন্দলের কারণে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সুস্পষ্ট বিভক্তির সূচনা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। পাশাপাশি সমাজের রক্ষণশীল অংশের প্রতিনিধিত্বকারী, যেমন, জমিদার, পুরোহিত, বণিক ও প্রতিক্রিয়াশীল লোকজন ব্রিটিশ শাসকের সমর্থন ও নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে থাকে। অপরদিকে উক্ত রক্ষণশীল অংশের প্রতিনিধিরাও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্রিটিশ শাসককে সাহায্য করতে থাকে। এছাড়াও ১৮১৩ সালের অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর থেকে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রচারক ভারতে আসতে থাকে। তারা ভারতে বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে যেগুলো ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে একশ্রেণীর নব্য বণিক, জমিদার ও উচ্চবর্ণের হিন্দু নিজেদেরকে একচেটিয়া বাঙালি এবং মুসলমানসহ অন্যদের চাষা, চন্ডাল, ছোটলোক ও বাজে লোক বলে ভাবতে শুরু করেন। বিশ্বের মোট বাঙালির অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এঁরা সাহিত্যের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন-'আপনি বাঙালি না মুসলমান?' যেন বাঙালি ও মুসলমান হওয়া পরস্পরবিরোধী। যেন মুসলমান হলে বাঙালি হওয়া যায় না। বাঙালি হলে মুসলমান হওয়া যায় না।[৫৬] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা দেশটাকে হিন্দুর দেশই মনে করতেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তো বলেই ফেললেন, 'হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ, সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই।'[৫৭]

ভারতবিভাগের জন্য লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে দায়ী করা হয়। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে আসার অনেক আগেই জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, কৃপালনী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজা গোপালচারিয়া প্রমুখ দেশবিভাগ মেনে নিয়েছেন। রাজা গোপালচারিয়া ১৯৪২ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধানমন্ডলীয় পার্টির সভা থেকে ভারতবিভাগের পক্ষে একটা প্রস্তাবও পাশ করিয়েছিলেন। তাই বল্লভভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভারতবিভাগের পরপরই বলতে পেরেছিলেন, 'যারা পাকিস্তান চেয়েছিল, পাকিস্তান হওয়ার পর তাদের আর ভারতে থাকার অধিকার নেই। এই অন্যায় ও অসঙ্গত উক্তির আগে প্যাটেলের উচিত ছিল পাকিস্তানের সব

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুরা যারা পাকিস্তান চায়নি, তাদের ভারতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। তা যখন তিনি করেননি, এ ধরনের উক্তি করার নৈতিক কিংবা শাসনতান্ত্রিক কোন অধিকার তাঁর ছিল না।'[৫৮]

এ বিষয়ে খোদ ইতিহাসবিদগণের মধ্যেও কোন বিতর্ক নেই যে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ও বিকাশের নেপথ্যে ঔপনিবেশিক শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। Michael Parenti-এর ভাষায়, 'সাম্রাজ্যবাদ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জাতির কর্তৃত্বশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহ তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য অন্য একটি জাতির ভূমি, শ্রম, কাঁচামাল ও বাজারগুলি জবরদখল করে নেয়'[৫৯] উদাহরণস্বরূপ দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের উত্থান, নতুন নতুন নগরীর পত্তন, আধুনিক শিল্পায়ন, যাতায়াতের নতুন মাধ্যম, পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থান, নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং নয়া পুঁজিবাদী সমাজের উত্থানকে যেমন এ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিবাচক ফল বলা যায়, তেমনি চূড়ান্ত পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংঘাতকেও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান নেতিবাচক প্রভাবের নমুনা বলা যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য টিকিয়ে রাখতে এবং সামাজিকভাবে বর্ণ ও সম্প্রদায়ভিত্তিক একটি বহুধাবিভক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল যা আজও আমরা প্রত্যক্ষ করি। উপনিবেশভুক্ত দেশসমূহের এই বিরাজমান আর্থিক মন্দা কিভাবে সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তা কার্ল মার্কস-এর বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে এভাবে, `England, it is true, in causing a social revolution in Hindustan was actuated only by the vilest interests.....'[৬০]

কার্ল মার্কস ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের 'ঐতিহাসিক দ্বৈত চরিত্র' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

> "England has to fulfill a double mission in India ; one destructive, the other regenerating."[৬১]

এ প্রসঙ্গে লুসিয়ান ডব্লিউ. পাই বলেছেন,

> "Western traders and missionaries had touched the area and introduced many changes."[৬২]

৩.৬ পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ইংরেজ-অনুসৃত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর হীন রাজনৈতিক স্বার্থ ও দেশপ্রেমবর্জিত রাজনীতি সে উদ্যোগ গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান মুহম্মদ আলী জিন্নাহ গণপরিষদে ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না, সবাই হবে পাকিস্তানী।' তিনি 'সংখ্যালঘুদের অধিকারের সনদ' (Charter of Minority Rights) দিলেও সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে থাকতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদেই ঘোষণা করেছিলেন, `Pakistan is a Muslim State'। দেশের উলেমাশ্রেণীও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে একটি ধর্মভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। জমিয়তে উলামার মাওলানা আবুল হাসনাত, সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী এবং তালিমাতে ইসলামিয়া বোর্ড কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক সংবিধান প্রণয়নের দাবী জানাতে থাকেন। তাঁদের দাবীর সারবত্তা ছিল :

- অমুসলিমদের জিম্মি হয়ে থাকতে হবে।
- নির্বাচনে নারীর ভূমিকা থাকবে না।
- রাষ্ট্রীয় প্রধানের মর্যাদা হবে খলিফার।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী দাবী করলেন, 'প্রচলিত সব আইনকে ভেঙে শরিয়াহ্ আইনের সাথে সমন্বয় করতে হবে। সামরিকবাহিনীতে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোন অমুসলিম কর্মচারী থাকবে না। আইন প্রণয়নের এদের কোন অংশীদারিত্ব থাকবে না।'

তালিমাতে ইসলামিয়া বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করলো, 'নারী ও অমুসলিমদের ভোটের অধিকার থাকা চলবে না।'

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছরের একটানা বিতর্ক ও রশি টানাটানির পর অবশেষে পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক ইসলামিক সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। পাকিস্তানকে ঘোষণা করা হয় ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এই ধর্মভিত্তিক সংবিধানের কারণে পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ও প্রসার ঘটে। জন্ম হয় অসংখ্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের। যেখানে ১৯৫৪ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ সর্বমোট ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪টি (মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, খেলাফত রাব্বানী পার্টি), সেখানে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৮টিতে (মুসলিম লীগ কাইউম, মুসলিম লীগ কাউন্সিল, মুসলিম লীগ কনভেনশন, জামায়াতে ইসলামী, জামিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম জামিয়ত, তাহ্রিকে ইশতেকলাল, জামিয়ত হাজারভী)।[৬৩] অপরদিকে শাসকশ্রেণীও ধর্মের আবরণে তাদের সকল প্রকার শোষণ ও লুণ্ঠনকে বৈধতা দান করতে থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং তাঁর ভাষায় 'হুকুমতে ইলাহী' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে সরকারী কর্মচারীদের পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও যুবকদের পাক সেনাবাহিনীতে যোগদান করাকে নিরুৎসাহিত করেন এই যুক্তিতে যে, 'যেহেতু শপথ গ্রহণের মাধ্যমে এই শাসনব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়, যা আইনত প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য যতদিন না বর্তমান শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামিক হবে, ততদিন এই শপথ গ্রহণ বৈধ নয়।'[৬৪] জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, 'বর্তমান সরকার অনৈসলামিক। এই জন্য আমরা মুসলমানদেরকে তার ফৌজ কিংবা রিজার্ভ বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিতে পারি না।'[৬৫] সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে মাওলানা মওদুদী ও তাঁর দলের এ ধরনের ভূমিকায় দেশব্যাপী অসন্তোষের দাবানল জ্বলে ওঠে। সরকার মাওলানা ও তাঁর সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উপরে বর্ণিত ফতোয়া সম্বলিত জামায়াতে ইসলামীর পুস্তিকাটিও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হিসেবে মেনে নেয়ার মুচলেকা দিয়ে মাওলানা মওদুদী কারামুক্তি লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৯ সালের ২ অক্টোবর পাঞ্জাব প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীর নিকট জেল থেকে প্রেরিত এক পত্রে মাওলানা মওদুদী জানান, '১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ আমাদের ও সরকারের মধ্যকার মতবিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আদর্শ প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর কেবলমাত্র সরকারী চাকুরেদেরই নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী, নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া একান্ত কর্তব্য এবং এটা ঈমানের আবেদন বলে আমরা মনে করি।'[৬৬] কিন্তু পুনরায় ১৯৫৩ সালে মাওলানা মওদুদী 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক একটি গ্রন্থের মাধ্যমে সারা পাকিস্তানে কাদিয়ানীবিরোধী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। ফলে পাঞ্জাবে ও লাহোরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সরকার দাঙ্গা দমনের জন্য লাহোরে সামরিক আইন জারী করতে এবং মাওলানা মওদুদীকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে সামরিক আদালতে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। পরে তা চৌদ্দ বছর কারাদন্ডে রূপান্তরিত করা হয়। মাত্র পঁচিশ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৫ সালের ২৮ এপ্রিল তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two Nation Theory) ভিত্তিতে। এই তত্ত্বের সারবত্তা হলো, 'হিন্দু ও মুসলিম সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জাতি। পৃথক রাষ্ট্র ব্যতীত তাদের পক্ষে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়।' এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মানুভূতি ও ধর্মীয় উন্মাদনাকে পুঁজি করে তদানীন্তন মুসলিম লীগ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে ভারতীয় জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

কংগ্রেসও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিয়ে যায়। তার মধ্যে একটি রাষ্ট্রের নাম ভারত, অপরটির নাম পাকিস্তান। ১২০০ মাইল ভারতীয় ভূখন্ডের দু'প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হলো নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্টতা আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবীদের। উভয় অংশেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হ্যান্স জে, মর্গেনথু তাঁর 'Military Illusions : The New Republic' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাইরে থেকে শক্তিশালী মনে হলেও এর ভেতর রয়েছে কঠিন দূরারোগ্য ব্যাধি। পাকিস্তান একটি জাতি নয়, বড় জোর একটি রাষ্ট্র। এর অধিবাসীদের জাতিগত উদ্ভব, মুখের ভাষা, সভ্যতা কিংবা মানসিকতা–কোনদিক থেকেই এক জাতি গঠনের কোন ঐতিহাসিক যুক্তি নেই। একমাত্র হিন্দুদের আধিপত্যের ভয় ছাড়া ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে–একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দুটি জাতির এই ধরনের একটি রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক কোন কারণই নেই।'[৬৭] রুপার্ট ইমারসন বলেন, 'জাতিসত্তার সর্বসম্মত মতানুযায়ী পাকিস্তানে পাকিস্তানী জাতি বলে কিছুই ছিল না।'[৬৮] ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া হতেই পাকিস্তানের দুই অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানকে একটি কলোনী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কখনও পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন দান করেননি। সংবিধানে দেশের উভয় অংশের মধ্যে সংখ্যা সাম্য নীতি (Principle of Parity) গৃহীত হলেও তা কোনদিন বাস্তবায়িত হয়নি। তাই পাকিস্তানী শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল মূলতঃ শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস। কি ভৌগোলিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাস মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো গড়ার ব্যর্থতার ইতিহাস। পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকাপোক্ত করে নেয়ার চেষ্টার ইতিহাস। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ধর্মীয় ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণজাত হিসেবে প্রকাশ্য ঘৃণা বাঙালি জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বে প্রচন্ড আঘাত হানে। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচী এবং ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে উক্ত আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এটাই ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের মুখে কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে কারারুদ্ধ বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইউব খান সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করতে বাধ্য হন। এদিকে ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এত তীব্র হয়ে উঠল যে, আইউব খান তা আর দমিয়ে রাখতে পারলেন না। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ হতাশ আইউব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নতুন কৌশল উদ্ভাবনে ব্রতী হন। প্রথমেই তিনি ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারী করেন। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন ; আর সে মর্মে ৩১ মার্চ, ১৯৭০ তারিখে একটি আইনগত কাঠামো (Legal Framework Order) জারী করেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের ২৪টি রাজনৈতিক দলের মোট ১৫৮১ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের (৭টি মহিলা আসনসহ) জন্য ৭৮১ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের ১৩৮টি আসনের জন্য ৮০০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করে। তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬-দফা কর্মসূচীকে বাঙালীর 'মেগনাকার্টা'

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে উপস্থাপন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি দলীয় প্রচারাভিযানে ঘোষণা করেন যে, যে কোন ধরনের নতুন সরকারের কাঠামোয় অবশ্যই তাঁর ৬-দফা কর্মসূচী ও ছাত্র সমাজের ১১-দফা কর্মসূচীতে বর্ণিত স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।৬৯ পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে আইউব শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধাভোগী একটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সমর্থনে এগিয়ে আসে। উক্ত দলের মেনিফেস্টোতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, পুঁজিবাদের মূলোৎপাটন ও ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর প্রধান শ্লোগান ছিল, 'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের নীতি, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি'।৭০ ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপি জয়লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অনুরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন আওয়ামী লীগের হস্তগত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪৪টি আসন পিপিপির হস্তগত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনে আওয়ামী লীগ অংশ নিলেও তারা সেখানে কোন আসনে জয়লাভে অসমর্থ হয়। পক্ষান্তরে পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের একটিতেও প্রার্থী মনোনয়ন দিতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭১ সালের ৪ জুন তারিখে প্রকাশিত লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় পিটার হেজেলহার্স্ট (Peter Hazelhurst) কর্তৃক এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে, 'Almost every Bengali endorsed the Sheikh's six-point programme which turned the election into a referendum'।৭১

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ফলাফল ছিল খুবই শোচনীয়। জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনীত ২০০ জন প্রার্থীর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র ৪ জন জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। পূর্ববাংলায় অধিকাংশ আসনেই তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়া মুসলিম লীগ (কাইউম) ৯টি, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ৭টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ৭টি, মারকাজ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ৭টি ও মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ২টি আসনে জয়লাভ করে। ধর্মভিত্তিক দলগুলির মধ্যে তাহরিকে ইশতেকলাল একটি আসনেও জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

তৎকালীন পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকারের কাছে এ নির্বাচনী ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত যা ভুট্টোকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন চক্রকে কেন্দ্রে বাঙালী আধিপত্যের বিষয়ে ভীত করে তোলে। ভুট্টো এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, 'আমার দলের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন সংবিধান রচনা করা যাবে না, কেন্দ্রে কোন সরকারও পরিচালনা করা যাবে না। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এসময় তিনি এমন মন্তব্যও করেন, 'জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সবকিছু নয়'।৭২ অন্য এক অনুষ্ঠানে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে ভুট্টো বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপিকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভোট দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে উভয় দলকেই দেশের দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে হবে।' তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, 'পাঞ্জাব হলো ক্ষমতার দুর্গ বিশেষ (bastion)। কাজেই কোন রাজনৈতিক সংলাপেই তাকে উপেক্ষা করা যায় না।' এভাবে তিনি পাকিস্তানের জন্য 'দুই সংখ্যাগুরু দল' এবং 'দুই প্রধানমন্ত্রী'র এক ফরমুলা হাজির করেন।

যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য ঢাকায় এসে জড়ো হন, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন এবং বিবদমান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে দেশের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার বিষয়ে ঐকমত্যে আসার জন্য অনুরোধ জানান। বাঙালী জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে এই স্থগিত ঘোষণাকে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানায়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনতা ঢাকা ও অন্যান্য শহরের রাজপথে সামরিক সরকারের এই উস্কানিমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ২ মার্চ ১৯৭১ তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকায় কারফিউ জারী করা হয়, যা বিভিন্ন স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

জনতা কর্তৃক লক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিবর্ষণে শতশত বিক্ষোভকারী ঘটনাস্থলে নিহত হয় যা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায়। শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের সর্বত্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন যা মার্চের ৩ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত কার্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের সকল কর্তৃত্বকে স্থবির করে দেয়। এমনকি প্রাদেশিক হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের রীট পর্যন্ত খারিজ হওয়ার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে মার্চের ৭ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ৪টি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন ঃ

১. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর ;
২. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ;
৩. সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন ;
৪. পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠান।

বিক্ষোভরত বাঙালী জনগণের ক্ষোভ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান মার্চের ১৫ তারিখে উদ্ভত সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। ইয়াহিয়া খানের এই প্রচেষ্টা ছিল G.W. Chowdhury-এর ভাষায় 'অনেকটা ডাক্তার কর্তৃক জবাব দেওয়া কোন মৃতপ্রায় রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার শামিল' ।৭৩ তারপরও মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মার্চের ১৬ তারিখে শুরু হয়ে ১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মার্চের ২২ তারিখে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে ভুট্টোও যোগ দেন। একদিকে এই সংলাপ এগিয়ে চলছিল, অন্যদিকে ইয়াহিয়া ও তাঁর সামরিক বাহিনীর জেনারেলগণ বাঙালীদের উপর সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই কালক্ষেপণকারী নিস্ফল আলোচনার কারণে ইয়াহিয়া খান তাঁর সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হন। এই প্রস্তুতির অংশ হিসাবে প্রায় ৫০০০০ সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ সামরিক ট্যাংক, সমরাস্ত্র ও বোমারু বিমান পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয় ।৭৪ এভাবে সাংবিধানিক সংলাপের আড়ালে পাক সরকার তার সকল প্রকার সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাঝপথে কোনরূপ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিয়েই আকস্মিকভাবে করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙালীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের ২৩ বছর ধরে সংগঠিত হওয়া সকল বিরোধী রাজনীতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে জেনারেল টিক্কা খান ২৫ মার্চ রাতে তার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। ঐ রাতেই তারা হাজার হাজার বাঙালী সেনা ও পুলিশ সদস্য, আওয়ামী লীগ নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রকে হত্যা করে। নিরাপরাধ নারী ও শিশু সহ সাধারণ নিরীহ জনগণও এই সামরিক আক্রমণের শিকার হয়। বস্তুতঃ পূর্ব পাকিস্তানে এই পাশবিক সামরিক হামলার কারণে সেখানে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয় যার ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন যে, (It was now convinced that the Pakistan Army had committed genocide in East Pakistan' ।৭৫

পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটে ইয়াহিয়া খানের এই সামরিক সমাধান থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালীর নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হলেও ক্ষমতাসীন চক্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব কখনও বাঙালীর হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। এভাবে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এই নৃশংস গণহত্যার ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির সর্বশেষ আশাটুকুও নিরাশায় পর্যবসিত হয়। বাঙালী জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়, যা তাদেরকে একটি নয়মাসের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালী জনগণ দখলদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। এভাবে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানের চূড়ান্ত ভাঙন নিশ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কেমন ছিল তা বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, তখন ১৯৭১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান অবজারভার-এ জামায়াতে ইসলামীর প্রধান মাওলানা মওদুদীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি আওয়ামী লীগের নিন্দা করে বলেন, 'কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা শাসনতন্ত্র তৈরী করতে চাচ্ছেন, তাদের এ কথা জানা দরকার যে তেমন কোন শাসনতন্ত্র সফল হবে না এবং সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই দায়ী থাকতে হবে।'৭৬ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি নিধন অভিযান শুরু করলে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর গোলাম আযম ৪ এপ্রিল তারিখে নুরুল আমীনের নেতৃত্বে জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে 'অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস' প্রদান করেন। ৬ এপ্রিল গোলাম আযম পৃথকভাবে টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জানান যে, 'ভারতের এই অভিসন্ধি নস্যাত করার জন্য প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে।'৭৭ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতাদানের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল গঠিত 'শান্তি কমিটিতে জামায়াতে ইসলামী প্রধান ভূমিকা পালন করে। ১৫ এপ্রিল তারিখে গঠিত প্রাদেশিক শান্তি কমিটির তিন নম্বর সদস্য নির্বাচিত হন গোলাম আযম। আহ্বায়ক ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরুদ্দিন'।৭৮ শান্তি কমিটির মাধ্যমে স্বাধীনতাযুদ্ধবিরোধী তৎপরতাকে সর্বাত্মক করার জন্য একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীও গড়ে তোলে। '৯৬ জন জামায়াতেকর্মীর সমন্বয়ে খুলনার খান জাহান আলী রোডের আনসার ক্যাম্পে ১৯৭১ সালের মে মাসে রাজাকার বাহিনীর প্রথম দলটি গঠন করেন জামায়াতের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা এ কে এম ইউসুফ।'৭৯ স্বাধীনতাযুদ্ধকালে এই রাজাকার বাহিনী হত্যা, নির্যাতন ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। 'স্বাধীনতাযুদ্ধকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর উল্লেখযোগ্য আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল 'আলবদর' নামক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। এই বাহিনী এপ্রিল মাসের শেষদিকে প্রথম গঠিত হয় জামালপুরে' যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন গোলাম আযম এবং প্রকাশ্য নেতৃত্বে ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর মতিউর রহমান নিযামী।৮০ এছাড়া তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, বিশেষত নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগ, শান্তি কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দখলদার পাক বাহিনীকে হত্যা, লুন্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনায় সহায়তা করে।

৩.৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি (১৯৭২-১৯৭৫) ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সময়ে পিকিংপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। পাক দখলদার বাহিনীর সহায়তাকারীদের বিচারের জন্য 'দালাল আইন' (Collaboration Act-1972) প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হলেও তারা পর্দার অন্তরালে গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জিইয়ে রাখে। '১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও জামায়াতে, রাজাকার ও আলবদরদের গোপন তৎপরতা বন্ধ ছিল না।'৮১

৩.৯ জিয়াউর রহমানের আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় এসে তিনি 'দালাল আইন' (Collaboration Act-1972) প্রত্যাহার করেন এবং সংবিধানের মূলনীতি থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেন। সংবিধানের এই পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাবন্ধিক ফরহাদ মযহার বলেছেন, 'খোদ রাষ্ট্রটিই সাম্প্রদায়িক। রাষ্ট্র যদি সাম্প্রদায়িক হয়, তাহলে সাম্প্রদায়িকতা কী করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হতে পারে, এই যুক্তি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। যদি আমরা সত্যি সত্যিই একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র চাই, তাহলে আমাদের মনোযোগ ধাবিত হবে সংবিধানের দিকে।'৮২ প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' (আইডিএল) নামক মোর্চা গঠনপূর্বক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। 'সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী বাকশালী আমলে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আওয়ামী বাকশালী আমলে তারা নিজেরা সচেতনভাবে জারী করেছিল তারই পরিণতি ঘটেছিল জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাবে।'৮৩ '১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে।'৮৪

৩.১০ এরশাদের আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

১৯৮১ সালের ৩০ মে এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তাঁকে গদিচ্যুত করে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এরশাদের নয় বছরের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীও বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 'জামাতে ইসলামী ১৯৮২ সাল থেকে, বিশেষতঃ ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট গঠনের পর থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অন্যদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছে।'৮৫

৩.১১ খালেদা জিয়ার আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর সংসদের অধিবেশনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রবর্তিত হয়।

৩.১২ শেখ হাসিনার আমল ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক দলগুলোও শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিএনপির সাথে জাতীয় পার্টি (না-ফি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোটের একটি মোর্চা গঠিত হয় যা 'চারদলীয় জোট' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উক্ত চারদলীয় জোট সর্বমোট ২১৪টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে (অষ্টম জাতীয় সংসদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঃ পরিশিষ্ট-৮)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাত্র ৫৮টি আসনে জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

৩.১৩ বর্তমান জোট সরকার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ১০ অক্টোবর তারিখে সরকার গঠন করে। জোটের শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; পরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) লাভ করতে সক্ষম হয়। জোটের শরীক অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো কোন মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্বভার না পেলেও সংসদীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, যারা চারদলীয়-জোট-বহির্ভূত এবং অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারাও বিরোধী দল হিসেবে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তথ্যসূত্র :

১। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ্, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, ঢাকা, পৃ: ১১-১৩।
২। The History of Religions, E.O. James, Page-6.
৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।
৪। Bible Dictionary
৫। Encyclopedia of Religions and Ethics
৬। The History of Religions, E.O. James, Page-8.
৭। Father Leo Booth, When God Becomes A Drug, p. 27
৮। মারেফতের গোপন কথা, ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বাঈমান আল সুরেশ্বরী পৃঃ ৭৩
৯। Robertson Smith, Religion of the Semites
১০। Jevons, An Introduction to the History of Religions
১১। ধর্ম দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
১২। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ্, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, ঢাকা, পৃ: ২৪-২৫।
১৩। The History of Religions, E.O. James, Pages 2-3.
১৪। বাইবেল ২ঃ৬, ৭ঃ১১, ৮ঃ৭, ৪৪ঃ৫ ও ৭ঃ১০।
১৫। কুরআনুল করিম, সুরা আরাফ ১০৩ ও ১০৮।
১৬। কুরআনুল করিম, সুরা আরাফ ১০৯-১২০।
১৭। বাইবেল ১ঃ২০, ২ঃ২, ৫ঃ১০
১৮। Marret, Threshhold of Religion
১৯। J. Caird, Introduction to the Philosophy of Religion, Page 80.

Dhaka University Institutional Repository

২০। Insights to Islamic Beliefs for non-Muslims-Published by the Muslim Converts Association of Singapore, April 1997, Page 1
২১। The Eternal Quest, Page 9, 39, 115.
২২। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ্, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, ঢাকা, পৃ: ৩০-৩১।
২৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫-৪৩।
২৪। Buddha and Early Buddhism।
২৫। Aryan Sun-Myths।
২৬। প্রাগুক্ত
২৭। শিশুভারতী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮
২৮। Buddha and Early Buddhism।
২৯। শিশুভারতী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৯।
৩০। Buddha and Early Buddhism।
৩১। যাত্রাপুস্তক, ১-১৪।
৩২। সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩
৩৩। সুরা নিসা, আয়াত-১৫০-১৫১
৩৪। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৮৫।
৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।
৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫-৬৬।
৩৭। Sacred Origins of Profound Things-Published by Penguin Group, USA, 1996
৩৮। কুরআনুল করিম, সুরা মরিয়ম ১৬-৩৫।
৩৯। AL. Basham, The wonder that was India, Rupa & Co. 1995, New Delhi
৪০। ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃ: ৪৪
৪১। Discovery of India, Page 59, Signet Press, Calcutta, 2nd edition, August 1946।
৪২। জীবনদর্শনের পুনর্গঠন, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।
৪৩। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ্, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ৯৭।
৪৪। দ্রোণ, ১৮১
৪৫। মহাভারতের কথা, বুদ্ধদেব বসু
৪৬। কুরআনুল করিম, সুরা ফাতহ্, আয়াত-২৮
৪৭। কুরআনুল করিম, সুরা সাফ, আয়াত-৯
৪৮। কুরআনুল করিম, সুরা আন নিসা, আয়াত-৫৯
৪৯। কুরআনুল করিম, সুরা নিসা, আয়াত-৬৫
৫০। মতিউর রহমান নিজামী, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ: ১৮।
৫১। Legacy of Islam, Edited by Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, P. 286।
৫২। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৬৯।
৫৩। প্রাগুক্ত।
৫৪। The Discovery of India. P. 52।
৫৫। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, নজরুল ইসলাম, শারদীয় আজকাল, ১৪০২ সাল, ১৯৯৫ খ্রি:।
৫৭। শরৎ সাহিত্য সমগ্র, ২য় খন্ড, পৃ: ২১৩৬, সুকুমার সেন সম্পাদিত।
৫৮। সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট, কংকর সিংহ, পৃ: ৮৬।
৫৯। `Imperialism'-by Michael Parenti in `Encyclopedia of Government and Politics, Vol.2।
৬০। Karl Marx, The British Rule in India, Volume-1, Moscow, p.317।
৬১। Karl Marx's article in `NewYork Daily Tribune', Published on 8 August, 1853)।
৬২। Lucian W. Pye, `South-east Asia's Political Systems', NewJersey, 1967, p. 20)।
৬৩। বাংলাদেশের রাজনীতির চারদশক, এস, সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা, পৃ: ১৯, ৩৪, ৩৫।
৬৪। মওলানা মওদুদী কি তাহরীকে ইসলামী, পৃ: ৩৩১।
৬৫। প্রাগুক্ত।
৬৬। মাকাতিবে জিন্দান, পৃ: ১০৭।
৬৭। Hans J. Morgenthu, Military Illusions : The New Republic, Washington D.C. March 19, 1956, P.14-16।
৬৮। Rupert Emerson, Representative Government in South-East Asia, Cambridge, Harvard University Press, 1955।
৬৯। Bangladesh Document, Karachi : Government of Pakistan, Ministry of External Affairs, n.d., Vol.1, pp. 66-82
৭০। G.G.M. Badruddin, Election Handbook 1970, Karachi, 1970, p. 31
৭১। Peter Hazelhurst, The Times, London, 4 June, 1971
৭২। দি পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭০
৭৩। G.W. Chowdhury, The Last Days of United Pakistan, University of Western Australia Press, 1974, p. 161
৭৪। Kabir Uddin Ahmed, Breakup of Pakistan : Background and Prospects of Bangladesh, London, Social Science Publishers, 1972, p.92
৭৫। The Times, London, 17 August, 1971
৭৬। পাকিস্তান অবজারভার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
৭৭। দৈনিক পাকিস্তান, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১
৭৮। দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১
৭৯। জামাতের আসল চেহারা, মওলানা আবদুল আউয়াল, পৃ: ৬৭।
৮০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮।
৮১। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭১।
৮২। দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩ মে ১৯৯৭।
৮৩। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৯৮-৯৯
৮৪। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭৫।
৮৫। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৬২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৪.০ বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

৪.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তারপর দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশের জনগণ তাদের বহুল প্রত্যাশিত স্বাধীনতা-সূর্য ছিনিয়ে আনে। স্বাধীনতার পর অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাত্র দশ মাস সময়ের মধ্যে জাতি সংবিধান রচনার মতো একটি অত্যন্ত দূরূহ কাজ সম্পন্ন করে। বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিক স্তরসমূহ নিম্নরূপ:

১০ এপ্রিল ১৯৭১	:	বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র আদেশ প্রদান। এই দলিল অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ শাসিত হয়।
১৭ এপ্রিল ১৯৭১	:	মুজিবনগর সরকার (প্রবাসী সরকার) গঠিত হয়। এ সরকার ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত কার্যরত থাকে।
২২ ডিসেম্বর ১৯৭১	:	প্রবাসী সরকারের ঢাকায় আগমন।
১১ জানুয়ারী ১৯৭২	:	বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী।
২৩ মার্চ ১৯৭২	:	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারী।
১০ এপ্রিল ১৯৭২	:	বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত।
১১ এপ্রিল ১৯৭২	:	ডঃ কামাল হোসেন কর্তৃক ৩৪ সদস্যের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন।
১৭ এপ্রিল ১৯৭২	:	খসড়া কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত। কমিটি কর্তৃক সংবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাব আহ্বান। পরবর্তীতে মোট ৯৮টি প্রস্তাব প্রাপ্তি।
১০ জুন ১৯৭২	:	খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক সর্বমোট ৪৭টি বৈঠকে ৩০০ ঘন্টা কাজের পর সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন।
১১ অক্টোবর ১৯৭২	:	খসড়া কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত।
১২ অক্টোবর ১৯৭২	:	ডঃ কামাল হোসেন কর্তৃক খসড়া সংবিধান গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনার জন্য উত্থাপন। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণ আলোচনা চলে। এতে ১০টি অধিবেশনে ৩২ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়।
৪ নভেম্বর ১৯৭২	:	গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশ সংবিধান গৃহীত হয় (৩য় ও শেষ পাঠের পর। ১ম পাঠ হয় ১৯ অক্টোবর হতে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। ২য় পাঠ হয় ৩১ অক্টোবর হতে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত)।
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২	:	বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান কার্যকর করা হয়।১

৪.২ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই থেকে ২০০৪ সালের ১৭ মে পর্যন্ত মোট ১৪টি সংশোধনী সাধিত হয়। তার মধ্যে চতুর্থ সংশোধনীটি ছিল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথম সংশোধনী

১৯৭১ সালের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত বন্দী পাকিস্তানী সৈনিকদের বিচারের প্রেক্ষাপটে এই সংশোধনী গৃহীত হয়। যার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহের

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকারিতা ১৯৭১ সালের নরঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রে অকার্যকর বা রহিত করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই এই সংশোধনী আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

দ্বিতীয় সংশোধনী

এই সংশোধনী ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান সংযোজিত করা হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং উক্ত অধিকার বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকারও এই সংশোধনীতে স্থগিত রাখার বিধান রাখা হয়।

তৃতীয় সংশোধনী

১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে উভয় দেশের সীমান্তবর্তী মিজোরাম-বাংলাদেশ,ত্রিপুরা-সিলেট,ভাগলপুর রেলওয়ে লাইন,শিবপুর গৌরাঙ্গালা,মুহুরী নদী এলাকা,ফেনী নদী সীমান্ত,হাকার খাল,বৈকারী খাল,হিলি-বেরুবাড়ি ও লাঠিটিলা-ডুমাবাড়ি এলাকা সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়,তারই আলোকে এই সংশোধনী গৃহীত হয়।

চতুর্থ সংশোধনী

এই সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সংশোধনী অনুমোদিত হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট হলোঃ

(ক)রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বিধান;
(খ)মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা খর্ব;
(গ)উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি;
(ঘ)বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস ও
(ঙ)একদলীয় শাসনের প্রবর্তন।

বস্তুতঃ এই সংশোধনীর ফলে সরকার সংসদীয় পদ্ধতি থেকে একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম সংশোধনী

১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীতে সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন সাধন করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা' এবং 'সমাজতন্ত্র'-এর স্থলে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার' প্রতিস্থাপিত হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিলের মধ্যে প্রণীত সকল সামরিক আইন,আদেশ,প্রবিধান এবং সংবিধানে সাধিত সকল সংশোধন,সংযোজন,পরিবর্তন,প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন বৈধ বলে গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী,উপ-প্রধানমন্ত্রী,মন্ত্রী,প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পদকে অ-লাভজনক ঘোষণা করা হয়। কোন সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে কার্যভার গ্রহণের দিন সংসদে তার আসন শূন্য এবং রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে পূর্ববর্তী পদ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার সদস্য হবার যোগ্যতা স্থগিত থাকার বিধানও এই সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮১ সালের ৯ই জুলাই এই সংশোধনী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

সপ্তম সংশোধনী

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত জারীকৃত সকল বিধিবিধান ও সামরিক আইনকে বৈধতা দান পূর্বক সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থাৎ সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণের জন্য এই সংশোধনী প্রণীত হয়। সংশোধনীটি গৃহীত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সংশোধনী

১৯৮৮ সালের ৯ই জুন বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা
(খ) বরিশাল,চট্টগ্রাম,কুমিল্লা,যশোর রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা
(গ) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিকের বিদেশী রাষ্ট্র থেকে কোন উপাধি বা ভূষণ গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ।

নবম সংশোধনী

চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশের সংবিধানের নবম সংশোধনী গৃহীত হয় এবং ১১ জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এই সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

(ক) প্রত্যক্ষ ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা
(খ) এক সংগে একই সময়ে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের ব্যবস্থা
(গ) দুই মেয়াদের বেশী রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত না থাকার বিধান
(ঘ) পাঁচ বৎসর পর পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান।

দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সংবিধানের দশম সংশোধনী গৃহীত হয়। এই সংশোধনীর ফলে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টির পরিবর্তে ৩০টি আসন নির্ধারিত হয় এবং তা' দশ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হবার তারিখের ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।

একাদশ সংশোধনী

এই সংশোধনী অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তনের এবং ৬ই ডিসেম্বর,১৯৯০ থেকে অস্থায়ী সরকারের যাবতীয় কার্যকলাপ বৈধ হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৩ জুলাই ১৯৯১ তারিখে সংশোধনীটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী

১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। চতুর্থ সংশোধনীর পর এই সংশোধনীটিই বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও ব্যাপক সংশোধনী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের স্থলে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়। সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান পুনঃপ্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতি হন সাংবিধানিক প্রধান মাত্র। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, নিম্নতম বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেয়াদকাল, অপসারণ, দায়িত্ব হস্তান্তর ইত্যাদিতেও সংশোধন আনা হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনী

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদান ও সংবিধানের অধীনে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় বিধানে অধিকতর সংশোধনকল্পে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল ২৭ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে ৬ষ্ট জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় এবং ২৮ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে তা' রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

চতুর্দশ সংশোধনী

অষ্টম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল ২০০৪ পাশ করা হয়। এই সংশোধনীতে যে সকল বিধান সংযোজন করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা, সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, মহাহিসাব

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং সাধারণ নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনায় স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের অপারগতার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক শপথ পাঠ পরিচালনা। এ সংশোধনী অনুযায়ী সকল সরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৬৭, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অবসরের বয়সসীমা ৬০ থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ এবং সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি ২০০৪ সালের ১৬ মে উক্ত সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় এবং ১৭ মে তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের যে সংবিধান রচনা করা হয়, তাতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। সেখানে বর্ণিত ছিল, 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য-

(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িককতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশে ধর্মের অপব্যবহার,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।'২

উক্ত মূলনীতি সংবিধানে বলবৎ থাকাকালে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন সময়ে ১৪টি সংশোধনী আনয়ন করা হয়। তার মধ্যে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীতে রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তনপূর্বক 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা'-এই শব্দগুচ্ছটি প্রতিস্থাপিত করা হয়। ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর আরোপিত প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় '১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে।'৩ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' (আইডিএল) নামক মোর্চা গঠনপূর্বক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। 'সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী বাকশালী আমলে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আওয়ামী বাকশালী আমলে তারা নিজেরা সচেতনভাবে জারী করেছিল তারই পরিণতি ঘটেছিল জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পুনরাবির্ভাবে।'৪ পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৮৮ সালের ৯ই জুন তারিখে গৃহীত এই সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যার ফলে একদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করতে শুরু করে, অন্যদিকে রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হয়। সংবিধানের এই পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাবন্ধিক ফরহাদ মযহার বলেছেন, 'খোদ রাষ্ট্রটিই সাম্প্রদায়িক। রাষ্ট্র যদি সাম্প্রদায়িক হয়, তাহলে সাম্প্রদায়িকতা কী করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হতে পারে, এই যুক্তি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। যদি আমরা সত্যি সত্যিই একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র চাই, তাহলে আমাদের মনোযোগ ধাবিত হবে সংবিধানের দিকে।'৫

৪.৩ ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিষিদ্ধ থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামী,

Dhaka University Institutional Repository

নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। নির্বাচনে নিম্নলিখিত ১৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে ঃ

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
৩. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)
৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কোপন্থী)
৫. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান)
৬. বাংলা জাতীয় লীগ (অলি আহাদ)
৭. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
৮. জাতীয় গণমুক্তি পার্টি
৯. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)
১০. বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি
১১. কংগ্রেস
১২. বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
১৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
১৪. গণতন্ত্রী দল
১৫. বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,৫২,০৫,৬৪২ জন। ভোটকেন্দ্রেও সংখ্যা ছিল ১৪০৪২টি। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই আওয়ামী লীগের ১১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। একজন প্রার্থীও মৃত্যুবরণজনিত কারণে একটি আসনের নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ফলে নির্ধারিত তারিখে ২৮৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৫টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ৪টি দল জাতীয় সংসদে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। নিচে নির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করা হলো ঃ

ছক-২

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯২
২	ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	২২	১
৩	ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	০
৪	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৬	১
৫	বাংলা জাতীয় লীগ (অলি আহাদ)	১১	০
৬	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	৮	১
৭	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪	০
৮	বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	৩	০
৯	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	০
১০	কংগ্রেস	২	০
১১	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)	২	০
১২	বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	০
১৩	বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন	১	০
১৪	গণতন্ত্রী দল	১	০
১৫	স্বতন্ত্র	১২০	৫

{সূত্র : নির্বাচন কমিশন}৬

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ ১৯৭৮ সালের ৩ জুন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি সম্বলিত অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। ঐ সময় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩,৮৪,৮৬,২৪৭ জন যার মধ্যে ২,০৫,৪৮,৯৩০ জন ভোটার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২১,৫৩১। নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ছিলেন সর্বমোট ১০ জন। তখনও পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো উক্ত নির্বাচনেও প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারেনি। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ ঃ

ছক-৩

১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১	লে: জেনারেল জিয়াউর রহমান	১,৫৩,৬৫,৭৪০
২	জেনারেল এম এ জি ওসমানী	৪৪,৪৯,২৭৬
৩	আবুল বাশার	৫১,০২৩
৪	খবিরউদ্দিন	৭৮,৮৯০
৫	আবু ইসলাম	৪৬,৬৫৮
৬	মোর্শেদ খান	৩৬,০৮৪
৭	আবদুস সামাদ	৩৬,৬৮০
৮	শামসুল হুদা	৩৪,০৯৫
৯	মোঃ আবুবকর	২৫,৪৯১
১০	আবদুল হামিদ	২৪,২৩২

[সূত্র : নির্বাচন কমিশন]৭

৪.৫ ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ভাঙনের সম্মুখীন হয় এবং মুসলিম লীগ (খান এ সবুর) ও মুসলিম লীগ (আবদুল মতিন) গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (নুরু-জাহিদ) ও ন্যাপ (বজলুল সাত্তার)-এই চারভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইউনাইটেড পিপলস পার্টিও দু'ভাগে বিভক্ত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মিজান চৌধুরী বেরিয়ে গিয়ে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করেন। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি ভেঙে একটি শাজাহান ও অন্যটি সোলায়মান নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ন্যাপ (ভাসানী)-এর একটি অংশ উক্ত দলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। দেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী তখনও পর্যন্ত গৃহীত না হলেও খন্দকার মোশতাক আহমেদ কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করে। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও অন্যান্য আরও চারটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' (আইডিএল) নামক মোর্চা গঠনপূর্বক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,৮৩,৬৩,৮৫৬ জন (পুরুষ : ২,৩৪,৭১৭, মহিলা : ১,৮৩,২১,১৪১)। নির্বাচনে শতকরা ৫০.২৪ ভাগ ভোট প্রদত্ত হয়। মোট ২৯টি দল উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সারাদেশে মোট ২১,৯০৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের আসনওয়ারী ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ছক-৪

১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২২০
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯
৩	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১২
৪	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৮
৫	ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ	৬
৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)	২
৭	জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান)	২
৮	গণফ্রন্ট	২
৯	বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন	১
১০	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	১
১১	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	১
১২	স্বতন্ত্র	৫

{সূত্র : নির্বাচন কমিশন}৮

১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উক্ত নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো অল্পসংখ্যক আসন পেলেও তার মধ্য দিয়ে তারা সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

ছক-৫

১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১২
২	ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ	৬

{সূত্র : নির্বাচন কমিশন}৯

৪.৬ ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ২৯ মে একটি ড্রাইভক উদ্বোধনের জন্য চট্টগ্রাম যান। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থানকালে ৩০ মে তারিখে একটি পাল্টা সেনা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণপূর্বক ১৯৮১ সালের ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। উক্ত নির্বাচনে বিএনপি থেকে মনোনীত বিচারপতি আবদুস সাত্তার সর্বমোট ১,৯৭,১৯,৯৭৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেন পান ৮৫,২২,৭১৭ ভোট। উক্ত নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের মাওলানা আবদুর রহিমসহ সর্বমোট ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-

Dhaka University Institutional Repository

ছক-৬

১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের দলের নাম

ক্রমিকনং	প্রার্থীর নাম	মনোনয়নকারী দলের নাম
১	বিচারপতি আবদুস সাত্তার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
২	ডঃ কামাল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩	জেনারেল এম এ জি ওসমানী (অব:)	নাগরিক কমিটি
৪	মেজর এ এ জলিল (অব:)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
৫	অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)
৬	মাওলানা আবদুর রহিম	ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
৭	মোহাম্মদ তোয়াহা	প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট
৮	মিসেস সেলিনা মজুমদার	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
৯	মোহাম্মদউল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর	স্বতন্ত্র (পরবর্তীতে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন নামক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি)

[সূত্র : নির্বাচন কমিশন]১০

৪.৭ ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয়বারের মতো জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অভিযোগে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭-দলীয় ঐক্যজোট এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগসহ মোট ২৮টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সর্বমোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫২৭ জন। সর্বমোট ৪,৭৩,২৫,৮৮৬ জন ভোটার উক্ত নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল শতকরা ৬০.২৮। উক্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী প্রাপ্ত আসন সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ কোন কারণ ব্যতিরেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর পুনরায় ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টিকে অধিক সংখ্যক আসনে বিজয়ী দেখানো হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাষায় এই ঘটনাকে 'মিডিয়া ক্যু' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিদেশী সাংবাদিকগণও এই নির্বাচনকে 'জঘন্য' বলে মন্তব্য করলে তার প্রতিক্রিয়ায় জেনারেল এরশাদ বলেন, 'বিদেশী সাংবাদিকরা বিরোধী দলের পক্ষ অবলম্বন করবে জানলে ওদের দেশে ঢুকতে দেয়া হতো না।১১ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

ছক-৭

১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জাতীয় পার্টি	১৮৩
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬
৩	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০
৪	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৬
৫	যুক্ত ন্যাপ	৫
৬	মুসলিম লীগ	৪
৭	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৪
৮	ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল)	৩
৯	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জলিল)	৩
১০	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)	২
১১	স্বতন্ত্র	৪

[সূত্র : নির্বাচন কমিশন]১২

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত টিকেছিল যার কার্যদিবস ছিল মাত্র ৭৫ দিন। এ সময় মাত্র তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তুমুল গণআন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। উক্ত নির্বাচনে আটটি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭-দলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮-দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত বিরোধী দল, শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও কর্নেল রশিদ-ফারুকের নেতৃত্বাধীন ফ্রিডম পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মোট ৯৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৮৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসন সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ছক-৮

১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জাতীয় পার্টি	২৩৩
২	সংযুক্ত বিরোধী দল	১৯
৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৩
৪	ফ্রিডম পার্টি	২
৫	স্বতন্ত্র	২৫

{সূত্র : নির্বাচন কমিশন}১৩

৪.৯ ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ ১৯৯০ সালের শেষ প্রান্তে সারা দেশব্যাপী প্রচন্ড সরকার-বিরোধী গণআন্দোলন সংঘটিত হয়। আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর ফর্মুলা অনুযায়ী ডিসেম্বরের ৬ তারিখে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ও উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদকে পদত্যাগ করতে হয়। উপ-রাষ্ট্রপতির শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী দেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৭৩টি দলের সর্বমোট ২৩৬৩ জন প্রার্থী (স্বতন্ত্র ৪২৪ জন সহ ২৭৮৩ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নিম্নলিখিত ১৮টি দল নির্বাচন কমিশন থেকে প্রতীক নিয়েও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে কোন প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয় ঃ

১. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি
২. কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজুল হক শাজাহান)
৩. কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)
৪. জাতীয় ইসলামিক দল
৫. জেহাদ পার্টি
৬. বাংলাদেশ সামাজিক সংসদ
৭. বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল
৮. নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি
৯. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি
১০. জাতীয় গণতন্ত্রী দল
১১. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ
১২. জাতীয় পল্লী দল
১৩. ঐক্য প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৪. জাতীয় বিপ্লবী পার্টি
১৫. সাত দলীয় সংগ্রামী জোট
১৬. বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ
১৭. বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি
১৮. সমতা পার্টি

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দলভিত্তিক ফলাফল নিম্নরূপঃ

ছক-৯

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	জামানত বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা
১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১৩৬	১,০৫,০৭,৫৪৯	৬১
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৭	১,৯৮,৮৬৬	৩
৩	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (নৌকা প্রতীক)	৯	৫	৩,৩৫,৪৪৫	
৪	বাকশাল (নৌকা প্রতীক)	১৪	৪	৫,১৯,৫৬৫	
৫	ন্যাপ (মোজাফ্ফর) (নৌকা প্রতীক)	৮	১	২,২৭,২৭০	২
৬	গণতন্ত্রী পার্টি (নৌকা প্রতীক)	৪	১	৫৯,২১০	
৭	জনতা মুক্তি পার্টি (নৌকা প্রতীক)	১	০	২৫,৪৭০	
৮	জাতীয় পার্টি	১৭২	৩১	৪০,৬৩,৫৩৭	১৫২
৯	জামায়াতে ইসলামী	২২২	১৮	৪১,৩৬,৬৬১	১০৬
১০	ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	১	২,৬৯,৪৩৪	৫৪
১১	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	৬৩,৪৩৪	৩৪
১২	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাজাহান সিরাজ)	৩১	১	৮৪,২৭৬	২৯
১৩	এনডিপি (সালাউদ্দিন কাদের)	২০	১	১,২১,৯১৮	১৬
১৪	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (নিজস্ব প্রতীক)	৪০	০	৭২,০৭২	১১
১৫	বাকশাল (নিজস্ব প্রতীক)	৫৪	০	৯৬,৪৪৯	৫৪
১৬	গণতন্ত্রী পার্টি (নিজস্ব প্রতীক)	১২	০	৯৩,৩৮২	১১
১৭	ন্যাপ (মোজাফ্ফর) (নিজস্ব প্রতীক)	২৩	০	৩২,৭০৮	২৩
১৮	জাকের পার্টি	২৫১	০	৪,১৭,৭৩৭	২৪৮
১৯	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	১৬১	০	২,৬৯,৪৫১	১৫৩
২০	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)	৬৮	০	১,৭১,০১১	৬৬
২১	ফ্রিডম পার্টি	৬৫	০	৯০,৭৮১	৬৩
২২	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	০	৩২,৬৯৩	৬২
২৩	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	০	২,৭৫৭	৮
২৪	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েনউদ্দিন)	৬	০	৬৬,৫৭৫	৫
২৫	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	০	১১,০৭৩	৫
২৬	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	৩০	০	৯,১২৯	৩০
২৭	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নূর মোহাম্মদ)	১	০	২৭	১
২৮	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (সাদেকুর রহমান)	১	০	২৪৮	১
২৯	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	০	১,২০,৭২৯	৪৯
৩০	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	২৬	০	১,১০,৫১৭	২৪
৩১	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১৫	০	২১,৬২৪	১৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	জামানত বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা
৩২	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	১৩	০	৩৪,৮৬৮	১১
৩৩	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	১১	০	২০,৫৬৮	১১
৩৪	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল	১০	০	১,৩২৭	১০
৩৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	০	১,৪২১	১০
৩৬	জনতা মুক্তি পার্টি	৭	০	৫,৪৯২	৭
৩৭	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	০	৩,৬৭১	৮
৩৮	জাতীয় জনতা পার্টি	৭	০	১,৫৭০	৭
৩৯	জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট	৭	০	২,৬৬৮	৭
৪০	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	০	৩,৫৯৮	৭
৪১	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৬	০	২৪,৭৬১	১৫
৪২	বাংলাদেশ গণপরিষদ	৬	০	৬৮৬	৬
৪৩	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মাহবুব)	৬	০	১৩,৪১৩	৫
৪৪	বাংলাদেশ পিপলস লীগ	৫	০	৭৪২	৫
৪৫	জনশক্তি পার্টি	৪	০	১,২৬৩	৪
৪৬	জাতীয় মুক্তি দল	৪	০	৭২৩	৪
৪৭	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল	৪	০	২৯৪	৪
৪৮	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মা:লে:)	৪	০	১১,২৭৫	৪
৪৯	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	০	৬,৩৯৬	৩
৫০	জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	৩	০	৪৯৬	৩
৫১	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	০	৯৩,০৪৯	৪১
৫২	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	০	২৪,৩১০	১৩
৫৩	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	০	২১৪	৩
৫৪	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৩	০	৬,৩৯৬	৩
৫৫	জামায়াতে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	৩	০	১৫,০৭৩	২
৫৬	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ	২	০	১,০৩৯	২
৫৭	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	০	২০২	১
৫৮	মুসলিম পিপলস লীগ	১	০	৫১৫	১
৫৯	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	০	১১,৯৪১	৬
৬০	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	২	০	৫০২	২
৬১	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৭	০	৩,১১৫	৭
৬২	জাতীয় তরুণ সংঘ	১	০	৪১৭	১
৬৩	বাংলাদেশ ফ্রিডম লীগ	২	০	১,০৩৪	২
৬৪	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	০	১৮২	২
৬৫	আইডিয়াল পার্টি	১	০	২১৫	১
৬৬	জাতীয় শ্রমজীবী পার্টি	১	০	২৮	১
৬৭	ডেমোক্রেটিক লীগ	১	০	৪৫৩	১
৬৮	পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	০	৮৭৯	১
৬৯	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	০	১৫৪	১
৭০	বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ (সামাদ)	১	০	১,৩১৪	১
৭১	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	১	০	২৫	১
৭২	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	১	০	৩৯	১
৭৩	বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)	১	০	৩১৮	১

(সূত্র : নির্বাচন কমিশন)[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ১৭টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ থেকে মনোনীত ২২২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন প্রার্থী বিজয়ী হয় এবং ১০৬ জন প্রার্থী জামানত হারায়। নবগঠিত জাকের পার্টির ২৫১ জন প্রার্থীর সকলেই পরাজিত হয় যার মধ্যে ২৪৮ জন প্রার্থী জামানত হারায়। ইসলামী ঐক্যজোটের ৫৯ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন প্রার্থী বিজয়ী হয় এবং তাদের ৫৪ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। বাকি ১৪টি দলের একজন প্রার্থীও জয়লাভ করতে পারেনি। নিচে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ফলাফল দেখানো হলো ঃ

ছক-১০

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮
২	ইসলামী ঐক্যজোট	১
৩	জাকের পার্টি	০
৪	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	০
৫	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	০
৬	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েনউদ্দিন)	০
৭	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	০
৮	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	০
৯	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	০
১০	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	০
১১	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	০
১২	জামায়াতে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	০
১৩	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ	০
১৪	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	০
১৫	মুসলিম পিপলস লীগ	০
১৬	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	০
১৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	০

{সূত্র : নির্বাচন কমিশন}১৫

৪.১০ ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে সর্বমোট ৪,২৪,১৮,২৭৪টি ভোট গৃহীত হয়। নির্বাচনের দলভিত্তিক ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

ছক-১১

১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ
১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	১,৫৮,৮২,৭৯২
২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১১৬	১,৪২,৫৫,৯৮৬
৩	জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	৬৯,৫৪,৯৮১
৪	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০০	৩	৩৬,৫৩,০১৩
৫	ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৬	১	৪,৬১,০০৩
৬	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৬৭	১	৯৭,৯১৬
৭	অন্যান্য দল	৮৬৪	০	৬,৬৬,৪৭৬
৮	স্বতন্ত্র	২৮৪	১	৪,৫০,১৩২

{সূত্র : নির্বাচন কমিশন}১৬

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তৃতীয়বারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১ অক্টোবর। এর পূর্বে একই বছরের ১৫ জুলাই সংবিধান মোতাবেক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের দলভিত্তিক ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

ছক-১২

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৯৫
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৮
৩	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭
৪	ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৪
৫	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (না-ফি)	৪
৬	ইসলামী ঐক্যজোট	৩
৭	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	১
৮	জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১
৯	স্বতন্ত্র	৭

[সূত্র : নির্বাচন কমিশন]১৭

নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ থেকে ১৭ জন, ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে ১৪ জন এবং ইসলামী ঐক্যজোট থেকে ৩ জন প্রার্থী বিজয়ী হয়। নিচে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ফলাফল দেখানো হলো ঃ

ছক-১৩

২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের বিবরণ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭
২	ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	১৪
৩	ইসলামী ঐক্যজোট	৩

[সূত্র : নির্বাচন কমিশন]১৮

তথ্যসূত্রঃ

১। এস, সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, ডিসেম্বর ২০০৪, ঢাকা, পৃঃ ১৭৮-১৭৯
২। ১৯৭২ সালের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-১২, ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রথম খন্ডে প্রকাশিত।
৩। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, পৃঃ ৭৫।
৪। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পৃঃ ৯৮-৯৯
৫। ভোরের কাগজ, ৩ মে ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬। নির্বাচন কমিশন।
৭। প্রাগুক্ত।
৮। প্রাগুক্ত।
৯। প্রাগুক্ত।
১০। প্রাগুক্ত।
১১। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, মে, ১৯৮৬।
১২। প্রাগুক্ত।
১৩। প্রাগুক্ত।
১৪। প্রাগুক্ত।
১৫। প্রাগুক্ত।
১৬। প্রাগুক্ত।
১৭। প্রাগুক্ত।
১৮। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৫.০ বাংলাদেশে জাতীয়তার বিতর্ক ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

৫.১ জাতীয়তার বিতর্ক ঃ বাংলাদেশী বনাম বাঙালি বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তার প্রশ্নে স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে বিতর্ক চলছে। সেই বিতর্কের নিরসন আজও হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭২ সালে রচিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির মধ্যে 'জাতীয়তাবাদ'কে একটি মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জাতিগতভাবে 'বাঙালি' বলে অভিহিত করা হয়।১ পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানের 'পঞ্চম সংশোধনী আদেশ, ১৯৭৮' মোতাবেক বাংলাদেশের নাগরিকগণের জাতীয়তা 'বাংলাদেশী' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।২ সংবিধানের এই পঞ্চম সংশোধনী আদেশের পর থেকে বাংলাদেশে জাতীয়তার বিতর্ক তীব্রতর হয়। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী মহল জাতীয়তার বিতর্কে জড়িয়ে সুস্পষ্ট দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক পক্ষ 'বাঙালি' এবং অন্যপক্ষ 'বাংলাদেশী' জাতীয়তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোও উক্ত বিতর্কে জড়িয়ে যায়। তাদের একটি অংশ (যেমন, মুসলিম লীগ ও জনসংহতি সমিতি) 'বাংলাদেশী' জাতীয়তার পক্ষে, একটি অংশ (যেমন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ) 'বাঙালি' জাতীয়তার পক্ষে এবং অবশিষ্ট অংশ (যেমন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন) বিবদমান কোনো দলেই না গিয়ে 'মুসলিম' জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অন্যতম পথিকৃত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' নামক গ্রন্থের 'মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, '...ইসলামের এ আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছে, তাদেরকে একত্রিত করে ইসলাম এক নব জাতির প্রতিষ্ঠা করেছে, এ জাতির নামই মুসলিম।' ৩

বাংলাদেশে জাতীয়তার বিতর্ক সম্পর্কে ধারণালাভ করার পূর্বে 'জাতি', 'জাতীয়তা' ও 'জাতীয়তাবোধ' সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। নিম্নে এই তিনটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

জাতি ঃ জাতি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত সেই কর্পোরেট সোসাইটি বা জনগোষ্ঠী, যারা ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট ভূখন্ড বা আবাসভূমির বাসিন্দা। জাতিরাষ্ট্রের অধিবাসী এই জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বা সমষ্টিগত জীবন স্বনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ তারা এমন একটি নিজস্ব সরকার দ্বারা শাসিত, যে সরকার সর্বক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন এবং কোন ক্ষেত্রেই অন্য কোন শক্তির লেজুড় বা তাঁবেদার নয়। জাতি প্রত্যয়টি সম্পূর্ণভাবে নৃতাত্ত্বিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, 'একসঙ্গে বসবাসকারী একদল লোক যদি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করে, তারা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে কারও জন্য এমন কিছু করে যা তারা অন্য কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টির জন্য করে না, তারা নিজেদের লোক দ্বারা গঠিত সরকার কর্তৃক শাসিত হয় এবং স্বেচ্ছায় এই সরকারের অধীনে বাস করতে সম্মত হয়, তবে তাদের নিয়ে গঠিত হয় একটি জাতি।'

জাতীয়তা ঃ জাতি যে সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুণের অধিকারী, সেগুলোর সমাহারকে বলা হয় জাতীয়তা। জাতীয়তা হচ্ছে জাতির গুণবাচক রূপ। জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রেষণা সংযুক্ত নেই।

জাতীয়তাবোধ ঃ জাতীয়তাবোধ একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেষণাযুক্ত প্রত্যয়। একটি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য জাতীয়তাবোধ একটি অপরিহার্য উপাদান। পরিকল্পনা কওে স্বল্প সময়ে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তবে সযত্ন পরিচর্যার দ্বারা এর বিকাশ সাধন করা সম্ভব। জাতীয়তাবোধ থেকেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। জাতীয়তাবাদ একইসাথে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয়।

জাতীয়তাবাদ ঃ জাতীয়তাবোধ যখন একটি জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখনই তা জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রসীমায় বসবাসকারী ধর্ম, বর্ণ, ভাষা জনসত্তা নির্বিশেষে একদল মানুষের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা, আত্মোপলব্ধি, একাত্মবোধ, ঐক্যবোধ, সংহতিবোধ ইত্যাদি। জাতীয়তাবাদের ধারণা দিতে গিয়ে হেনরী সেসিল উইল্ড তাঁর `The Universal Dictionary of English Language'-এ তাকে `sense of national unity' বা 'জাতীয় ঐক্যানুভূতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক অভিধানে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, Nationalism denotes a form of group consciousness i, e, consciousness of membership in attachment to a nation. Such consciousness is often called consciousness of nationality and identifies the fortunes of group members with that of a nation-state disired or achieved.' অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ হলো একটি জাতিগত দলবদ্ধ চেতনা,-যে জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক; ধর্ম, ভাষা কিংবা অঞ্চলভিত্তিক নয়। এ রকম জাতীয় রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষিত ও উপার্জিত সৌভাগ্যের অংশীদার হিসেবে ঐ দল-চেতনাই জাতীয় চেতনাকে সৃষ্টি করে এবং জাতি নির্মাণে নিঃস্বার্থ শ্রমদানে উদ্বুদ্ধও করে।' কোহন (Kohn) জাতীয়তাবাদকে বলেছেন, `Sources of all creative cultural and economic well being'. জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে E.H. Carr (ক) সর্বগ্রাহ্য সরকার, (খ) নির্দিষ্ট ভূখন্ড, (গ) জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, (ঘ) সার্বজনীন আগ্রহ এবং (ঙ) সম্মিলিত ইচ্ছা ও অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং, বলা যায়, একটি জাতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত বা একটি জাতিরাষ্ট্রের নাগরিকত্বসম্পন্ন জনসমষ্টির মনস্তাত্ত্বিক গঠন, মনোভঙ্গি, জাতীয় চেতনা, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ানুভূতিগত বন্ধন, সমস্বার্থবোধ বা একাত্মতা, ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য-ইতিহাস, বংশগত উত্তরাধিকার, ভাষা ও বর্ণমালা, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রানুগত্য-সবকিছুর যে নির্যাস, তারই নাম জাতীয়তাবাদ। আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনসমষ্টিগত বিশাল পরিবারের রক্তের, চিন্তার, আবেগের, অনুভূতির, আশা-আকাঙ্ক্ষার, সংস্কৃতির, সংস্কারের, দেশাত্মবোধের ও আনুগত্যের বিরাট সম্পর্ক ও অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তা যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে জাতীয়তাবাদ অবর্তমান।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঃ জাতীয়তার বিতর্কে যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে তাদের যুক্তি হলো, সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতীয়তার একটি স্বতন্ত্র বিকাশের ধারা প্রবহমান ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ কখনও কোন বহিঃশক্তির আধিপত্য মেনে নেয়নি। এমনকি প্রাচীনকালেও উত্তর ভারতকেন্দ্রিক আর্য বা হিন্দু শক্তি এদেশে একাদিক্রমে রাজত্ব করতে পারেনি। অতঃপর 'সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বাঙালি শাসক হিসেবে শশাঙ্ক বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন'।[৪] হিন্দু ও শিবের উপাসক হলেও তাঁর সময়ে রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি ঘটে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিরাজমান চরম অরাজক অবস্থায় (যাকে মাৎস্যন্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয়) রাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক গোপাল নামীয় এক ব্যক্তির মনোনয়ন লাভের মাধ্যমে পাল রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে যা বাঙালির শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ অধ্যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল শাসকগণের রাজত্বকাল অনধিক চারশ' বছরকাল স্থায়ী হয়। এসময় বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাঙালি পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন সে যুগের বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পাল বংশের শাসনকাল শেষে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন বংশীয় হিন্দু রাজাগণ বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু সেন রাজত্ব এতদঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যার কারণে সনাতন হিন্দু ধর্ম বাঙালি সমাজজীবনের গভীরে শেকড় বিস্তার করতে পারেনি। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম বিজয়ের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের জনজীবনে তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপাদানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত বাংলাদেশে সনাতন হিন্দু ধর্মের সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি দুর্বল থাকার কারণেই তুর্কি সেনাপতি মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পক্ষে অতি সহজে বাংলা জয় করা সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ প্রমুখ মনে করেন, বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের সূচনা ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম অভিযানের পূর্বেই ঘটেছিল। চট্টগ্রাম ও বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম বিজয়ের পরে এদেশে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। 'সমাজের বিশেষ করে নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য অনুশাসনের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামের সহজ সরল বাণী ও সামাজিক সাম্যের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে এদেশের মানুষ নিজস্ব দেশজ সংস্কৃতিকে কখনও বিসর্জন দেয়নি।'৫

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন পাঠান সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল জয় করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি ও তাঁর পরবর্তীকালের পাঠান সুলতানগণ বহিরাগত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের তাঁরা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন। হোসেন শাহী আমলে বাংলার আধ্যাত্মিক ও ভাব জগতে অভূতপূর্ব জাগরণ ও উৎকর্ষ সূচিত হয়। একদিকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু ভক্তিবাদ ও অন্যদিকে মুসলিম মরমী সুফি সাধকদের দ্বারা প্রচারিত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বাংলার সমাজজীবনকে ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করে যার ফলে এক নতুন সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয় যার নিদর্শন সমকালীন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থেও কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যেমন,

'যেহি দেশে যেহি বাক্য কহে নরগণ।
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যথ ইতি বাণী।
যার যেবা নিজ বাক্য প্রভু আরাধত্র।
পদুওর দেস্ত প্রভু আপনে লক্ষ্যমাত্র॥
যথ ইতি বাক্য হন্তে প্রভু নহে দূর॥
যে যে রাজ্যে সে সে বাক্য বচন প্রভুর॥
আল্লা খোদা গোঁসাই সকল তান নাম
সর্বগুণে নিরঞ্জন প্রভু গুণধামা॥৬

বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের এটা ছিল স্বর্ণযুগ। মুসলিম সুলতানগণের পৃষ্টপোষকতায় মহাভারত ও ভাগবদ্গীতা প্রথমবারের মত সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। ভাগবদ্গীতা অনুবাদ করার জন্য সুলতান হুসেন শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি সে কথা বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন :

'নির্গুণ অধম মুঞি নাহি কোন গ্রাম।
গৌড়েস্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥'৭

বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে এমন কিছু দিক আছে যা এদেশের বাঙালিকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাঙালি চিরদিন ভাবপ্রবণ জাতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে,' কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই।৮

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হচ্ছে, বাংলাদেশে মৌলবাদী রক্ষণশীল ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টার চেয়ে সুফি-সাধক, পীর-দরবেশ, আউল-বাউলদের অবদান ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।৯ ধর্মের ক্ষেত্রে এই সাধকগণ যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, সেটি আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের ঐতিহ্য। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে, সেটি বিরোধ বা সংঘাতের ধারা নয়, সেটি হলো বিভিন্ন মতবাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ধারা, সমঝোতা ও সমন্বয়ের ধারা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা এভাবেই বিকশিত হয়ে নানা ফুলে-ফলে ও শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ পক্ষান্তরে যারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সমর্থন করেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র এবং 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' সুস্পষ্টভাবে বর্তমান বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রসীমায় বৃত্তবদ্ধ। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল জুড়ে বাংলাদেশের সীমানা যেখানে রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য-ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি। এ জাতির আছে নিজস্ব জীবনবোধ, জীবনধারা, মনস্তাত্ত্বিক গঠন, সমষ্টিগত মনোভঙ্গি, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ানুভূতির বন্ধন। এ সকল বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপাদান। ১৯৫২ সালে এদেশের মানুষ ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপোষহীন সংগ্রাম করে তাদেও স্বতন্ত্র জাতীয়তার রাজনৈতিক বুনিয়াদ নির্মাণ করেছে। বিশ্বের বাংলাভাষী অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ সে আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিল না। তাদের আরও যুক্তি হচ্ছে, 'একাধিক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে নৃতত্ত্বগত, গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, সভ্যতাগত, ধর্মগত বিভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু সেগুলোই তাদের এক জাতি বা এক জাতীয়তা সম্পন্ন করে না। মনস্তাত্ত্বিক গঠন, চেতনা, হৃদয়ানুভূতি, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা, সমস্বার্থবোধ এবং ঐতিহ্য ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ঐক্য, অন্ততপক্ষে বৃহত্তর জনসংখ্যা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে ঐক্য থাকতেই হবে। তা না থাকলে একটি জাতি বা জাতিরাষ্ট্র অথবা জাতীয়তা হতে পারে না। আবার একই রাষ্ট্রে একাধিক এথনিক গ্রুপ, সাংস্কৃতিক গ্রুপ বা ধর্মীয় গ্রুপ থাকতেই পারে। কিন্তু জাতিসত্ত্বাবোধ বা জাতীয় ভাবাদর্শের মূলধারা থেকে তারা কখনও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সংকল্পবদ্ধভাবে চিরকাল বা দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকলে তারা হয়ে পড়বে একটি জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।'[১০]

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারীগণ তাদের যুক্তির স্বপক্ষে ১৯৭২ সালের সংবিধানকেও উপস্থাপন করে থাকেন। ১৯৭২ সনে রচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ হইয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।' তাঁদের অভিযোগ, এখানে বাংলাদেশ নামক ভূখন্ড অর্থাৎ আমাদের ভৌগোলিক সীমানা, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই। কাজেই 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' কথাটা কেবল রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও অবাস্তব। এমনকি রাজনৈতিক দর্শন হিসেবেও এর অসারতা প্রমাণিত।

৫.২ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা ঃ 'সম্প্রদায়' শব্দটির বিশেষণ হিসেবে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটির উৎপত্তি। আভিধানিকভাবে সম্প্রদায় শব্দের অর্থ হচ্ছে সমাজ, দল, স্বজাতীয়, গুরুপরম্পরা উপদেশ ইত্যাদি।[১১] অভিধানে অনেক ধরনের অর্থ থাকলেও সাধারণ ধর্মবিষয়ক ব্যাপারেই সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা শব্দ দুটো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি ধর্মের সাথে অন্য একটি ধর্মের বিরোধকে যেমন সাম্প্রদায়িকতা নামে অভিহিত করা হয়, তেমনি একই ধর্মের নানা উপদল বা গোত্রের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ বা সংঘাতকেও সাম্প্রদায়িকতা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ খ্রিস্টানধর্মে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট বিরোধ, হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিরোধ, ইসলাম ধর্মে শিয়া-সুন্নী-আহমদিয়া বিরোধ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। শিয়া-সুন্নী বিরোধের জন্ম সেই সপ্তম শতাব্দীতে যার রক্তধারা ও হত্যাযজ্ঞ আজও মুসলিম বিশ্বে অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হয়েও এই বিরোধ থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৯৭ সালের প্রথম চারমাসে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলায় সংখ্যালঘু শিয়া ও সংখ্যাগুরু সুন্নী জঙ্গী গ্রুপের প্রায় ৭০ জন প্রাণ হারায়। 'সিপাহী সাহাবা' নামের একটি সুন্নী জঙ্গী গ্রুপ মসজিদে হামলা চালিয়ে ইমামসহ আরও তিনজনকে জখম করে।[১২] ২০০৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট বাংলাদেশ এক বছরের মধ্যে আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে আলটিমেটাম দেয়। উক্ত আলটিমেটাম শেষ হওয়ার পরদিন ২০০৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারা রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে তারা কাদিয়ানিদের মসজিদে হামলার চেষ্টা চালায় এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ২০০৫ সালের এপ্রিলে সাতক্ষীরার একটি গ্রামে পর পর তিনদিন খতমে নবুয়ত কর্মীরা আহমদীয়াদের বাড়ি বাড়ি হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।১৩

অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের ভাষায়, 'সহজভাবে উপস্থাপন করলে সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে সেই বিশ্বাস যা মনে করে যেহেতু এক সম্প্রদায়ের লোক একই বিশেষ ধর্ম অবলম্বন করে চলে, সুতরাং ফলত তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সকল এক ধরনের।'১৪ অর্থাৎ ধর্মচেতনা আর সামগ্রিক গোষ্ঠীচেতনাকে একাকার করে ফেলাই সাম্প্রদায়িকতা, যার বশবর্তী হলে মানুষ সবই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে অথচ ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস রাখতে গিয়ে সংকীর্ণতার ফলে সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যা বুঝতে পারে না। ফলে একই সামাজিক সমস্যায় দীর্ণ বা অর্থনৈতিক শোষণক্লিষ্ট, একই শ্রেণীর, একই বস্তুগত পটভূমিকার মানুষও তখন অকারণে শত্রু বা বিরোধী প্রতিপন্ন হন।

বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে তিনটি উপাদানের মিশ্রণের ফলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। এগুলি হলো যথাক্রমে-

(১) কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বা একাত্মবোধ;

(২) অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্য এবং অপরিবর্তনীয় স্বাতন্ত্র্য;

(৩) অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ।

নিম্নে তিনজন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে উক্ত তিনটি কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

কেনেথ জোনস সাম্প্রদায়িকতাকে 'সমাজের কোন এক অংশের মধ্যে একাত্মবোধ ও চিহ্নিতকরণের প্রধানতম মিলনসূত্র ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সকলের সচেতন অভিন্ন ধারণা' বলে অভিহিত করেছেন।১৫ এই 'আইডেন্টিটি' অবশ্য ধর্মীয় একাত্মবোধ যা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আচারব্যবহার ও ভাষা। ধর্ম থেকে ধর্মমোহ সৃষ্টি হয়। এই হলো সাম্প্রদায়িকতার প্রথম উপাদান।

দ্বিতীয়ত, এই আপন ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, বিশ্বাস এবং একাত্মবোধ থেকেই জন্ম নেয় অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্যবোধ-যা কোন কারণে ঘুচবার নয়। শুধু বিরোধ, শুধু শত্রুতা। এ বিষয়ে উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ বলেছেন, 'ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে বলা যেতে পারে একটা মতাদর্শ, যা জোর দিয়ে প্রত্যেক ধর্মের অনুগত সম্প্রদায়কে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায় বা ইউনিট হিসেবে দেখিয়েছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্য এমনকি শত্রুতার উপর জোর দিয়েছে।'১৬ এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধই সাম্প্রদায়িকতার দ্বিতীয় উপাদান।

তৃতীয়ত, এই পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য এবং শত্রুতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে সংঘর্ষে, আত্মক্ষয়ী হানাহানি এবং কুৎসিত দাঙ্গায়। এই উন্মাদনায় মানুষ মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। এই উন্মাদনাই সাম্প্রদায়িকতার তৃতীয় উপাদান। ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ বলছেন, 'যাদের তারা প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবী করে, সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বা সংগঠনগুলির কার্যকলাপ এমনভাবে হয়, যা অন্য গোষ্ঠীর মানুষের স্বার্থের বা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী।'১৭ অর্থাৎ এই উন্মাদনায় দেশের স্বার্থের চাইতেও বড় হয়ে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থ।

সাম্প্রদায়িক চেতনা যে শুধুমাত্র ধর্মীয় আদর্শে এবং সামাজিক আচরণে ভেদপন্থা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে তাই নয়, রাজনৈতিক জীবনেও সৃষ্টি করে গভীর সংকট। বস্তুতপক্ষে রাজনীতির সঙ্গে বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক চিন্তার ও কার্যকলাপের যোগ গভীর। প্রভা দীক্ষিত তাঁর 'কমিউনালিজম এন্ড স্ট্রাগল ফর পাওয়ার' বইতে তা সবিস্তারে দেখিয়েছেন।১৮ রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আর একজন পন্ডিত গোপালকৃষ্ণ লিখেছেন, 'রাজনীতির মধ্যে ধর্মের সেই ধ্বংসাত্মক ভারতীয় অভিপ্রকাশ যা ধর্মীয় আইডেন্টিটির উপরই জোর দেয় এবং রাজনৈতিক সমাজকে কতকগুলি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কনফেডারেশন বলে মনে করে।'১৯ এই রাজনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার যোগ ঔপনিবেশিক ভারতে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ উপরের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রদায়গত বিরোধের উগ্র রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, আমাদের দেশের ইতিহাসে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর পিছনে কাজ করেছে সাম্রাজ্যবাদী বিভেদপন্থী ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রত্যক্ষ ইন্ধন। আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িকতা ঢুকে পড়ে। এটাই ইতিহাসের পরিহাস। বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমে ক্রমে বাড়লেও সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক বিরোধ তার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথের ভাষায়, 'এই সময় থেকে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের সার্বিক জীবনকে গুরুতরভাবে বিষিয়ে তোলে এবং ক্রমে এই কলুষতা বাড়তে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এটা হয়ে দাঁড়ায় ড্রাগ খাওয়ার অভ্যাসের মতন, যে অভ্যাস যতদিন থাকবে, ক্রমেই বেশি মাত্রায় ডোজ দরকার হবে।'২০ আরও একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক চাপ হয়ে উঠলো রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের হাতিয়ার'-এ মোড অফ পলিটিক্যাল মবিলাইজেশন।২১ অর্থাৎ এ কথা বলা যেতে পারে যে, 'সাম্প্রদায়িকতার কালো ছায়া পড়েছে সর্বত্র—ধর্মীয় মনোভাবে, সামাজিক আচরণে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এবং অবশ্যই রাজনীতিতে'।২২

বর্তমান পৃথিবীতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে যে সব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ধর্মীয় রাষ্ট্র বা ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের নেতৃত্বের পর্যায়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ক্ষমতা দখলের নীল নকশা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মোটিভেশনের অংশ হিসেবে ধর্মের যে ব্যাখ্যা ও রাজনীতিকীকরণ তারা করেন, তারই উপজাত হিসেবে তৈরি হয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যার পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বর ট্র্যাজেডি, ব্রিটেনের ৭ জুলাই ট্র্যাজেডি, গুজরাটের মুসলিম নিধন কিংবা বসনিয়ার মুসলিম হত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটে। যে পরিকল্পিত শিক্ষা ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত করে, সেই একই শিক্ষা হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসকে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত করে। কোন এক পক্ষের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বর ট্র্যাজেডি কিংবা ব্রিটেনের ৭ জুলাই ট্র্যাজেডিকে যদি মনে হয় যথাযথ, তাহলে অপরপক্ষের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংস, গুজরাটের মুসলিম নিধন কিংবা প্যালেস্টাইনে ইসরাইলী নির্যাতনকের মনে হবে যথাযথ। এখানে দোষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের নয়, দোষ সাম্প্রদায়িকতার।

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত অরুন্ধতী রায়ের একটি লেখায় উক্ত আগ্রাসন সম্পর্কে এক মার্কিন সৈন্যেও অনুভূতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সৈন্যটি তার অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছিল এভাবে : 'নাইন-ইলেভেনের পর থেকে এদিনটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমার নোংরা হাতকে এদের রক্তে আরও নোংরা করব।' অযোধ্যায় শিবসেনা কর্তৃক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় সেখানে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সদস্যকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখে বিবিসির এক ভারতীয় সাংবাদিক তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে জানায় যে, এটা রামের জন্মস্থান। এখানে রাম মন্দির স্থাপন করা আমাদের ধর্মীয় অধিকার। আমিও এই মসজিদ ধ্বংসের পক্ষপাতি। তবে দুঃখের বিষয়, সরকারের চাকরী করি দেখে মসজিদ ভাঙার এই পুণ্যকাজে আমি নিজে অংশগ্রহণ করতে পারছি না।

একইভাবে ইরাকের আবু গারিব কারাগারে মার্কিন সৈন্য কর্তৃক ইরাকী মুসলিম কারাবন্দীদের ধর্মীয়ভাবে উৎপীড়ন কিংবা কিউবার গুয়ান্তোনামো বে-তে মার্কিন কারারক্ষী কর্তৃক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন অবমাননার ঘটনা ইত্যাদি সবই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ফল, যার অহরহ শিকার হচ্ছেন সাধারণ ধর্মভীরু ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রাসের সাথে যাদের বাস্তবে কোন সম্পর্ক নেই। নিউইয়র্কের ফেডারেল জজকোর্টে দায়েরকৃত এরকম একটি মামলায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম-বিদ্বেষের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে। মামলার বিবরণটি এরকম:

Plaintiffs:

Ehab Elmaghraby, an Egyptian immigrant who ran a restaurant in Times Square,

and

Dhaka University Institutional Repository

Javaid Iqbal, a Pakistani immigrant whose Long Island customers knew him as the cable guy.

The lawsuit charges that, solely because of their race, religion or national origin, the two men were physically abused and deprived of due process while being detained for more than eight month in the harsh maximum security unit of the Metropolitan Detention Center in Brooklyn. The men, who eventually pleaded guilty to minor criminal charges unrelated to terrorism and were deported, charged that they were repeatedly slammed into walls and dragged across the floor while shackled and manacled.

They said they were kicked and punched until they bleed, cursed as terrorists and Muslim bastards and subjected to multiple unnecessary body-cavity searches, including one in which correction officers inserted a flashlight into Mr. Elmaghraby's rectum, making him bleed.২৩

সম্প্রতি লন্ডনের 'সাপ্তাহিক গার্ডিয়ান' পত্রিকায় গুয়ানতানামোয় বন্দী নির্যাতন সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'গুয়ানতানামোয় বন্দী নির্যাতনের খবর হোয়াইট হাউস জানতো : সেরা সন্দেহভাজনদের খতম করার গোপন অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করেন জর্জ বুশ'। উক্ত সংবাদের রিপোর্টার ছিলেন অলিভার বার্কম্যান, যার কর্মস্থল ওয়াশিংটনে। বার্কম্যানের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০০২ সালের গোড়ার দিকে গুয়ানতানামোয় বন্দী নির্যাতনের সাক্ষ্যপ্রমাণ বুশ প্রশাসনের গোচরে আনা হলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে চাননি। আরও জানা যায়, গুরুতর সন্দেহভাজনদের হত্যা বা পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত একটি দল গঠনের আগাম অনুমতিপত্রে প্রেসিডেন্ট বুশ স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। সংবাদে আরও বলা হয়, সিআইএ-র একজন বিশ্লেষক ২০০২-এর গ্রীষ্মে গুয়ানতানামো সফর করেন এবং তিনি নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসেন এমন ধারণা নিয়ে যে, 'আমরা যুদ্ধ অপরাধ করে চলেছি এবং ওই বন্দীশিবিরের অর্ধেকেরও বেশি বাসিন্দার ওখানে থাকার কথা নয়।'২৪

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, ধর্মের নামে এই সাম্প্রদায়িকতা ও হানাহানির প্রশ্নে ধর্মের অবস্থান সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। আসগর খানের ভাষায়, 'যে ইসলামের মূল আহ্বান ন্যায়, বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা, তার সাথে সাম্প্রদায়িকতার বা সংকীর্ণতার কোন সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক সুবিধাবাদই ইসলামীকরণের প্রধান ভিত্তি।'২৫ পবিত্র কুরআন মজিদে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক। অবশেষে যে ব্যক্তি ভ্রান্তির পথ ছেড়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে, সেই প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী।'২৬ ধর্মের কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পবিত্র কুরআন মজিদে আরও বলা হয়েছে, 'এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'২৭

ব্যক্তি, দল, পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল, জাতি, বর্ণ ও ভাষাগত কৃত্রিম বৈষম্য থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ প্রদান করে কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে :

'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমোপ্নোতি
যইহনানেব পশ্যতি।'২৮

অর্থাৎ, যা কিছু এখানে, তার সমস্তই ওখানে, যা ওখানে তার মতো সমস্তই এখানে। যে জন এখানে এবং ওখানের মধ্যে ভিন্ন করে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি

Dhaka University Institutional Repository

এবং ধর্মান পৃথক পশ্যংস্তানেবানু বিধাবতি।'২৯

অর্থাৎ পর্বতের কোন উচ্চতম দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টি হলে তা যেমন নানা ধারায় বিকীর্ণ হয়ে পর্বতের নিম্নপ্রদেশে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিভিন্ন দেহের ধর্মানুসারে আত্মাকেও পৃথক পৃথক বলে দর্শন করে, সে ঐ সকল ধর্মের অনুসরণ করে।'

একজাতিভুক্ত মানুষ কিভাবে পরবর্তীতে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়, তার বর্ণনা পাওয়া যায় পবিত্র কুরআন মজিদে। যেমন, 'মানুষ (আদিতে) ছিল একজাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করলো)। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করতো।'৩০ অন্যত্র বলা হয়েছে, 'এই যে তোমাদের জাতি-এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার উপাসনা কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে।'৩১

সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে পবিত্র কুরআন মজিদে আরও বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।'৩২

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চৌদ্দ শ' বছরের মধ্যে এগারো শ' বছর রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক ছিল। ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে যোগসূত্রের সমাপ্তি ঘটে ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সুইজ আল দাওলী আহমদ নামে একজন বুহাইদ যুবরাজ বাগদাদে প্রবেশ করে এবং আব্বাসীয় খলিফাগণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বেও পরিসমাপ্তি ঘটায়। খলিফার নাম কিছু সময়ের জন্য প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও মূলত প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে সুলতান ও আমীর কর্তৃক। বুহাইদগণ আমির হিসেবে ইরাক শাসন করেছে একশ' দশ বছর এবং ১০৫৫ সালে সেলজুক ও তুগরিলগণ এদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে। পরবর্তীতে ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ দখল ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রতীকী খেলাফতের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে খেলাফত পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দাবী উত্থাপন করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী তা কখনও বিশ্বাস করেনি। মুসলিম অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রক্ষমতা থেকেছে ধর্মনিরপেক্ষ।৩৩

৬২২ খ্রিস্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করার পর মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা-ও ছিল অসাম্প্রদায়িক। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চুক্তি (যা মদিনার সনদ নামে পরিচিত) সম্পাদিত হয়, তাতে বলা হয় : প্রত্যেক ব্যক্তি (সে ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, সাবিয়িন হোক বা মুসলিম) তার নিজস্ব ধর্ম পালন করার অধিকার পাবে এবং রাষ্ট্রের মূল কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন সাধারণ জনগণ দ্বারা, আর সংখ্যালঘুকে দেয়া হবে সংখ্যাগুরুর মতো সমস্ত অধিকার। মানবজীবনে যে সব মূল্যমানের সৃষ্টি হবে, তারই আলোকে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।৩৪

ইসলাম বিভেদে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে সম্প্রীতিতে। ইসলামের মূল বিশ্বাস হলো, পৃথিবীর মানব জাতি একই পরিবার থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ্তা'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আত্মা দান করেছেন, তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি পারস্পরিক সমঝোতা ও সংহতির জন্য মানুষকে যুগধর্মী করেছেন। তাই যুগে যুগে মানুষের নিকট বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক বা অবতার প্রেরিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের পূর্বে বহু ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে এবং প্রত্যেক ধর্মেরই ছিল প্রেরিত পুরুষ। পবিত্র কুরআনে এর স্বীকৃতি আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী আগমন করেনি।'৩৫ 'এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন দূত প্রেরণ করেছিলাম।৩৬ 'আমরা রাসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।'৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ ধর্ম ও মৌলবাদ ঃ শাব্দিক অর্থে 'মৌলবাদ' কোন খারাপ জিনিস নয়। মূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, তাকেই মৌলবাদ বলা হয়। হাফেজ জিয়াউল হাসান জিয়া এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত পরিভাষা অনুসারে মৌলবাদী বলতে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়, যারা মূলের দোহাই দিয়ে পরিস্থিতিকে অবনতিশীল করে অর্থাৎ নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। আমাদের দেশে চার ধরনের মৌলবাদ বিরাজ করছে :

১. গোঁড়া মৌলবাদ : এদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা যা শুনেছে বা পড়েছে, তার বাইরে কিছু জানতে বা বুঝতে চায় না। কিন্তু নিজের গোঁড়ামি অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় না।

২. সবকদানকারী মৌলবাদ : এরা যেটুকু জানে তার মর্ম বা তত্ত্ব বুঝুক আর নাই বুঝুক, অন্যদের তা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা পাড়ায় পাড়ায়, মসজিদে মসজিদে সবক শিক্ষা দেয়। বলে, যা বলি মুখস্থ করে নাও, প্রশ্ন করো না। মুসলমানদের প্রশ্ন করার দরকার নেই।

৩. প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদ : এরা ধর্মের দোহাই দিয়ে যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনেও পিছ পা হয় না। এদের সুবিধাবাদী চরিত্রের কারণে দুর্বল দেশ বা ব্যক্তির বেলায় একরকম আবার পরাশক্তির বেলায় অন্যরকম ফতোয়া দিয়ে থাকে। ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে এদের জুড়ি নেই।

৪. প্রগতিশীল মৌলবাদ : এরা ধর্মের ভিত্তির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে, কিন্তু স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে না। এরা প্রতিক্রিয়াশীল নয়। এরা ধর্মমূলের সাথে প্রগতির কোন বিরোধ দেখতে পায় না।'[৩৮]

কোন বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করে যুক্তিহীন, অন্ধ ও অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস গড়ে উঠলে তা থেকে মৌলবাদের উদ্ভব ঘটে। সময় ও পরিপার্শ্বের দ্বান্দ্বিক অগ্রযাত্রায় যে কোন অনুসৃত মতবাদের প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তনকে যারা স্বাগত জানায় না, তারা মৌলবাদী। তুলনামূলক পঠন-পাঠন ও অনুশীলন ব্যতিরেকে আপন মতাদর্শকে নির্ভুল ও অপরের মতাদর্শকে যারা ভ্রান্ত মনে করে, তারাও মৌলবাদী। মৌলবাদ সকল প্রকার সংস্কার ও তুলনামূলক অনুশীলনের বিপক্ষে। নিজ মতবাদকে পরিবর্তনশীল মানবীয় চাহিদার উর্ধ্বে স্থান দেয়ায় মৌলবাদ সকল প্রকার মানবতার বিপক্ষে, প্রগতি ও সভ্যতার বিপক্ষে।

মৌলবাদ বা ধর্মীয় গোঁড়ামির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে গৌতম নিয়োগী বলেছেন, 'নিজের ধর্মবিশ্বাস যখন অপরের ধর্মকে ব্যাহত বা আঘাত করে বা অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের শত্রু মনে করে নিজের ধর্মবিশ্বাস যখন যুক্তির পথ সম্পূর্ণ পরিহার করে (এবং তা মানবতাবিরোধী হলেও) তখনই তা গোঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত। রক্ষণশীলতা বা কনজারভেটিভইজম কিংবা অর্থোডক্সি, পরিবর্তন-বিরোধী ভাব এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই ধর্মীয় গোঁড়ামি যখন উগ্র আকার ধারণ করে, তখন তা সাম্প্রদায়িকতার রুপ নেয়। সাম্প্রদায়িকতা বা কমিউনালিজম অবশ্য শুধু যে ধর্মীয় হবে এমন মানে নেই। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধ মাত্রেই সাম্প্রদায়িক-তা ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, বর্ণগত, যাইহোক না কেন। এই ধর্মীয় গোঁড়ামি যখন নিজ ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের প্রতি স্বার্থমগ্ন হয়ে অপর ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি করতে চায়, তখন তাকে বলা যেতে পারে ধর্মান্ধতা, ইংরেজিতে ফ্যানাটিসিজম বা বিগটরি। এর বশবর্তী হলে রাজা হতে পারেন স্বৈরাচারী, শাসক হতে পারেন জল্লাদ, ধর্মীয় নেতা হতে পারে মানব সমাজের শত্রু, সাধারণ মানুষ মেতে উঠতে পারে আত্মক্ষয়ী দাঙ্গায়। তথ্য ও যুক্তি তখন কাজ করে না।[৩৯]

মৌলবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বীয় অন্ধবিশ্বাসের জোরে যাবতীয় যুক্তির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বরগুনা শহরের দারুল উলুম নেছারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়নি এই যুক্তিতে যে উক্ত জাতীয় সংগীত অমুসলিম কর্তৃক রচিত। অথচ উক্ত জাতীয় সংগীতের স্থলে জনৈক কবি রুহুল আমিনের লেখা একটি গান পরিবেশন করা হয়েছে, যে গানে হিন্দুধর্মের 'অমরা' ও 'মন্দাকিনী' শব্দ দুটো রয়েছে। গানের প্রথম দুটি লাইন এরকম :

Dhaka University Institutional Repository

আমার জন্মভূমি চিনি তোমায় চিনি
বয়ে চলে অমরার মন্দাকিনী।'৪০

মৌলবাদের আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত অজ্ঞতা। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ গ্রন্থের কোন এক খন্ডে মহানবীর চরিত্রহানি সংক্রান্ত অভিযোগে কিছুদিন পূর্বে বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্র বসুর ফাঁসি দাবি করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক মৌলবাদী সংগঠনগুলি মিছিল বের করেছিল। অথচ তাদের এই তথ্য জানা নেই যে, শ্রীনগেন্দ্র বসু আজ থেকে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম থেকে মৌলবাদের উৎপত্তি হলেও ধর্মে মৌলবাদের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। ইসলাম ধর্মে অন্ধ অনুসরণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মজিদে বলা হয়েছে, 'মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার সম্মুখে তার প্রতিপালকের বাণী পাঠ করা হলে অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না।'৪১ হাদিস শরিফে আছে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'প্রতি একশত বছর পর পর একজন করে সংস্কারক আবির্ভূত হন। তাঁরা ধর্মের অসার কুসংস্কারগুলো দূর করতে চেষ্টা করেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার পর কোন নবুয়ত নেই, শুধু আছেন সংস্কারকগণ।'৪২

তথ্যসূত্র ঃ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ-৬।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯, অনুচ্ছেদ-৬।

৩। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামের জীবন পদ্ধতি, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০২, পৃ: ১৩-১৪।

৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ: ১৪৯

৫। ইতিহাসের সন্ধানে, সালাহউদ্দীন আহমদ, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, পৃ: ১২।

৬। রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত 'আবদুল হাকিম রচনাবলী', ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ: ৪৭২।

৭। Tamonash Chandra Dasgupta, `Aspects of Bengali Society From Old Bengali Literature' in Journal of the Department of Letters, University of Calcutta, Vol. XIV, Calcutta, 1927, P. 79)।

৮। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ: ৭।

৯। Muhammad Enamul Huq, A History of Sufism in Bengal, Dhaka 1975, P. 280-316

১০। আমাদের জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশী না বাঙালী, রুহুল আমিন, সূচনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ, ঢাকা, ২০ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ: ১৩।

১১। ছাত্রবোধ অভিধান, আশুতোষ দেব সংকলিত, ১৯৩৯

১২। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ মে ১৯৯৭

১৩। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১২, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫।

১৪। বিপান চন্দ্র, কমিউনালিজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, বিকাশ পাবলিশিং, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ: ২১০।

১৫। কেনেথ জোনস, কমিউনালইজম ইন দ্য পাঞ্জাব, জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ২৮ (১৯৭৮), পৃঃ ৩৯।

১৬। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া : এ সোশাল অ্যানালিসিস, লন্ডন, ১৯৪৫, পৃ: ১৪৭।

১৭। ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, ইন্ডিয়া এজ আ সেকুলার স্টেট, প্রিন্সটন, ১৯৬৩, পৃ: ৪৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। ওরিয়েন্ট লংম্যান, নতুন দিল্লী, ১৯৭৪
১৯। গোপালকৃষ্ণ, রিলিজিয়ন ইন পলিটিক্স, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল হিস্টরি রিভিউ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ: ৩৯২-৩৯৩।
২০। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া : এ সোশাল অ্যানালিসিস, লন্ডন, ১৯৪৫, পৃ: ১৭২।
২১। জি. আর. থ্রাসবি, হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস্ ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ই. জে. ব্রিল, লিডেন, ১৯৭৫, পৃ: ৭।
২২। এ. কে. ভকিল, থ্রি ডাইমেনশনস্ অফ হিন্দু-মুসলিম রিলেশনস্, মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েটস্, কলকাতা, ১৯৮১।
২৩। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১০, পৃ: ১৯।
২৪। গুয়ানতানামোয় বন্দী নির্যাতন এবং জর্জ বুশ, মাহমুদ হাসান, সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৭, ১৯ এপ্রিল, ২০০৫।
২৫। Islam, Politics and the States : The Pakistan Experience, Edited by Mohd. Asghar Khan, Published by Zed Books, London।
২৬। কুরআনুল করিম, সুরা বাকারা, আয়াত-২৫৬।
২৭। কুরআনুল করিম, সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬।
২৮। কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮১ নং শ্লোক
২৯। কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮৫ নং শ্লোক
৩০। কুরআনুল করিম, সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩।
৩১। কুরআনুল করিম, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৯২।
৩২। কুরআনুল করিম, সুরা মোমেনুন, আয়াত ৫২-৫৩।
৩৩। Ekbal Ahmad, *Islam, Politics and the States* : The Pakistan Experience, Edited by Mohd. Asghar Khan, Published by Zed Books, London।
৩৪। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৮৫।
৩৫। কুরআনুল করিম, ৩৫:২৫
৩৬। কুরআনুল করিম, ১৬:১৭
৩৭। কুরআনুল করিম, ২:২৮৬
৩৮। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ জুলাই, ১৯৯৪
৩৯। গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, জুন ১৯৯১, কলিকাতা, পৃ: ১৫।
৪০। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩৯তম বর্ষ, ২৫২ তম সংখ্যা, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
৪১। কুরআনুল করিম, সুরা ফোরকান, আয়াত ৭৫।
৪২। মহানবী, ডঃ ওসমান গণি, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৬.০ বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

৬.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ইতিহাসে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একটি ভয়াবহ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এদিন সকালে 'মার্কিন অর্থনীতির হৃৎপিন্ড' বলে কথিত নিউইয়র্কের 'টুইন টাওয়ার'-এ দুটি আত্মঘাতি কমার্শিয়াল জেট প্লেন হামলা চালায় (হামলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত টুইন টাওয়ারের ছবি ঃ পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)। প্রায় একই সময়ে ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে তৃতীয় একটি বিমান হামলা চালায়। চতুর্থ প্লেনটি পেনসিলভানিয়ার একটি মাঠে বিধ্বস্ত হয়। এই চারটি হামলায় ২,৯৯২ জন বেসামরিক নারী-পুরুষ নিহত হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠন 'আল-কায়েদা' উক্ত হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। চলতি বছর নাইন-ইলেভেনের ঘটনার চার বছর পূর্তি উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনদিনের শোক কর্মসূচি পালিত হয়। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রদত্ত এক ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'শুধু অস্ত্রের জোরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা যাবে না। মুসলিম জঙ্গীদের পরাস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে এখন থেকে আদর্শের লড়াইও চালিয়ে যেতে হবে।'১

বলা হয়ে থাকে প্রতিটি দেশের ইতিহাসে কিছু বড় ঘটনা বা Defining moments থাকে, যার ফলে সেদেশের অবস্থার বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়; রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বদলে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এরূপ বড় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত তিনটি ঘটনার প্রথমটি হচ্ছে ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনীর পরাজয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে সংঘটিত উপরে বর্ণিত আত্মঘাতি বিমান হামলা। তৃতীয় ও সর্বশেষটি হচ্ছে ২৯ আগস্ট তারিখে সংঘটিত হারিকেন ক্যাটরিনার ধ্বংসলীলা।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (যা মার্কিন জনগণের নিকট নাইন-ইলেভেন হিসেবে পরিচিত) তারিখে সংঘটিত এই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা গোটা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিধারা পাল্টে দেয়। মার্কিন প্রশাসন তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের দিকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আল-কায়েদার দুর্গ বলে পরিচিত আফগানিস্তানে শুরু হয় মার্কিন বাহিনীর নজিরবিহীন অভিযান। সে অভিযানে হাজার হাজার বেসামরিক নারী-পুরুষ ও শিশু প্রাণ হারায়। কিন্তু মার্কিন বাহিনী যে দাবীই করুক, তাদের সে অভিযান সফল হয়েছে বলা যায় না। আল-কায়েদার প্রধান সংগঠক ও কর্ণধার ওসামা বিন লাদেন ও তার প্রধান সহযোগী মোল্লা ওমরসহ সংগঠনের শীর্ষ ও সক্রিয় নেতৃত্ব ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। যার ফলে আফগানিস্তানের মাটিতে এখনও তালেবানদের গুপ্ত হামলার শিকার হয়ে নিয়মিতভাবে প্রাণ হারাচ্ছে মার্কিন সৈন্যরা। যুদ্ধ পরিচালনায় শত শত কোটি ডলার ব্যয়ের পরও মার্কিন বাহিনীকে প্রায়ই ইন্টারনেটের ভিডিও চিত্রে ওসামা বিন লাদেনের হুমকি আর যুক্তরাষ্ট্রের আশু পতনের বার্তা শুনতে হচ্ছে। পরবর্তী বছরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের প্রেসিডেন্ট (পরবর্তীতে ক্ষমতাচ্যুত) সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে লাদেনের সাথে সখ্য ও পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার অভিযোগ আনেন। ফলশ্রুতিতে হামলা হয় ইরাকে। শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যে যুদ্ধে এ পর্যন্ত মারা পড়েছে ১,৮৯১ জন মার্কিন সৈন্য।২ এর পরের ঘটনা সবারই জানা। কিন্তু যে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য এত নজরদারী, এত অভিযান, তার কিছুই আল-কায়েদাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ের সন্ত্রাসী ঘটনাগুলো এ ধারণাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সব আন্তর্জাতিক ফোরামের মূল আলোচ্যসূচিতে উঠে এসেছে সন্ত্রাসবাদ। নাইন-ইলেভেনের পর ইন্দোনেশিয়ার বালি, মিসরের শারম আল শেখ, ভারতের পার্লামেন্ট ভবন, স্পেনের মাদ্রিদ, ব্রিটেনের লন্ডন, পাকিস্তানের করাচি, বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। কিন্তু এত যুদ্ধের পরও বিশ্বের মানুষ আজ প্রতি মুহূর্তে আরও আতংক, আরও সন্ত্রাসের সঙ্গে দিনযাপন করছে। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন, তাদের সচিত্র প্রতিবেদনে

Dhaka University Institutional Repository

বেরিয়ে এসেছে আল-কায়েদার উদ্বেগজনক অগ্রযাত্রার কাহিনী। মার্কিন সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল জেরি ওহারাও স্বীকার করেছেন সন্ত্রাসীদের হয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে এসেছে বিপুল সংখ্যক বিদেশী জঙ্গী। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক উন্নয়নশীল দেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জিহাদের নামে সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের কাউন্টার টেরোরিজম বিশেষজ্ঞ রিচার্ড এ ক্লার্ক 'এগেইনস্ট অল এনিমি : ইনসাইড আমেরিকা-ওয়ার অন টেরর' নামক একটি বই লেখেন যা বিশ্বব্যাপী আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তোলে। বইটি লেখার পূর্বে মিঃ ক্লার্ক জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন থেকে ইস্তফা দেন। মিঃ ক্লার্ক তার পেশাগত জীবনে বুশ সিনিয়র থেকে বুশ জুনিয়র পর্যন্ত সময়কালে প্রথমে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং পরে হোয়াইট হাউজের কাউন্টার টেরোরিজমের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১/২০০১-এর সন্ত্রাসী হামলার পটভূমি, তার হালনাগাদ প্রভাব এবং বুশ জুনিয়র সূচিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থানের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাঁর এই বহুল আলোচিত বইয়ের সারমর্মে যা তিনি লিখেছেন, তা হলো, নাইন-ইলেভেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুশ এবং নব্য রক্ষণশীলেরা যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপদ মার্কিনীদের বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাদের সে লক্ষ্যচ্যুতির ফলে বিশ্ব নাইন-ইলেভেনের পূর্বের অবস্থা থেকে আজ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

রিচার্ড ক্লার্ক তাঁর বইয়ের সূচনায় লিখেছেন, 'বুশ প্রশাসন আল-কায়েদাকে ধ্বংস করার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছেন। আমাদের কর্মকান্ডের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পদক্ষেপের কারণে আল-কায়েদা নতুনভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এটি নাইন-ইলেভেনের পূর্বতন মৌলিক প্রতিপক্ষের চেয়ে আরও শক্ত প্রতিপক্ষ এবং আমরা এ হুমকি থেকে আমেরিকাকে নিরাপদ রাখতে যা প্রয়োজনীয় ছিল, তা করছি না।' বইয়ের অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বুশ প্রশাসন এমনভাবে বিচ্যুত হয়েছে যে, সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটেছে বিশ্বব্যাপী। এর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ চলবে এক প্রজন্মেরও বেশি সময় ধরে।' তাঁর মতে, এ যুদ্ধ গড়াবে আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না দু'পক্ষের একপক্ষ পরাভূত হয়।

অনেক সামরিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন বর্তমানে রিচার্ড ক্লার্কের কথাগুলো আরও বৃহত্তর আঙ্গিকে বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। 'বুশ প্রশাসনের একচোখা নীতির কারণে সমগ্র বিশ্ব চার বছর আগের তুলনায় আরও বেশি অস্থির ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তথাকথিত মুসলিম বিশ্বের শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ক্রিয়তা অথবা অতি প্রতিক্রিয়ার কারণে আল-কায়েদা অথবা আল-কায়েদা তত্ত্বে বিশ্বাসী শক্তির জন্ম হয়েছে প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত এবং মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে। কট্টরবাদী ইসলামী গোষ্ঠীগুলো যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বকে দেখছে ক্রুসেডার শক্তি হিসেবে। 'ক্রুসেডার'দের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার আত্মরক্ষামূলক 'জেহাদ'-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে একাধিক তথাকথিত ইসলামী 'জেহাদী' গ্রুপ। আল-কায়েদার মূল লক্ষ্য ক্রুসেডারদের হাত থেকে ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষা করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে সব বাধা অপসারণ করতেই দেয়া হয়েছে 'আত্মরক্ষামূলক জেহাদের' ডাক। এরা আত্মঘাতকে সশস্ত্র বিরোধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে পশ্চিমা বিশ্বে যে ভীতির সঞ্চার করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব দেশের সরকারের অতি প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের জনগণ বিশেষ করে মার্কিনীরা বর্তমানে আরও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।'৩

মধ্যপ্রাচ্যকে নব্যরূপ দিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জ্বালানীর উৎসের অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের রোডম্যাপে যে তিনটি রাষ্ট্র ছিল, তার মধ্যে যথাক্রমে যথাক্রমে ছিল ইরাক, ইরান ও সিরিয়া। লক্ষ্যণীয় যে, তিনটি দেশের প্রথম দুটি ওপেকের প্রধান সদস্য। ইরাক ছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ আর ইরান শুধু জ্বালানী সম্পদেই সমৃদ্ধ নয়; বরং ইরান সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক জ্বালানী সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল, মধ্য এশিয়া ও কাস্পিয়ান অঞ্চলে সহজ নির্গমন ও বহির্গমনের সহজতর পথ। ইরান শুধু ভূ-কৌশলগত কারণেই নয়, সামরিক শক্তির ক্ষেত্রেও মধ্য এশিয়া তথা কাস্পিয়ান অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেশ হিসেবে পরিচিত। ইরান এখনও যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলার তালিকায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাদ্দাম হোসেন শাসিত ইরাকই ছিল বুশ প্রশাসনের প্রথম লক্ষ্য। নাইন-ইলেভেনের ঘটনা হাতে তুলে দিয়েছিল বুশ প্রশাসনের জন্য যুদ্ধের যৌক্তিক কারণ। তবে আল-কায়েদা আর আফগানিস্তানকে প্রথমেই আক্রমণ ছিল পরিকল্পনার বাইরে, যাকে সামরিক ভাষায় বলা হয় অদৃশ্য উপাদান। মার্কিন প্রশাসনের বিপত্তির শুরু সেখান থেকেই। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যে কাবুলে তালেবানদের স্থলে মার্কিনপন্থী কারজাই সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারলেও আল-কায়েদাকে নিশ্চিহ্ন করা এবং তাদের অনুপ্রেরণাদানকারী নেতৃবৃন্দকে নিবৃত্ত করার আগেই বুশ প্রশাসন ও তাদের মিত্র নব্যরক্ষণশীল রাষ্ট্রগুলো আজ দু'বছর যাবত ইরাকে আটকা পড়ে আছে।

নাইন-ইলেভেনের চার বছর পর ওসামা বিন লাদেন এখন আর একা নয়, মার্কিন প্রশাসনের অদূরদর্শিতার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে ইরাকের হাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহু ওসামার জন্ম হয়েছে। এ চার বছরের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে প্রচুর আত্মঘাতী বোমাহামলাকারী, যারা তাদের মতে ইসলাম রক্ষায় আত্মাহুতি দিয়েছে এবং দিতে প্রস্তুত রয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনে হামলাকারী ১১ জন জেহাদীর বিপরীতে এখন আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত রয়েছে কয়েক হাজার গুণ জেহাদী।

বুশ প্রশাসন সূচিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চার বছরের মাথায় এখন পশ্চিমা বিশ্বের লাভ-লোকসানের যে খতিয়ান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে একমাত্র ইসরায়েলের লাভের পাল্লা সবচেয়ে ভারী হয়েছে বলে বহু বিশেষজ্ঞ প্রকাশ্যে মতামত ব্যক্ত করছেন। এদের মতে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রক্সিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসরায়েলকে সুরক্ষিত করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র শুধু তাদের সৈনিক আর রণসম্ভারই হারাচ্ছে না, সেই সাথে হারাচ্ছে নৈতিক মনোবল ও নৈতিকতা।

অপরদিকে বিগত চার বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরও পশ্চিমা সমাজের আদলে আফগান সমাজ পরিবর্তিত হয়নি। ধর্মীয় অনুশাসনের তীব্রতা কমলেও কমেনি পূর্বতন প্রভাব। ইরাকে ধর্মীয় আঁধারের শক্তিগুলো ক্ষমতার সোপানে রয়েছে। পরবর্তী শাসনতন্ত্র রচিত হচ্ছে কট্টরপন্থী শিয়া মুসলমানদের দ্বারা। শাসনতন্ত্রে প্রভাব পড়ছে ইরানের। একসময়ের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ইরাক এখন সাংবিধানিকভাবে ইসলামিক ইরাকে পরিণত হচ্ছে। অথচ এ অভ্যুত্থান ঠেকাতেই আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রশক্তি ইরানের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনকে দাঁড় করিয়েছিল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিভ্রান্তি ইরানের তথাকথিত মোল্লাতন্ত্রের হাতকে আরও শক্তিশালী করেছে।

বর্তমানে গত চার বছরের মার্কিন বিভ্রান্তির খেসারত দিতে হচ্ছে অন্য মুসলিম অথবা মুসলিমপ্রধান দেশগুলোকে। এর প্রভাব থেকে বাংলাদেশও বাদ পড়েনি। বাংলাদেশ আল-কায়েদা তত্ত্বের আওতায় না পড়লেও বিশ্বব্যাপী জেহাদের পরিবেশের সুযোগ নেয়ার প্রয়াসে রয়েছে সমাজবিবর্জিত মুষ্টিমেয় তথাকথিত জঙ্গীগোষ্ঠী। এরা বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধি না হলেও বৃহত্তর সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় সদা নিয়োজিত। মূলত নাইন-ইলেভেনের পর থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিক পরিবর্তনের কারণে বিশ্বে অশান্ত পরিবেশ বিরাজমান। আজ এ সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। যুদ্ধের ব্যয়ভারে বিপর্যস্ত মার্কিন অর্থনীতি ও প্রশাসন ভয়ানকভাবে প্রকম্পিত হয়েছে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে সংঘটিত হারিকেন ক্যাটরিনার আঘাতে। বিধ্বস্ত হয়েছে মিসিসিপি ও লুজিয়ানাসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল। নিহত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। খোদ মার্কিন জনগণের মধ্য থেকে মন্তব্য করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হারিকেনের এ তাণ্ডব ইরাকসহ সারাবিশ্বে মার্কিন প্রশাসনের হত্যা আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি প্রাকৃতিক প্রতিশোধ। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিশনের প্রধান থমাস কিয়ান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে বুশের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ নীতি, ব্যর্থ ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিকভাবে ব্যর্থ চিন্তাভাবনা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।৪ অন্যদিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই শুরুর সময় বুশের সেই 'শয়তানের চক্র' আখ্যা দেওয়া দেশগুলোকেও গত চার বছরে এতটুকু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি হোয়াইট হাউস। উত্তর কোরিয়া তো নিজেই ঘোষণা দিয়ে বসেছে, তার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। ইরান তার পরমাণু কার্যক্রম চালিয়ে যেতে এখনও

Dhaka University Institutional Repository

বদ্ধপরিকর। কাজেই নাইন-ইলেভেনের হামলার পর মার্কিন জনগণকে বুশ কতটুকু নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছেন কিংবা সন্ত্রাস প্রতিরোধে কতটুকু সফল হয়েছেন, তা আজও প্রশ্নবিদ্ধই রয়ে গেছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আত্মঘাতি হামলা তদন্তের জন্য ২৭ নভেম্বর ২০০২ তারিখে গঠিত হয় নাইন-ইলেভেন কমিশন। প্রতিষ্ঠা করা হয় ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। পাস করা হয় প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট-এর মতো বিতর্কিত আইন।

৯/১১ কমিশন রিপোর্ট ঃ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনায় পুরো আমেরিকা ছিল অপ্রস্তুত। কেমন করে এ ঘটনা ঘটল, এর জন্য দায়ী কে ইত্যাদি বিষয় উদ্‌ঘাটনের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের অনুমতিক্রমে ২৭ নভেম্বর ২০০২-এ এ কমিশন গঠন করেন। কমিশন প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে জুলাই ২০০৪-এ তাদের রিপোর্ট পেশ করে। তদন্তকালে কমিশন দশটি দেশের ১২০০ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং প্রায় ২৫ লাখ পৃষ্ঠার বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা করে। অতঃপর কমিশন তাদের রিপোর্টে সমস্ত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মার্কিন সরকারের করণীয় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ করে। ৫৬৬ পৃষ্ঠার রিপোর্টটি প্রকাশের পর কমিশনের প্রধান কর্মকর্তা টমাস কিন (Thomas Kean) বলেন, ক্লিনটন ও বুশ উভয় প্রেসিডেন্টকেই এফবিআই ও সিআএ সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইনটেলিজেন্স ব্যর্থতা ছাড়াও কমিশন আরও যে সমস্ত বিষয় শনাক্ত করেছে, তা হলো-

এক. হাইজ্যাকাররা কিভাবে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অতিক্রম করেছে, তার ফুটেজ।

দুই. বিমানের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার যেখানে হাইজ্যাকার ও বিমান স্টাফের কথোপকথন রেকর্ড করা আছে।

তিন. বিমানের যাত্রীরা শেষ মুহূর্তে তাদের সেলফোনে স্বজনদের সাথে যে কথা বলেছে, তার বর্ণনা।

প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট ঃ নাইন-ইলেভেনের হামলার পর মার্কিন কংগ্রেস প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট নামে একটি বিতর্কিত নতুন আইন পাস করে, যার মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সন্ত্রাস দমনে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই আইনে শুধু সন্ত্রাস নয়, এর সাথে জড়িত থাকতে পারে এমন সব বিষয়েও তদন্তের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে। এই আইনের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করা হয়েছে ইমিগ্রেশন আইন, ব্যাংকিং ও অর্থ পাচার বা মানি লন্ডারিং আইন এবং বৈদেশিক গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ আইন। আইনটিকে অন্যান্য বিদ্যমান আইনের সাথে সংযুক্ত করার বিধানও রাখা হয়েছে। সিনেটে ৯৮-১ ভোটে এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ ৩৫৭-৬৬ ভোটে বিলটি পাশ হয়। ২৬ অক্টোবর ২০০১-এ প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ-এর স্বাক্ষরে বিলটি আইনে পরিণত হয়। পাশ হওয়ার পর বিলটি ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সমালোচকরা বলেন, এই বিলের মাধ্যমে বাক স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় বৈদেশিক গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট অনুসারে গোপন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে গ্রেফতারের সুযোগ রাখা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিদ্যমান আইনের বাইরে বিশেষ ক্ষমতায় যে কোন স্থানে তল্লাশির অধিকার দেয়া হয়েছে। এফবিআই ডিরেক্টরকে গোপনে যে কোন ব্যক্তির টেলিফোন রেকর্ডের আদেশের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বিপজ্জনক অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে, তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তদন্তের স্বার্থে গোপন রাখতে পারে, এমনকি আদালতের কাছেও গোপন রাখার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সন্দেহজনক নন-সিটিজেন যে কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছাড়াই দেশ থেকে বের করে দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ২০০৫ সালের মার্চ মাসে মাত্র ১৬ বছর বয়সের এক বাংলাদেশী মেয়েকে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী সন্দেহে এফবিআই কর্তৃক গ্রেফতার এবং পরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার ঘটনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কখনও প্রকাশ করা হয়নি। এফবিআই আদালতে বলেছে, তাদের কাছে প্রমাণ আছে। তবে প্যাট্রিয়ট আইনের আওতায় তা তারা আদালতে প্রকাশ করেনি। এই আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত ধারাটি হলো, কোন নাগরিক লাইব্রেরি থেকে কি বই নিচ্ছে, এফবিআই-এর তা দেখার অধিকার থাকবে। আইনের এ ধারাটির বিরুদ্ধে আমেরিকান লাইব্রেরিয়ান

Dhaka University Institutional Repository

এসোসিয়েশন এখনও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু লাইব্রেরি নয়, যে কোন ব্যক্তির অজান্তে এফবিআইকে তার আর্থিক রেকর্ড, মেডিক্যাল রেকর্ড দেখার অধিকার দেয়া হয়েছে। ২০০২-২০০৩ সালে এই আইনের আওতায় কত লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস তা প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করেছে। ২০০৪ সালে সাবেক এটর্নি জেনারেল এক রিপোর্টে এ সংখ্যা ৩৬৮ বলে উল্লেখ করেছিলেন।৫

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ঃ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনার পর এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ২৫ নভেম্বর ২০০২-এ আমেরিকার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী সব সরকারী সংস্থাগুলোকে আরও দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি গঠন করে একটি সংস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এভাবে মোট ২২টি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি সংস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়, যার মধ্যে আছে ইমিগ্রেশন, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, কোস্ট গার্ড ও ইউএস সিকিউরিটি সার্ভিস। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির আওতায় আছে এক লাখ তিরাশি হাজার কর্মচারী।৬

৬.২ ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযান ঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ওই বছরই আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে ধরার লক্ষ্যে আফগানিস্তানে পরিচালিত হয় ব্যাপক সামরিক অভিযান। আকাশ ও স্থলপথে পরিচালিত উক্ত সর্বাত্মক অভিযানের পরিণতিতে আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। তার পরিবর্তে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার। এরপর ২০ মার্চ ২০০৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরেকটি সামরিক অভিযান চালানো হয় ইরাকে। বিবিসি ওয়ার্ল্ড টিভি সূত্র মতে, 'অপারেশন ইরাকী ফ্রিডম' নামের এই অভিযানে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত নিহত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা হয়েছে ১,৮৯১। নিহত ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা ৯৫। আহত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা প্রকাশিত না হলেও ধারণা করা হচ্ছে তা দশ হাজারেরও বেশি। আর এই যুদ্ধে হতাহত ইরাকিদের সংখ্যা যে কত তা কেউ বলতে পারে না। আফগানিস্তান ও ইরাকে পরিচালিত এই মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভের পাশাপাশি খোদ আমেরিকাতেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার পুরোভাগে রয়েছেন জনৈক নিহত মার্কিন সৈন্যের মা সিনডি শিহান। এমনকি সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলও এক পর্যায়ে ইরাক অভিযান বিষয়ে তার অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এ জাতিসংঘে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি তথ্য দিয়েছিলেন যে, ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র বা ডাবলিউএমডি (Weapons for Mass Destruction) আছে। তার ওই ভাষণের পরে অনেকেই ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। অথচ সেই তথ্য ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সম্প্রতি কলিন পাওয়েল সেই মিথ্যা তথ্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমিই সেই ব্যক্তি যে বিশ্বকে এই তথ্যটি দিয়েছিলাম এবং এটা চিরকালই আমার ব্যক্তিগত রেকর্ডের একটি অংশ হয়ে থাকবে। এটা ছিল বেদনাদায়ক। এটা এখনও বেদনাদায়ক।' (I am the one who presented it to the world, and (it) will always be a part of my record. It was painful. It is painful now).৭

৬.৩ লন্ডনে জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাইন-ইলেভেনের ঘটনার চার বছরের মাথায় জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয় ইংল্যান্ডে। ৭ জুলাই ২০০৫-এ 'লন্ডনের গৌরব' হিসেবে পরিচিত পাতালরেল এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ও লন্ডনের প্রতীক ডাবলডেকার বাসে চালানো হয় বোমা হামলা। পর পর পরিচালিত এসব হামলায় ন্যূনপক্ষে নিহত হয় ৫৮ জন। আহত হয় প্রায় হাজার খানেক মানুষ। ২০১২ সালে অলিম্পিকের হোস্ট সিটি হিসেবে মনোনীত হওয়ার উদ্বেল আনন্দে যখন এই নগরীর অধিবাসীরা মাতোয়ারা, তখনই চালানো হয় এ হামলা। উক্ত হামলার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় নিশ্ছিদ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যেও ঠিক দুই সপ্তাহের মাথায় ২১ জুলাই খোদ লন্ডনেই এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ও ডাবলডেকার বাসে আবার চালানো হয় প্রায় একই ধরনের হামলা। পরবর্তীতে ইউরোপের আল-কায়েদা গ্রুপ *'জিহাদ ইন ইউরোপ'* লন্ডনে ৭ জুলাইয়ের বোমা হামলার কৃতিত্ব দাবি করে। গ্রুপটি জানায়, 'ইরাক ও আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সৈন্যরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তারই জবাবে এ হামলা চালানো হচ্ছে। আমরা বারবার ব্রিটেনের সরকার ও জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এখন

Dhaka University Institutional Repository

আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছি। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পবিত্র সামরিক হামলা চালিয়েছি।' গ্রুপের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমরা ডেনমার্ক, ইতালিসহ ক্রুসেডার সব দেশের সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তারা যদি ইরাক এবং আফগানিস্তান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার না করে তাহলে তাদেরও এই ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে।' এছাড়া *আবু হাফস আল মাসরি বৃগেড* নামের আরেকটি সংগঠনও নিজেদের আল-কায়েদার সহযোগী পরিচয় দিয়ে লন্ডনে হামলার দায়দায়িত্ব দাবী করেছে। *'জিহাদ ইন ইউরোপ'*-এর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে তারা ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে চরমপত্র দিয়েছে। তারা বলেছে, 'এ বার্তাই ইউরোপের দেশগুলোর প্রতি চূড়ান্ত হুশিয়ারি। ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আমরা তোমাদেরকে এক মাসের সময় দিচ্ছি। ১৫ আগস্টের পর আর কোন বার্তা দেয়া হবে না। মুজাহিদরা তোমাদের উপর নজর রাখছে। তোমাদের রাজধানীতে তারা অন্য ভাষায় জবাব দেবে।'

লন্ডন আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রিটেনের 'কাউন্টারপাঞ্চ' পত্রিকায় লেখা হয়, 'আমরা ইরাকের ফালুজা, নাজাফ আর জেনিনের সাধারণ মানুষের যে রক্ত ঝরিয়েছি, তার দাম এবার দিতে হচ্ছে। সব সন্ত্রাসের উৎস এক। লন্ডনবাসীরা জানতো আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইরাক অভিযানে অংশ নিয়ে টনি ব্লেয়ার তাদের শহরটিকে ফায়ারিং লাইনে ঠেলে দিয়েছেন।' ইরাক হামলার বিরোধিতার জন্য ব্রিটেনের লেবার পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন এমপি জর্জ গ্যালোওয়ে। গত নির্বাচনে পূর্ব লন্ডন থেকে এমপি নির্বাচিত হন তিনি। লন্ডনে বোমা হামলার পর তিনি বলেন, 'ইরাক ও আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সৈন্য পাঠানোর রক্তাক্ত মাশুল দিতে হলো আমাদের। লন্ডনের স্বচ্ছ নীল আকাশ নয়, এই হামলার পটভূমিতে ছিল আফগানিস্তান ও ইরাকে জবরদখলের চিত্র, আবু গারিব কারাগারে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যদের পাশবিক নির্যাতনের চিত্র এবং গুয়ানতানামোর কয়েদখানায় বিনা বিচারে আটক বন্দীদের চিত্র।'৮

৬.৪ মিসরে জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলা ঃ লন্ডনে দ্বিতীয় দফা বোমা হামলার একদিন পরই আক্রান্ত হয় মিসরের পর্যটন শহর শার্ম আল শেখ। ১৫ মিনিটের ব্যবধানে চালানো তিনটি বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হয় একটি মার্কেট, একটি পার্কিং এরিয়া এবং বিখ্যাত গাজালা গার্ডেন হোটেল। প্রাথমিক হিসেবে নিহতের সংখ্যা নয়জন বিদেশী পর্যটকসহ কমপক্ষে ৯০ জন। মিসরের এই বোমা হামলার দায়িত্ব দাবি করেছে দুটি সংগঠন। মিসর ও সিরিয়া ভিত্তিক আল-কায়েদা গ্রুপ *'আবদুল্লাহ্ আজম বৃগেডস'* একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে দাবি করে বলেছে, তাদের জিহাদী সদস্যরা গাজালা গার্ডেনস হোটেল ও পুরানো মার্কেট এলাকায় হামলা চালিয়েছে। 'ক্রুসেডার ইহুদি ও বিশ্বাসঘাতক মিসরীয় প্রশাসনের উপর এই হামলার পর আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই ইরাক, আফগানিস্তান ও চেচনিয়ার মুসলমানদের রক্তের বদলা নিতে এই হামলা চালানো হয়েছে।' *'মুজাহিদি মিশর'* নামের আরেক সংগঠন বলেছে, সাতটি বিস্ফোরণে তাদের পাঁচ সদস্য শহীদ হয়েছে।

৬.৫ বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদ ঃ বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সামরিক উত্তেজনার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রে। ২০০২ সালের ১২ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন শহর বালিতে সহিংস বোমা হামলায় ২০০ লোক নিহত হয়েছে।৯ ২০০৫ সালের ২৯ অক্টোবর ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সিরিজ বোমা হামলায় অন্ততপক্ষে ৬৫ জন নিহত এবং প্রায় ২০০ জন আহত হয়েছে।১০ কিন্তু বাংলাদেশে সহিংস সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের ক্রমউত্থান, যার ব্যাপকতায় আন্তর্জাতিক বিশ্বের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বাংলাদেশের উপর। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে উচ্চারিত হয়েছে উদ্বেগ ও সতর্কবাণী। ২০০৫ সালের প্রারম্ভে আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী দৈনিক 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গী তৎপরতার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশ এখন ইসলামী জিহাদীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। এখানে তারা খুব সহজেই চলাফেরা করতে, সংঘটিত হতে বা ট্রেনিং নিতে পারে।' প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ার প্রসঙ্গও তোলা হয়েছে এবং যোগসূত্র তৈরির মতো করে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসাগুলো তালেবান তৈরির কাজ করছে। সেই সূত্রে ওই প্রতিবেদনে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে পরবর্তী তালেবান অভ্যুদয় হতে পারে বাংলাদেশেই। 'এ টু জেড অফ জেহাদী অর্গানাইজেশনস ইন পাকিস্তান (মশাল বুকস, ২০০৪) গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ আমির রানা উল্লেখ করেছেন, 'বাংলাভাই এবং তার লালিত বাহিনী *জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)* উত্তরোত্তর হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অফ ডিফেন্স এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এ ভিজিটিং রিসার্চ অ্যানালিস্ট হিসেবে অবস্থানরত মি. রানা 'দি স্ট্রেইটস টাইমস' পত্রিকাকে বলেছেন, 'জেএমজেবি নামের অর্থ হলো বাংলাদেশী মুসলিম জাগরণ আন্দোলন। সুদূরপ্রসারী জেহাদী গ্রুপগুলোর সঙ্গে এটির যোগাযোগ আছে। যেমন, হরকাতুল জেহাদ-ই-ইসলামী-র বাংলাদেশী শাখা।'১১ পরবর্তীতে ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫-এ বাংলাদেশে দুটি ইসলামী জঙ্গী সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয় যারা জিহাদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় এবং সেসব সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদনের আংশিক যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে।১২ ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে বগুড়ার পুলিশ গ্রেফতার করে 'জামায়াতুল মুজাহিদীন' নামক ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের সদস্য শফিকুল্লাহকে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে সে জানায়, তারা তালেবান স্টাইলে বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে চায়। শফিকুল্লাহ জানায়, এ জন্য দেশব্যাপী বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে তারা এবং জঙ্গীদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। সে আরও জানায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক ডঃ আসাদুল্লাহ্ আল গালিব এ অঞ্চলে তাদের প্রধান নেতা। জামা'আতুল মুজাহিদীন হচ্ছে রাজশাহীতে সশস্ত্র অপারেশনরত 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)'-এর মূল সংগঠন। শফিকুল্লাহ তার জবানবন্দিতে বেশ কয়েকটি সহিংস ঘটনায় তাদের জড়িত থাকার কথা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার কথাও জানায়। তার জবানবন্দির সূত্র ধরে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে গ্রেফতার করা হয় জামা'আতুল মুজাহিদীন নেতা ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিবসহ ২১ জন জঙ্গীকে যাদের প্রকাশ্য পরিচয় ছিল 'আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতা হিসেবে। ডঃ গালিব ছিলেন ওই সংগঠনের আমির। একই তারিখে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে উগ্র ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী তৎপরতার সাথে জড়িত 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ'-কে। এ প্রসঙ্গে সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, 'সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় বোমা হামলা এবং বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এসব দলের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া ওই সব ঘটনায় আটক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে জানা যায়, এরা সবাই জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ ও জামা'আতুল মুজাহিদীনের সক্রিয় সদস্য।' প্রেসনোটে আরও বলা হয়, 'এই সংগঠন দুটি দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে শান্তিপ্রিয় জনগণের জীবন ও সম্পদহানি করে আসছে। তাছাড়া ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে তরুণদের বিপথগামী করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে।'১৩ পরবর্তীতে ১৭ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে আরও একটি ইসলামী জঙ্গী সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রথম সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গী ধরা পড়ে ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। সে সময় কক্সবাজারের অরণ্যে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী' নামক জঙ্গী সংগঠনের ৪১ জন কর্মীকে অস্ত্র, গ্রেনেড ও সামরিক পোশাকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে ২০০০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের ৪৩৫ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দুর্বল মামলা ও সুষ্ঠু তদন্তের অভাবে তাদের অধিকাংশই আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। পরবর্তীতে দেশজুড়ে তাদের জঙ্গী তৎপরতা ও সহিংস বোমা হামলা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচীর বোমা হামলা থেকে শুরু করে ২০০৫ সালের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৩টি বড় ধরনের বোমা বা গ্রেনেড হামলায় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীসহ ১৮১ জন নিহত ও ১,৩৯৯ জন আহত হয়। নিম্নে মার্চ ১৯৯৯ থেকে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বোমা হামলাগুলোর বিবরণ দেয়া হলো ঃ

403530

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ছক-১৪

মার্চ ১৯৯৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত বোমা হামলার বিবরণ

৬ মার্চ ১৯৯৯	
উদীচীর অনুষ্ঠান, যশোর	নিহত ১০
৮ অক্টোবর ১৯৯৯	
আহমদিয়া মসজিদ, খুলনা	নিহত ৮
২০ জানুয়ারি ২০০১	
কমিউনিস্ট পার্টির র‍্যালি, ঢাকা	নিহত ৭
১৪ এপ্রিল ২০০১	
নববর্ষ বরণ ছায়ানট অনুষ্ঠান, ঢাকা	নিহত ১০
৩ জুন ২০০১	
বানিয়ারচর চার্চ, গোপালগঞ্জ	নিহত ১০
১৫ জুন ২০০১	
আওয়ামী লীগ অফিস, নারায়ণগঞ্জ	নিহত ২২
২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১	
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী সভা, বাগেরহাট	নিহত ৮
৬ ডিসেম্বর ২০০২	
চারটি সিনেমা হল, ময়মনসিংহ	নিহত ২১
১৭ জানুয়ারি ২০০৩	
ফাইলা পীর দরগা, টাঙ্গাইল	নিহত ৭
১২ জানুয়ারি ২০০৪	
শাহজালাল (রঃ) দরগা, সিলেট	নিহত ৫
২১ মে ২০০৪	
শাহজালাল (রঃ) দরগা, সিলেট	নিহত ৩
৫ আগস্ট ২০০৪	
২টি সিনেমা হল, সিলেট	নিহত ১
৭ আগস্ট ২০০৪	
আওয়ামী লীগ সভা, সিলেট	নিহত ১
২১ আগস্ট ২০০৪	
আওয়ামী লীগ সভা, ঢাকা	নিহত ২২
০২ জানুয়ারি ২০০৫	
যাত্রা অনুষ্ঠান, বাগমারা, রাজশাহী	আহত ৫০
১১ জানুয়ারি ২০০৫	
যাত্রা মঞ্চ, জামালপুর	আহত ২০
১৫ জানুয়ারি ২০০৫	
যাত্রা অনুষ্ঠান, বগুড়া ও নাটোর	নিহত ২
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা দিবসের অনুষ্ঠান, টিএসসি, ঢাঃবিঃ	আহত ৫০
২৭ জানুয়ারি ২০০৫	
আওয়ামী লীগ সভা, হবিগঞ্জ	নিহত ৫
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	
ব্র্যাক অফিস, নওগা, গ্রামীণ ব্যাংক উল্লাপাড়া	আহত ৩
২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	
আওয়ার মেলা, মৌলভীবাজার	আহত ৩
১৭ আগস্ট ২০০৫	
মুন্সীগঞ্জ বাদে বাংলাদেশের ৬৩ জেলায়	
একযোগে (হাইকোর্ট, জজকোর্ট, প্রেসক্লাব,	
বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়)	নিহত ২
২০ আগস্ট ২০০৫	
মাজার, নরসিংদী	আহত ১
০২ অক্টোবর ২০০৫	
সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব	নিহত ২
০৩ অক্টোবর ২০০৫	
চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুরের জজকোর্ট	নিহত ২, আহত ৫০
০৫ অক্টোবর ২০০৫	
সাতক্ষীরা বাজার	গ্রামপুলিশসহ আহত ৩
০৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫	
বিএনপি অফিস, যশোর	আহত ২০

(সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৫) ১৪

উপরের বোমা হামলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী হামলাটি ঘটে ২১ আগস্ট ২০০৪ তারিখে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসমাবেশে। এটি ছিল গ্রেনেড হামলা। দলের নেত্রী শেখ হাসিনা যে ট্রাকটিতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তার খুব কাছেই ঘটে অনেকগুলো গ্রেনেডের বিস্ফোরণ। শেখ হাসিনা অক্ষত থাকলেও নিহত হন আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২০ জন এবং আহত হন দলের একাধিক শীর্ষনেতাসহ তিনশ-এরও বেশি মানুষ। আরেকটি ভয়াবহ ও লজ্জাজনক বোমা হামলার শিকার হন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। নিজ জন্মস্থান সিলেটে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে গত ২১ মে ২০০৪ তারিখে সংঘটিত গ্রেনেড বিস্ফোরণে রক্তদূত আনোয়ার চৌধুরী আহত হন। ওই ঘটনায় নিহত হন পাঁচজন। আহত হন শতাধিক মানুষ। গত ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যারাতে হবিগঞ্জ জেলার বৈদ্যেরবাজারে একটি দলীয় অনুষ্ঠানশেষে বেরিয়ে আসার সময় আচমকা গ্রেনেড হামলায় নিহত হন আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়াসহ পাঁচজন। আহত হন শতাধিক মানুষ। এছাড়া ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বইমেলা থেকে ফেরার পথে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও প্রথাবিরোধী সাহিত্যিক ডঃ হুমায়ুন আজাদ। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের আগস্টে জার্মানির মিউনিখে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে রাজধানীসহ দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে পরিচালিত পাঁচ শতাধিক বোমার বিস্ফোরণটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ও কল্পনাতীত ঘটনা (এক নজরে সারাদেশে ১৭ আগস্টের বোমা হামলার মানচিত্র ঃ পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)। সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে হামলাগুলো পরিচালনা করা হয়। হামলার লক্ষ্যস্থল ছিল সচিবালয়, প্রেসক্লাব, বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পৌরসভা, স্টেশন,

Dhaka University Institutional Repository

হাইকোর্ট ও জজকোর্ট। তাৎক্ষণিকভাবে কোন বোমাবাহককেই ধরা সম্ভব হয়নি। যে সকল স্থানে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়, তার সবখানেই বাংলা ও আরবীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত গুপ্ত ইসলামী সংগঠন 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (সংক্ষেপে জেএমবি)'-এর পক্ষ থেকে দুই রকমের ছাপানো লিফলেট পাওয়া যায়। উক্ত লিফলেটে বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম করার জন্য বাংলাদেশের জনগণ, সরকার, জাতীয় সংসদের সরকারী ও বিরোধী দল, সরকারী আমলা, বিচারক এবং বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।১৫

৬.৬ বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক আত্মঘাতী জঙ্গী স্কোয়াড ঃ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ধর্মভিত্তিক আত্মঘাতী জঙ্গী স্কোয়াডের উত্থান ঘটে ১৪ নভেম্বর ২০০৫ তারিখে। ওইদিন নিষিদ্ধ ঘোষিত 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ'-এর আত্মঘাতী স্কোয়াড ঝালকাঠিতে অফিসার্স কোয়ার্টারে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করে সহকারী জজ সোহেল আহম্মেদ চৌধুরী ও জগন্নাথ পাড়ে-কে। এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা। একই মাসের ২৯ তারিখে ওই আত্মঘাতী স্কোয়াড চট্টগ্রাম ও গাজীপুরের আদালত চত্বরে বোমা হামলা চালায়। এতে আইনজীবী ও পুলিশসহ ১০ জন নিহত হয় ও আহত হয় দুই শতাধিক। এর মাত্র দুই দিন পর ডিসেম্বরের ১ তারিখে গাজীপুরে আবারও আত্মঘাতী বোমা হামলায় সরকারী কৃষি কর্মকর্তা আবুল কাশেম সরকার (৪৫) নিহত হন। সাংবাদিক, আইনজীবী ও পুলিশসহ আহত ৩৫ জন।১৬ চা-সিগারেট বিক্রেতার ছদ্মবেশে চালানো এই হামলায় ফ্লাস্ক বোমা ব্যবহৃত হয়। মাত্র সপ্তাহ খানেকের ব্যবধানে ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোণা শহরের উদীচী অফিস সংলগ্ন সড়কে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আটজন নিহত হন।

৬.৭ বাংলাদেশের নিষিদ্ধ ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনসমূহ ঃ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৪টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনকে রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

ছক-১৫

বাংলাদেশের নিষিদ্ধ ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠন

ক্রমিক নং	নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের নাম	নিষিদ্ধ ঘোষণার তারিখ
১	শাহাদাত-ই-আল হিকমা	১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৩
২	জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
৩	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ	২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
৪	হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী	১৭ অক্টোবর ২০০৫

সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০৫১৭

জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) ঃ অনুসন্ধানে জানা যায়, ১ এপ্রিল ২০০৪-এ 'মুসলিম রক্ষা মুজাহিদীন ঐক্য পরিষদ'-এর ব্যানারে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ', সংক্ষেপে *জেএমজেবি-র* আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদের কর্মক্ষেত্র হয় রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর জেলাসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকা। তারা প্রথমে বাগমারা এলাকার পলাশী গ্রামে বাবু (৩০) নামের এক যুবককে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার অভিযোগে প্রকাশ্যে জবাই করে। বাংলাভাইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'চরমপন্থী নির্মূলের দায়িত্ব আমি নিজেই নিয়েছি, প্রশাসন আমাকে সহায়তা করছে। আমাদের কাজ চলবে কেয়ামত পর্যন্ত। লক্ষ্য চরমপন্থী নিধন, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অস্ত্র উদ্ধার, রাসুলের (সাঃ) আদর্শ কায়েম।'১৮ এভাবে তারা এলাকায় নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রয়োগে তৎপর হয় এবং নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়। জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তারা ৯ এপ্রিল ২০০৪-এ রাজশাহীর বাগমারায় হামিরকুৎসা বাজারে সর্বহারা বিরোধী সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গীদের প্রথম প্রকাশ্য বড় সমাবেশ ঘটায়। অতঃপর ১ এপ্রিল ২০০৪ থেকে ১৫ মে ২০০৪-এই দেড়মাসে জেএমজেবি-র সন্ত্রাসী তৎপরতা

Dhaka University Institutional Repository

দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবেদ আলী ও আবদুস সোবহানকে অপহরণসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে নির্যাতন করে এই বাহিনী। ইসলামী জঙ্গীদের গ্রেফতারের দাবীতে ২৩ এপ্রিল ২০০৪-এ রাজশাহীতে আওয়ামী লীগসহ চার দল ডিসি অফিস ঘেরাও করে। এর দুই দিন পরে বাগমারার তাহেরপুর বাজারে বৈশাখী গানের অনুষ্ঠানে ইসলামী জঙ্গীদের হামলায় এক শিশুর মৃত্যু হয় এবং কুদ্দুস বয়াতীসহ আহত হন ৪০ জন। এ বিষয়ে রাজশাহী পুলিশ সুপারের অফিসে বাংলাভাইয়ের একটি মিটিং হয়। জেএমজেবি-র সন্ত্রাসী তৎপরতা আরও বেশি ব্যাপক হয়ে উঠলে ১৬ মে ২০০৪-এ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে কমিটির চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাংবাদিকদের জানান, বাংলাভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকে বাংলাভাই হয়ে যান ফেরারি।১৯ অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, সর্বহারা দমনের নামে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এলেও বাংলাভাই এবং তার জঙ্গী সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)-র তৎপরতা কেবল সর্বহারা দমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সর্বহারা দমনের নামে নিজের জায়গা করে নেয়া জেএমজেবির নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়ে দেশের ৫০টি জেলায়। কেবল গত ছয় বছরে তারা ১৭টি জেলায় গড়ে তুলেছে দশ হাজার প্রশিক্ষিত সশস্ত্র কর্মী। সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই এই সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম মজলিশে শুরার সদস্য এবং অপারেশন কমান্ডার। শায়খ আবদুর রহমান তার আধ্যাত্মিক নেতা। শায়খ আবদুর রহমান ২০০৪ সালের ৯ মে আত্মপ্রকাশ করেন। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ হচ্ছে জেএমজেবি-র আমন্ত্রেলা সংগঠন। বাংলাভাই প্রথমে ছিলেন এই জামা'আতুল মুজাহিদীনের জঙ্গী ক্যাডার।

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ ঃ ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' দেশব্যাপী গড়ে তুলেছে সুসংগঠিত জঙ্গী নেটওয়ার্ক। উত্তরাঞ্চলের সবগুলো জেলাসহ দেশের প্রায় ৩৬টি জেলায় এ সংগঠনের রয়েছে শক্তিশালী অবস্থান। প্রশিক্ষিত জঙ্গী সদস্যরা এখন 'জিহাদের' বড় প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শায়খ আবদুর রহমানের নেতৃত্বে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)' নামক জঙ্গী ১৯৯৮ সালে গঠিত হলেও তাদের মূল কর্মকান্ড শুরু হয় ১৯৯২ সাল থেকে। শায়খ আবদুর রহমান, যিনি জামালপুর সদর উপজেলার চরশী গ্রামের আহলে হাদিস আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ফজলের পুত্র, সৌদি আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তী সময়ে আশির দশকের আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধকালে পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের মাধ্যমে ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব ও শায়খ আবদুর রহমান সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সংগঠনের নাম জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বলে আহলে হাদিস সূত্রে জানা যায়। জামা'আতুল মুজাহিদীন ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সদস্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে বেছে নেয় উত্তরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাকে। এ লক্ষ্যে তারা ওই অঞ্চলে প্রচুর মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলে। জামা'আতুল মুজাহিদীন প্রথম দিকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ডঃ গালিবের নেতৃত্বাধীন আহলে হাদিস যুবসংঘের কর্ম এলাকায় সাংগঠনিক কাজ শুরু করে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ১৯৯৮ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় জামা'আতুল মুজাহিদীন কাজ শুরু করে। এখানকার কুয়েতি এনজিও 'রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি'র সাহায্যে পরিচালিত শিমুলতলী মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জঙ্গী সদস্য সংগ্রহ অভিযান। তখন সাঘাটার বিভিন্ন গ্রামে কুয়েতী মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। পরে এই সাঘাটা থেকে ২০০০ সালের দিকে জামা'আতুল মুজাহিদীন জামালপুর জেলার দুর্গম চরাঞ্চল ইসলামপুরের ঢেঙ্গারগড়, মাদারগঞ্জের বালিজুড়ি, সরিষাবাড়ির সেঙ্গুয়া বিলাবালিয়া, জামালপুর সদরের তিতপল্লী, মেষ্টা, ঘোড়াধাপ, বগুড়ার গাবতলী, সারিয়াকান্দি, কাহালু, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, চিরিরবন্দরসহ নাটোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, নীলফামারী ও জয়পুরহাটের বিভিন্ন এলাকায় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। এরপর খুব দ্রুত উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলা ছাড়াও দেশব্যাপী এ জঙ্গী সংগঠন মসজিদ-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক তৎপরতা

Dhaka University Institutional Repository

ও জঙ্গী প্রশিক্ষণ শুরু করে। এসব অঞ্চলে তারা গড়ে তোলে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোকে তাদের মতাদর্শ প্রচার, সদস্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নিয়ে বিরোধী শক্তির বিনাশ ও চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য টার্গেট করা হয় রাজধানীকে। এ লক্ষ্যে রাজধানীর শ্যামলী, যাত্রাবাড়ী, কুটনৈতিক পাড়ার সন্নিকটে বাড্ডা, উত্তরা ও গাজীপুর এলাকায় বাসা/মেস ভাড়া নিয়ে এবং মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। এ জন্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও অর্থ সংগ্রহের কাজে তৎপর রয়েছে বিভিন্ন এনজিও।

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ঃ হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী মূলত আফগান জিহাদী সমর্থকদের গড়া পাকিস্তানভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠন। এ সংগঠনের মূল নেতা এবং আফগান মুজাহিদদের অন্যতম কমান্ডার পাকিস্তানি নাগরিক সাইফুল্লাহ আখার। আশির দশকে এ সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। তার মধ্যে ২৪ বাংলাদেশী আফগান রণাঙ্গনে নিহত এবং অনেকে আহত হন। ১৯৮৮ সাল থেকে যশোরের মণিরামপুরের মুফতি আবদুর রহমান ফারুকীর নেতৃত্বে এ দেশে হরকাতুল জিহাদের সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়। ১৯৮৯ সালের ১১ মে মুফতি ফারুকী আফগানিস্তানের খোস্তে মাইন বিস্ফোরণে নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশে হরকাতুলের আমির নিযুক্ত হন ভৈরবের মুফতি শফিকুর রহমান। তবে দেশে হরকাতুল জিহাদ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।২০ প্রথম থেকে কওমি মাদ্রাসা থেকে সদস্য সংগ্রহ করে আফগান যুদ্ধে পাঠানোই ছিল তাদের মূল কাজ। তারা প্রথমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যের নামে উগ্রপন্থীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে সময় কক্সবাজার ও বান্দরবানের গহিন অরণ্যে রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে হরকাতুল জিহাদের সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসা থেকে সদস্য সংগ্রহ করে জঙ্গীদের এ অঞ্চলে প্রশিক্ষণের জন্য আনা হতো। ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের উখিয়ায় এ ধরনের সশস্ত্র প্রশিক্ষণকালে তাদের ৪১ জন জঙ্গী সদস্য সামরিক অস্ত্র-সরঞ্জামসহ গ্রেপ্তার হয়। বাংলাদেশে হরকাতুল জিহাদ প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৯৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের সময়। তখন ক্লিনটনের সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিলের কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, হরকাতুল জিহাদ তার উপর হামলা করতে পারে মর্মে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ আশংকা প্রকাশ করেছে। এরপর ২০০০ সালের জুলাই মাসে কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের কাছে ও হেলিপ্যাডে বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায় হরকাতুল জিহাদ ও তার নেতা মুফতি হান্নান আলোচনায় আসেন। মুফতি হান্নান ২০০৫ সালের অক্টোবরে র‍্যাবের হাতে ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মুফতি হান্নান বর্তমানে হরকাতুল জিহাদের একাংশের আমির। অপর অংশের আমির মুফতি আবদুল হাই। ২০০২ সালের ২১ মে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশের হরকাতুল জিহাদকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করে। সর্বশেষ ২০০৫ সালের অক্টোবরে যুক্তরাজ্য সরকারও এটিকে কালো তালিকাভুক্ত করে। গত ১৭ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশেও 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এতৎসংক্রান্ত প্রেসনোটে বলা হয়, 'বাংলাদেশ সরকার তার সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর অবস্থান বরাবরই ব্যক্ত করেছে। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ইতিমধ্যে কতিপয় সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী একটি আত্মস্বীকৃত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এর কর্মকান্ড অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সংগঠনটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীকে সংগঠনটির সকল কার্যক্রমসহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে।'২১

শাহাদাত-ই-আল হিকমা ঃ বাংলাদেশে এই সংগঠনের জন্ম হয় আশির দশকে। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইরানে সংঘটিত ইসলামী বিপ্লব এবং আফগানিস্তানে দখলদার সোভিয়েতবিরোধী ইসলামী জঙ্গী প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় উক্ত সংগঠনটি সিলেটসহ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় বিস্তার লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশজুড়ে অব্যাহত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে ২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী সরকার কর্তৃক সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।২২

৬.৮ বাংলাদেশের গোপন ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনসমূহ ঃ উপরের নিষিদ্ধ ঘোষিত ৪টি সংগঠন ছাড়াও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূত্র থেকে বাংলাদেশে কর্মরত আরও ৪৫টি গোপন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।২৩ এই সংগঠনগুলো হচ্ছে :

১. হিজবুত তাওহিদ
২. ওয়ার্ল্ড ইসলামী ফ্রন্ট ফর জিহাদ
৩. তওহিদী জনতা
৪. ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট
৫. রোহিঙ্গা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি
৬. রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট
৭. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন
৮. রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট
৯. জামায়াতে-ই-ইয়াহিয়া আল তুরাত
১০. আল মারাকাজুল আল ইসলামী
১১. বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট
১২. আল জিহাদ বাংলাদেশ
১৩. জামায়াতে-উল-মুজাহিদুল
১৪. আল-খিদমাৎ
১৫. হিজবুল মাহদী
১৬. আল-কায়দা
১৭. আরাকানস পিপলস আর্মি
১৮. রোহিঙ্গা ইনডিপেনডেন্ট রেফার্স
১৯. আল হারাত আল ইসলামিয়া
২০. জুম্মাতুল আল সাদাত
২১. শাহাদাত-ই-নবুওয়াত
২২. আল্লাহর দল
২৩. জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ
২৪. জইশে মুহম্মদ
২৫. ওয়ারৎ ইসলামিক ফ্রন্ট
২৬. জামাত-আস-সাদাত
২৭. হরকাত-এ-ইসলাম আল জিহাদ
২৮. মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল
২৯. আহলে হাদিস
৩০. বাসবিদ
৩১. হিজবুত তাহরির
৩২. আল ইসলাম মারটায়ার্স ব্রিগেড
৩৩. আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট
৩৫. লিবারেশন মায়ানমার ফোর্স
৩৬. আরাকান মোজাহিত পার্টি
৩৭. শহীদ নসরুল্লাহ আল আরাফাত ব্রিগেড
৩৮. জামা'আতুল ফালাইয়া
৩৯. ওয়ারত ইসলামিক ফ্রন্ট
৪০. জামায়াতে আস-সাদাত
৪১. হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ
৪২. মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল
৪৩. ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ
৪৪. তা'আমীর উদ-দ্বীন বাংলাদেশ
৪৫. তানজীম

৬.৯ বাংলাদেশে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের অর্থের উৎস ও আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা ঃ বাংলাদেশে পরিচালিত এসকল ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসের সাথে একাধিক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের সহযোগী আমেরিকান নাগরিক এনাম আরনটের প্রতিষ্ঠান 'বেনেভোলেন্স ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন'-এর তৎপরতা ছিল বাংলাদেশে। রাজধানীর উত্তরায় তাদের অফিস ছিল। প্রতিষ্ঠানটি 'বেনেভোলেন্স ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন' নামে ১৯৯২ সালে এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন পায়। ঢাকায় তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। ওই অ্যাকাউন্টের অন্যতম পরিচালক ছিলেন এনাম আরকট।[২৪] ২০০২ সালে শিকাগোতে মার্কিন আদালতের বিচারে এনাম আরনটের আট বছরের জেল হয়।[২৫] সৌদি আরবের উদ্যোগে গঠিত আল-কায়েদার আরেক সহযোগী সংস্থা 'আল-হারামাইন'ও এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন পেয়ে বাংলাদেশে দশ বছর যাবত কাজ করেছে। এ সংস্থার কার্যালও ছিল উত্তরায়। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে পুলিশ 'আল-হারামাইন'-এর সাতজন বিদেশী নাগরিককে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের কার্যকলাপ সন্দেহজনক প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে ২০০৪ সালের জুলাইতে বাংলাদেশে 'আল-হারামাইন'-এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন ওই সংগঠনে কর্মরত ১৪ জন বিদেশী নাগরিক ঢাকা ছেড়ে চলে যায়। সে সময় বাংলাদেশ ছাড়াও 'আল-হারামাইন'-এর আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, আলবেনিয়া ও হল্যান্ডের শাখা বন্ধ করে দেয়া হয়। তদন্তে জানা গেছে, তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংক ও হুন্ডির মাধ্যমে বাংলাদেশে এনে ৮০০ মাদ্রাসা, হাসপাতাল, মসজিদ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে।[২৬] আরও জানা গেছে, বাংলাদেশে এখনও 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস)' নামক একটি কুয়েতভিত্তিক এনজিও কাজ করছে, যাদের বিরুদ্ধে ইসলামী জঙ্গী তৎপরতায় অর্থায়ন ও উদ্বুদ্ধকরণের অভিযোগ রয়েছে। জঙ্গী তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগে সৌদি আরব কর্তৃক প্রত্যাহার করে নেয়া 'আল-হারামাইন'-এর চারজন সাবেক কর্মকর্তা বর্তমানে আরআইএইচএস, বাংলাদেশ শাখায় কর্মরত আছেন। কুয়েতভিত্তিক এই 'রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' হলো জঙ্গী নেতা ডঃ গালিবের অর্থের প্রকৃত যোগানদাতা। এর সদর দপ্তরও উত্তরায়।[২৭] ফরিদপুরে আটক 'আল জমিয়াতুল ইসলামিয়া' নামের এক সংগঠনের নেতা মাওলানা আবদুর রউফ জানান, পাকিস্তানে সশস্ত্র ট্রেনিং নিয়ে তিনি চার বছর আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি একে-৪৭ রাইফেল চালাতে এবং গ্রেনেড চার্জ করতে জানেন। এছাড়া বাংলাদেশের জঙ্গী সন্ত্রাসী সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীনের সঙ্গেও বিদেশী জঙ্গীগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯৯ সালে জইশ-ই-মোহাম্মদের কাশ্মীর ফ্রন্টের প্রধান মাওলানা গাজ্জালী বাংলাদেশে এসে রাজশাহীতে ডঃ আসাদুল্লাহ গালিবের বাসায় একুশ দিন অবস্থান করেন। আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত বাহরাইনের নাগরিক নাছের লরিও নব্বইয়ের দশকে একাধিকবার এদেশে আগমন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। নাটোরের গুরুদাসপুরের মুর্শিদা বাহাদুরপাড়ার আবদুর রাজ্জাক এসকল বিদেশী জঙ্গী নেতাকর্মীদের আনা-নেয়ার কাজ তদারকি করে থাকেন। বর্তমানে আবদুর রাজ্জাক পলাতক। এছাড়া ভারতের বিহার রাজ্যে জঙ্গী তৎপরতার দায়ে অভিযুক্ত আবদুল মতিন সালাফি আশির দশকে রাজশাহীতে আগমন করেন। তার মাধ্যমেই ডঃ গালিব ও শায়খ আবদুর রহমান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থপ্রাপ্তির নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হন। এরশাদ সরকারের শাসনামলে আবদুল মতিন সালাফি বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন।২৮ এছাড়া বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে তৎপর রোহিঙ্গাদের তিনটি সংগঠন (১) আরএসও, (২) এআরএনও এবং (৩) এআরইএফ-এর বিরুদ্ধেও জঙ্গী তৎপরতা ও বিদেশী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে (পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব ঃ পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য) ।২৯ গত দশ মাসে শুধু নাইক্ষ্যংহুড়ি অরণ্যে সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে বিডিআর ১৩২টি একে-৪৭, এম-১৬, জি-থ্রি রাইফেলসহ ১৭ ধরনের ২১১টি ভারী অস্ত্র এবং এসবের সাথে ২৯ হাজার ৭২৭ রাউন্ড গুলিসহ বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম উদ্ধার করে (পার্বত্য এলাকায় অবৈধ অস্ত্রের পথ ও ট্রানজিট পয়েন্টসমূহ ঃ পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য) ।৩০

জিহাদী আন্দোলন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আমেরিকার বোস্টনের সিমোন্স কলেজের অধ্যাপক ড. জাকারি আবুজা সম্প্রতি এই মর্মে হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ *জেমা ইসলামিয়া (জেআই)*-এর যোগসাজস রয়েছে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে। গত অক্টোবরে আমেরিকান কংগ্রেসে জবানবন্দি দিতে গিয়ে ড. আবুজা বলেছেন, 'এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে যে, জেআই ক্যাডাররা তাদের পুনরায় সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে ব্যবহার করছে। অধিকাংশ মানুষের রাডার স্ক্রিনের বাইরে রয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সরকারেরও স্বচ্ছতার ভয়ংকর অভাব রয়েছে।'৩১

এছাড়া বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সংশ্লিষ্টতারও একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে, ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনায় মিস্টার রামেশ্বর প্রসূনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নয়টিরও বেশি ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলাদেশ বিরোধী ট্রেনিং চালু রয়েছে। ওই সব ক্যাম্পেই ১৭ আগস্টের বোমা হামলার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন হয়। এ সকল তথ্য সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতারকৃত ভারতীয় নাগরিক নাসিরুদ্দিন ও গিয়াসউদ্দিনের কাছ থেকে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে, তারা বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশে অবস্থান করে ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে লিপ্ত ছিল। তাদের কাছে পশ্চিম বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগনার মাওলানা মহসিন ভাদুরিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায়। তাদের কাছে জানা যায়, 'লিবারেশন টাইগার অফ বাংলাদেশ (এলটিবি)' নামে একটি বাংলাদেশ বিরোধী সংগঠনের কর্মকান্ডের কথা। উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই রয়েছে এই সংগঠনের নয়টি ট্রেনিং ক্যাম্প। নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির মিস্টার শৈলেন সরকার এবং জনযুদ্ধের মিস্টার মিজানুর রহমানের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে এলটিবি-র সঙ্গে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জনযুদ্ধের অপারেশন পরিচালনার জন্য উত্তর চব্বিশ পরগনার বশিরহাট এলাকায় ৬টি বাড়ি নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মি. সুশীল নামের এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এদের প্রশিক্ষক। বাংলাদেশী সন্ত্রাসীদের সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে ট্রেনিং দেয়া হলেও মূলত একই লক্ষ্যে তাদের পরিচালিত করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, ২১ আগস্ট, ১৭ আগস্ট ও অন্যান্য সময়ের সন্ত্রাসী তৎপরতায় ভারতের অভ্যন্তরে সম্পন্ন হোমওয়ার্কের বড় ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে ১৭ আগস্ট ২০০৫-এর হামলার বিষয়ে ভারতের কয়েকটি ক্যাম্পে ট্রেনিং হয়েছে বলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে গোয়েন্দারা তথ্য পেয়েছেন। সম্প্রতি রাজশাহীতে ধৃত 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)'-র সদস্যদের কাছ থেকে ২২ কেজি পাওয়ার জেল, এক্সপ্লোসিভ ও ইলেকট্রনিক ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়। এসব উপকরণ 'ইন্ডিয়া এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড'-এর তৈরি বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন। এর প্যাকেটে 'গোমিয়া' লেখা থাকায় বোঝা গেছে বোমার ওই উপকরণ এসেছে ভারতের ঝাড়খন্ডের কারখানা থেকে। গত সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিডিআর-বিএসএফ ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত দিল্লীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।৩২ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বিরোধী নিম্নলিখিত ট্রেনিং ক্যাম্পগুলি ভারতে চালু রয়েছে :

ছক-১৬

ভারতে বাংলাদেশবিরোধী ট্রেনিং ক্যাম্প

ক্রমিক নং	ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী ক্যাম্প	প্রশিক্ষকের নাম
১	ভাদুরিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা	নিতাই গোপাল পাল, মহাদেব পাল, সুকুমার সেন ও হিরালাল সেন
২	উত্তর ক্ষত্রিয়পাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	অতুল সরকার, রবি সরকার, সুসেন সরকার, নিতাই গোয়েন ও তারাপদ সরকার
৩	জেলেপাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	সাহেব মন্ডল, অশোক প্রামাণিক, অতুল প্রামাণিক ও রঞ্জন পড়ুই
৪	পশ্চিম ক্ষত্রিয়পাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	হারাধন মন্ডল ও কামাল বিশ্বাস
৫	কাপালিপাড়া, যশাইকাঠি, উত্তর চব্বিশ পরগনা	প্রভাত মন্ডল, কাশরি বশার ও সতিশ বশার
৬	মাগুরখালি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল (যশাইকাঠির কাছে), উত্তর চব্বিশ পরগনা	পূর্ণ সরকার, কালিকৃষ্ণ ব্যানার্জি, পরিমল সরকার ও নারায়ণ চৌধুরী
৭	কাটিয়া, বশিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা	গণেশ মন্ডল ও পরিতোষ দাস
৮	বিজিতপুর, বশিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা	কার্তিক চন্দ্র ও দাবি দাস
৯	গদ্ধবপুর, বশিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা	পশুপতি (শিক্ষক), অজিত বৈদ্য, বঙ্কিম বৈদ্য ও সদানন্দ বিশ্বাস।

(সূত্র : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন) ।৩৩

পত্রিকান্তরে৩৪ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের নিম্নলিখিত সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণরত অবস্থায় আছে :

১. কালা জাহাঙ্গীর
২. প্রকাশ কুমার বিশ্বাস
৩. শ্রিমতি সুব্রত বাইন
৪. মোল্লা মাসুদ
৫. হারিস আহমেদ
৬. আরমান
৭. আগা শামীম
৮. টোকাই সাগর
৯. বিহারী মুন্না
১০. সৈয়দ ইমাম হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

১১. জয়
১২. চেঙ্গা বাবু
১৩. নরোত্তম সাহা
১৪. ঢাকার কাটি

বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সাল থেকে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন চলে আসছে। এই আন্দোলনের ব্যানারে বঙ্গসেনা, বাংলাদেশ লিবারেশন অর্গানাইজেশন (বিএলও), বাংলাদেশ ফ্রিডম অর্গানাইজেশন (বিএফও), লিবারেশন টাইগার অফ বাংলাদেশ (এলটিবি) নামের সশস্ত্র গ্রুপগুলো বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ভারতে অবস্থানরত আরও কিছু সংগঠন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানান অপতৎপরতা চালাচ্ছে। সক্রিয় এমন সাতটি সংগঠন হচ্ছে-

এক. প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ হিন্দু রিপাবলিক অফ বীরবঙ্গ
দুই. উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদ
তিন. নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ
চার. বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিকার
পাঁচ. হিন্দু বাঙালি গণপরিষদ
ছয়. অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট
সাত. বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ (বাংলাদেশ রিফিউজি ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল)[৩৫]

৬.১০ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক জঙ্গী সন্ত্রাসের প্রভাবঃ পূর্বেই বলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সামরিক উত্তেজনার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রে। বাংলাদেশে সহিংস সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের ক্রমউত্থান। যার প্রভাবে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে নানামুখি পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি জনসমর্থনও হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচনের (দিনাজপুর-১ উপনির্বাচন ও সাতকানিয়া পৌর নির্বাচন) ফলাফলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দিনাজপুর-১ আসন থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন চারদলীয় জোট প্রার্থী ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল্লাহ আল কাফী। কিন্তু এবারের উপনির্বাচনে উক্ত আসনে চারদলীয় জোট প্রার্থী দিনাজপুর জেলা জামায়াতের আমীর আফতাব উদ্দীন মোল্লা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। নিচে দিনাজপুর-১ আসনের ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ২০০৫ সালের উপনির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করা হলোঃ

ছক-১৭

দিনাজপুর-১ আসনের ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ
আবদুল্লাহ আল কাফী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (চারদলীয় জোটের শরীক হিসেবে)	৮৮,৬৬৯
আবদুর রউফ চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	৬০,১৯৭
মনোরঞ্জন শীল গোপাল	জাতীয় পার্টি	৪০,৬২১

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ১০, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ: ২৯

Dhaka University Institutional Repository

ছক-১৮

দিনাজপুর-১ আসনের ২০০৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ
মনোরঞ্জন শীল গোপাল	স্বতন্ত্র	১,১৩,৪৯১
আফতাব উদ্দীন মোল্লা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (চারদলীয় জোটের শরীক হিসেবে)	৪৯,২৯৯
নাসিরুল হক রুস্তম	নাগরিক কমিটি	১২,৮৪৭
আবদুল মালেক সরকার	জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	৩,৪৪১
শিবলী সাদিক	স্বতন্ত্র	১,৩৮৫

সূত্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯

উপরের নির্বাচন দুটির ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০১ সালের নির্বাচনে চার দলীয় জোটের প্রার্থী রূপে নির্বাচন করেন জামায়াতের আবদুল্লাহ আল কাফী এবং ভোট পান ৪৭ শতাংশ। আওয়ামী লীগ প্রার্থী পান ৩২ শতাংশ আর মনোরঞ্জন শীল পান ২১ শতাংশ। কিন্তু ২০০৫ সালের উপনির্বাচনে এই ছবি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই নির্বাচনে মনোরঞ্জন শীলের ভোট পূর্বের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি পান ৬৩ শতাংশ ভোট। তাঁর বিপরীতে চার দল সমর্থিত জামায়াত প্রার্থী ভোট পান মাত্র ২৭ শতাংশ অর্থাৎ জামায়াত প্রার্থীর ভোট কমে যায় প্রায় অর্ধেক। একইভাবে সাতকানিয়া পৌর নির্বাচনের ফলাফলেও দেখা যায়, বিএনপি থেকে মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদুর রহমান জামায়াত প্রার্থীর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি ভোট পেয়েছেন। অথচ ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে এ অঞ্চল (চট্টগ্রাম-১৪) থেকে জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী বিএনপি প্রার্থী কর্নেল অলি আহমেদ বীর বিক্রম-কে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিচে সাতকানিয়া পৌর নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ছক-১৯

২০০৫ সালের সাতকানিয়া পৌর নির্বাচনের ফলাফল

প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ
মোহাম্মদুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪,২৬৮
মোহাম্মদ সেলিম উল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৪৫৫

সূত্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০

তথ্যসূত্র ঃ

১। দৈনিক প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫।
২। প্রাগুক্ত।
৩। ৯/১১ : চার বছরে কত নিরাপদ বিশ্ব?, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), দৈনিক প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।
৪। প্রাগুক্ত।
৫। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৩, ০৩ জানুয়ারী, ২০০৬।
৬। প্রাগুক্ত।
৭। Newsweek 16.03.2005

Dhaka University Institutional Repository

৮। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১, সংখ্যা ৪১, ২৬ জুলাই ২০০৫।
৯। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ, ২০০৫, পৃঃ ১৮।
১০। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২, সংখ্যা ০৬, ১৫ নভেম্বর ২০০৫
১১। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ, ২০০৫, পৃঃ ১৮।
১২। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫।
১৩। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫।
১৪। দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৫
১৫। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪৫, ২৩ আগস্ট, ২০০৫, পৃঃ ৪ ও ২৫।
১৬। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ৯, ০৬ ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃঃ ২৬-২৭।
১৭। দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০০৫
১৮। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ১২, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪।
১৯। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫।
২০। মাওলানা উবায়দুর রহমান খান, 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহ্‌কে দেখেছি', কিতাব কেন্দ্র, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
২১। দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর, ২০০৫।
২২। প্রাগুক্ত।
২৩। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫, পৃঃ ৫-৭ এবং দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর, ২০০৫, পৃঃ ২
২৪। দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০০৩।
২৫। দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৫।
২৬। দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ জুলাই, ২০০৪।
২৭। দৈনিক সংবাদ, ৯ এপ্রিল, ২০০৫।
২৮। দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৫।
২৯। দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর, ২০০৫।
৩০। দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট, ২০০৫।
৩১। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী হুমকির ব্যাপারে সাবধান, অ্যান্থনি পল, সিনিয়র রাইটার, দি স্ট্রেইটস টাইমস, ভাষান্তর : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ ২০০৫, পৃঃ ১৮।
৩২। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ০১, ০৪ অক্টোবর ২০০৫, পৃঃ ৪-৫।
৩৩। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ০১, ০৪ অক্টোবর ২০০৫, পৃঃ ৫
৩৪। প্রাগুক্ত।
৩৫। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

৭.০ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত

৭.১ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ঃ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এই মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা মনে করতে থাকে যে, পাকিস্তান ভেঙে গেলে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এমনকি তারা এই সন্দেহও পোষণ করতে থাকে যে, ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এ দেশটিকে একটি ভারত নির্ভর দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় সামনে রেখে তারা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখনও তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। এরশাদের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এছাড়া ইসলামী ঐক্যজোট এ নির্বাচনে ১টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামীও অন্যতম শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। অতঃপর ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরায় ১৭টি আসন লাভ করে চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরীক দল হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধারা ক্রিয়াশীল রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে এর সকল আন্তঃস্রোত বা ধারার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব একটি এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি এক

Dhaka University Institutional Repository

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মেলবন্ধনে যুক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মকান্ত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সে কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ভূমিকা গ্রহণের কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অতঃপর নানা ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে যারা এরশাদের সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন (১৯৮২-১৯৯০) এবং ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তিক্ততার পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মতাদর্শিক ও আন্তর্জাতিক সংকটের কারণে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বর্তমানে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখের সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কি-না সেই প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে।

৭.২ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমস্যা ঃ বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চরিত্রগত, মাত্রাগত ও গুণগত কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা সাম্প্রতিক, আবার কিছু কিছু সমস্যা ঐতিহাসিক। নিম্নে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমস্যাগুলি আলোচনা করা হলো ঃ

(১) নৃতাত্ত্বিক সমস্যা ঃ নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী অস্ট্রো-মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠী বা রেস হিসেবে পরিচিত। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, সেমিটিক ও আর্য রেসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যার কারণে বাংলাদেশের নাগরিকগণের একটি অংশ ভাষাগতভাবে ও নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি হলেও পাশাপাশি এখানে সাঁওতাল, গারো, মুরং, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, হাজং, রাখাইন ইত্যাদি বহু উপজাতি বা এথনিক গ্রুপের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিটি এথনিক গ্রুপের রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা ও সংস্কৃতি। সে কারণে বাংলাদেশ একটি বহুভাষাভিত্তিক মিশ্র-সাংস্কৃতিক অঞ্চল। ধর্মের দিক দিয়ে জনসংখ্যার বাঙালি অংশটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্য সকল এথনিক গ্রুপই হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা খ্রিস্টধর্মের অনুসারি। ২০০১ সালের চতুর্থ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম, ১০.৫ ভাগ হিন্দু, ১.০৮ ভাগ উপজাতি এবং অবশিষ্ট ১.৪২ ভাগ খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এসকল ধর্মের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতীত বাকি ধর্মগুলোর (ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম) উৎপত্তি ও বিকাশস্থল মধ্যপ্রাচ্য। ধর্মগ্রন্থসমূহও (কুরআন ও বাইবেল) যথাক্রমে আরবি ও হিব্রুভাষায় রচিত। জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের সাথে বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশে হলেও এ দুটো ধর্মের মূল গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত যা বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা নয়। এমনকি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বর্তমান জীবনাচরণ ও সংস্কৃতির সাথেও বাংলাদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধদের জীবনাচরণ বহুলাংশে মেলে না। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এই নৃতাত্ত্বিক অবস্থার সাথে তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে কেবলমাত্র একটি ধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের মতো একটি বহু ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক নরগোষ্ঠিতে বিভক্ত অঞ্চলে তাদের এ প্রচেষ্টা প্রায়শঃই প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎপদ ও সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে 'জাতীয়তাবাদে জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। কারণ, রাষ্ট্রের সব নাগরিক এক জাতি হলেও এক ধর্মের নাও হতে পারে। তাই জাতীয়তাবাদের উল্টোপিঠে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাপ না থাকলে সংখ্যালঘু দল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকবে এবং নাগরিকত্বের সমঅধিকার থেকে পরোক্ষভাবে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার কারণে।'[১] এ প্রসঙ্গে আল-আশমাবী বলেছেন, 'ধর্ম ও রাজনীতির দুটো আলাদা ক্ষেত্র থাকা এই কারণেই প্রয়োজন যে, বেসামরিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসনকার্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রয়োগ বর্তমানকালে অপরিহার্য। রাজনীতিকে ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত না রাখলে বেসামরিক আইন প্রয়োগে বাধা আসবে। কারণ, একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে।'২

(২) ইমেজ সংকট ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বর্তমানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে তীব্র ইমেজ সংকটের সম্মুখীন। একদিকে ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী অব্যাহত জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের বিস্তার, অপরদিকে উক্ত সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিমা ও আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম কর্তৃক অব্যাহতভাবে ধর্মভিত্তিক যে কোন রাজনীতিকেই 'মৌলবাদী সন্ত্রাস' হিসেবে অভিহিত করার কারণে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ইমেজ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে, যা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটছে না। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এই সংকট পুরানো হলেও এর মাত্রা দর্শনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আশির দশক থেকে। এসময় 'আকিলি লরো' নামক একটি ব্রিটিশ জাহাজ ছিনতাইয়ের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কর্তৃক মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী জঙ্গী নেতা আবু নিদালকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। একই সময় 'লকারবি' প্লেন ক্র্যাশের জন্য লিবিয়ার উপর মার্কিন সামরিক হামলা চালানো হয়। প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর 'মার্কিন অর্থনীতির হৃৎপিন্ড' বলে কথিত নিউইয়র্কের 'টুইন টাওয়ার'-এ দুটি কমার্শিয়াল জেট প্লেনযোগে আত্মঘাতি হামলা চালানো হয়। তৃতীয় একটি বিমান হামলা চালায় ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে। চতুর্থ প্লেনটি পেনসিলভানিয়ার একটি মাঠে বিধ্বস্ত হয়। এই চারটি হামলায় ২,৯৯২ জন বেসামরিক নারী-পুরুষ নিহত হয়। আন্তর্জাতিক জঙ্গী সংগঠন 'আল-কায়েদা' উক্ত হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। ২০০২ সালের ১২ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন শহর বালিতে সহিংস বোমা হামলায় ২০০ লোক নিহত হয়।৩ এই ঘটনার তিন বছরের মাথায় জঙ্গী সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয় ইংল্যান্ডে। ৭ জুলাই ২০০৫-এ 'লন্ডনের গৌরব' হিসেবে পরিচিত পাতালরেল এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ও লন্ডনের প্রতীক ডাবলডেকার বাসে চালানো হয় বোমা হামলা। পর পর পরিচালিত এসব হামলায় ন্যূনপক্ষে নিহত হয় ৫৮ জন। আহত হয় প্রায় হাজার খানেক মানুষ। পরবর্তীতে ইউরোপের আল-কায়েদা গ্রুপ *'জিহাদ ইন ইউরোপ'* লন্ডনে ৭ জুলাইয়ের বোমা হামলার কৃতিত্ব দাবি করে। লন্ডনে দ্বিতীয় দফা বোমা হামলার একদিন পরই আক্রান্ত হয় মিসরের পর্যটন শহর শার্ম আল শেখ। ১৫ মিনিটের ব্যবধানে চালানো তিনটি বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হয় একটি মার্কেট, একটি পার্কিং এরিয়া এবং বিখ্যাত গাজালা গার্ডেন হোটেল। প্রাথমিক হিসেবে নিহতের সংখ্যা নয়জন বিদেশী পর্যটকসহ কমপক্ষে ৯০ জন। মিসরের এই বোমা হামলার দায়িত্ব দাবি করে দুটি সন্ত্রাসী সংগঠন : মিসর ও সিরিয়া ভিত্তিক আল-কায়েদা গ্রুপ *'আবদুল্লাহ্ আজম বৃগেডস'* ও *'মুজাহিদি মিশর'*। বাংলাদেশেও নব্বইয়ের দশক থেকে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী', 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ', 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ', 'শাহাদাত-ই-আল হিকমা' ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে যাদের সন্ত্রাসী বোমা হামলায় ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ (যশোরে উদীচীর বোমা হামলা) থেকে শুরু করে ২০০৫ সালের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৩টি বড় ধরনের বোমা বা গ্রেনেড হামলায় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীসহ ১৮১ জন নিহত ও ১,৩৯৯ জন আহত হয়।৪ পরবর্তীতে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ'-এর আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৪ নভেম্বর ২০০৫ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, এনজিওকর্মী ও পুলিশসহ ২১ জন নিহত ও প্রায় ২৩৫ জন আহত হয়।৫ এসকল সন্ত্রাসী ঘটনায় বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সকল প্রচারমাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে, বিশেষ করে ইসলামভিত্তিক রাজনীতিকে একতরফাভাবে 'সন্ত্রাস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ডেভিড হিউম-এর ভাষায়, `The image problem is further complicated in the eyes of friends of the United States in Asian Muslim Countries because the western media seem to focus only on the political activities of extremist movements not on the positive aspects of Muslim community.'৬

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মৌলবাদের প্রসার ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যখন যে ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সে ধর্মকে সমাজের আর সকল ধর্মের উপর স্থান দিয়ে থাকে। নিজ ধর্মের প্রতি এই অন্ধ ও যুক্তিহীন দলীয় সমর্থন থেকে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় গোঁড়ামি বা মৌলবাদ। নিজের ধর্মবিশ্বাস যখন অপরের ধর্মকে ব্যাহত বা আঘাত করে বা অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের শত্রু মনে করে নিজের ধর্মবিশ্বাস যখন যুক্তির পথ সম্পূর্ণ পরিহার করে (এবং তা মানবতাবিরোধী হলেও) তখনই তা গোঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত। রক্ষণশীলতা বা কনজারভেটিভইজম কিংবা অর্থোডক্সি, পরিবর্তন-বিরোধী ভাব এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই ধর্মীয় গোঁড়ামি যখন উগ্র আকার ধারণ করে, তখন তা সাম্প্রদায়িকতার রুপ নেয়। সাম্প্রদায়িকতা বা কমিউনালিজম অবশ্য শুধু যে ধর্মীয় হবে এমন মানে নেই। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধ মাত্রেই সাম্প্রদায়িক-তা ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, বর্ণগত, যাইহোক না কেন। এই ধর্মীয় গোঁড়ামি যখন নিজ ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের প্রতি স্বার্থমগ্ন হয়ে অপর ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি করতে চায়, তখন তাকে বলা যেতে পারে ধর্মান্ধতা, ইংরেজিতে ফ্যানাটিসিজম বা বিগটরি। এর বশবর্তী হলে রাজা হতে পারেন স্বৈরাচারী, শাসক হতে পারেন জল্লাদ, ধর্মীয় নেতা হতে পারে মানব সমাজের শত্রু, সাধারণ মানুষ মেতে উঠতে পারে আত্মক্ষয়ী দাঙ্গায়। তথ্য ও যুক্তি তখন কাজ করে না।৭

(৪) সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ও বিকাশ ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই রাজনীতি একই সময়ে একাধিক ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। ফলে একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে ধর্মভিত্তিক একাধিক বিভাজন সৃষ্টি হয়। উক্ত বিভাজন থেকে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উন্মাদনা যা সমাজকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ এই উন্মাদনায় দেশের স্বার্থের চাইতেও বড় হয়ে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থ। সাম্প্রদায়িক চেতনা যে শুধুমাত্র ধর্মীয় আদর্শে এবং সামাজিক আচরণে ভেদপন্থা ও সংঘাতের সৃষ্টি করে তাই নয়, রাজনৈতিক জীবনেও সৃষ্টি করে গভীর সংকট। বস্তুতপক্ষে রাজনীতির সঙ্গে বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক চিন্তার ও কার্যকলাপের যোগ গভীর। প্রভা দীক্ষিত তাঁর 'কমিউনালিজম এন্ড স্ট্রাগল ফর পাওয়ার' বইতে তা সবিস্তারে দেখিয়েছেন।৮ রাজনীতিব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আর একজন পন্ডিত গোপালকৃষ্ণ লিখেছেন, 'রাজনীতির মধ্যে ধর্মের সেই ধ্বংসাত্মক ভারতীয় অভিপ্রকাশ যা ধর্মীয় আইডেন্টিটির উপরই জোর দেয় এবং রাজনৈতিক সমাজকে কতকগুলি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কনফেডারেশন বলে মনে করে।'৯'বর্তমান পৃথিবীতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে যে সব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ধর্মীয় রাষ্ট্র বা ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের নেতৃত্বের পর্যায়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ক্ষমতা দখলের নীল নকশা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মোটিভেশনের অংশ হিসেবে ধর্মের যে ব্যাখ্যা ও রাজনীতিকীকরণ তারা করেন, তারই উপজাত হিসেবে তৈরি হয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যার পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বর ট্র্যাজেডি, ব্রিটেনের ৭ জুলাই ট্র্যাজেডি, গুজরাটের মুসলিম নিধন কিংবা বসনিয়ার মুসলিম হত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটে। যে পরিকল্পিত শিক্ষা ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত করে, সেই একই শিক্ষা হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসকে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত করে। কোন এক পক্ষের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বর ট্র্যাজেডি কিংবা ব্রিটেনের ৭ জুলাই ট্র্যাজেডিকে যদি মনে হয় যথাযথ, তাহলে অপরপক্ষের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংস, গুজরাটের মুসলিম নিধন কিংবা প্যালেস্টাইনে ইসরাইলী নির্যাতনকের মনে হবে যথাযথ। এখানে দোষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের নয়, দোষ সাম্প্রদায়িকতার। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত অরুন্ধতী রায়ের একটি লেখায় উক্ত আগ্রাসন সম্পর্কে এক মার্কিন সৈন্যের অনুভূতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সৈন্যটি তার অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছিল এভাবে : 'নাইন-ইলেভেনের পর থেকে এদিনটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমার নোংরা হাতকে এদের রক্তে আরও নোংরা করব।' অযোধ্যায় শিবসেনা কর্তৃক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় সেখানে নিয়োজিত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সদস্যকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখে বিবিসির এক ভারতীয় সাংবাদিক তাকে এর

Dhaka University Institutional Repository

কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে জানায় যে, এটা রামের জন্মস্থান। এখানে রাম মন্দির স্থাপন করা আমাদের ধর্মীয় অধিকার। আমিও এই মসজিদ ধ্বংসের পক্ষপাতি। তবে দুঃখের বিষয়, সরকারের চাকরী করি দেখে মসজিদ ভাঙার এই পুণ্যকাজে আমি নিজে অংশগ্রহণ করতে পারছি না।'১০ এ বিষয়ে উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ বলেছেন, 'ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে বলা যেতে পারে একটা মতাদর্শ, যা জোর দিয়ে প্রত্যেক ধর্মের অনুগত সম্প্রদায়কে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায় বা ইউনিট হিসেবে দেখিয়েছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পার্থক্য এমনকি শত্রুতার উপর জোর দিয়েছে।'১১ ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ বলছেন, 'যাদের তারা প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবী করে, সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বা সংগঠনগুলির কার্যকলাপ এমনভাবে হয়, যা অন্য গোষ্ঠীর মানুষের স্বার্থের বা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী।'১২ ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হলেও এই সাম্প্রদায়িকতা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মত ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সকল অর্জন ও কৃতিত্বকেই তা নস্যাৎ করে দেয়। ১৯৪৭-পরবর্তী ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা প্রতীয়মান হবে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে। পরবর্তী সময়ে এই দলটি 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' (Two Nation Theory)-এর ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা করে। এই তত্ত্বের সারবত্তা হলো, 'হিন্দু ও মুসলিম সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জাতি। পৃথক রাষ্ট্র ব্যতীত তাদের পক্ষে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়।' এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মানুভূতি ও ধর্মীয় উন্মাদনাকে পুঁজি করে তদানীন্তন মুসলিম লীগ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দিয়ে যায়। তার মধ্যে একটি রাষ্ট্রের নাম ভারত, অপরটির নাম পাকিস্তান। ১২০০ মাইল ভারতীয় ভূখন্ডের দু'প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হলো নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্টতা আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবীদের। উভয় অংশেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে একমাত্র ধর্ম ছাড়া দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হ্যান্স জে, মর্গেনথু তাঁর 'Military Illusions : The New Republic' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাইরে থেকে শক্তিশালী মনে হলেও এর ভেতর রয়েছে কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। পাকিস্তান একটি জাতি নয়, বড় জোর একটি রাষ্ট্র। এর অধিবাসীদের জাতিগত উদ্ভব, মুখের ভাষা, সভ্যতা কিংবা মানসিকতা–কোনদিক থেকেই এক জাতি গঠনের কোন ঐতিহাসিক যুক্তি নেই। একমাত্র হিন্দুদের আধিপত্যের ভয় ছাড়া ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে–একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দুটি জাতির এই ধরনের একটি রাষ্ট্র গঠনের যৌক্তিক কোন কারণই নেই।'১৩ মুসলিম লীগের আন্দোলনের ফসল হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের আলখাল্লা থেকে বেরিয়ে পড়া সাম্প্রদায়িকতার দানব তার সকল অর্জন ও সাফল্যকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে (১৯৪৬ ও ১৯৬৪) গোটা ভারতবর্ষে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ও লাহোরে সংঘটিত হয় ভয়াবহ কাদিয়ানীবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সরকার সেই দাঙ্গা দমনের জন্য লাহোরে সামরিক আইন জারী করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের জনগণ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক জোট যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় দেয়। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েও নিজের পতন রোধ করতে ব্যর্থ হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব সরকারের পতন হলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দেন। ১৯৭০ সালের সেই সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠি শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ফলাফল ছিল খুবই শোচনীয়। জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনীত ২০০ জন প্রার্থীর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র ৪ জন জাতীয় পরিষদে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন। পূর্ববাংলায় অধিকাংশ আসনেই তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়া মুসলিম লীগ (কাইউম) ৯টি, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ৭টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ৭টি, নারকাজ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ৭টি ও মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ২টি আসনে জয়লাভ করে। ধর্মভিত্তিক দলগুলির মধ্যে তাহরিকে ইশতেকলাল একটি আসনেও জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের এই নির্বাচন অখন্ড পাকিস্তান ভাঙার ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও পাকিস্তান সৃষ্টির নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতাই ছিল এর মূল কারণ।

(৫) **ঐতিহাসিক কার্যকারণজনিত সমস্যা ঃ** বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে সকল ধর্মকে আশ্রয় করে আবর্তিত হয়, সে সকল ধর্মের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তিক্ততা রয়েছে- যা এ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এই ঐতিহাসিক তিক্ততা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে পাশাপাশি আন্দোলনরত একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের 'রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ' বিতর্কের কথা উল্লেখ করা যায়। এই বিতর্কের ভিত্তিমূলে রয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক সুকৌশলে রটিয়ে দেয়া একটি কল্পকাহিনী যেখানে বলা হয়, 'অযোধ্যায় রামের জন্মস্থানে অবস্থিত মন্দিরটি ভেঙে সম্রাট বাবরের সময়ে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।' ১৮৫৪ খ্রি: এডওয়ার্ড থর্নটন যে গেজেটিয়ার (A Gazettees of the Territories under the Government of the East India Company, London, Allen qlo, 1854, 4 vols) প্রকাশ করেন, তাতে বলা হয়, 'মসজিদের কালো পাথরগুলি হিন্দু মন্দির থেকে নেয়া'। তারপর ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম উইলসন হান্টারও 'The Imperial Gazetteer of India' (Vol 1, Tribner & Co, London, 1881, p. 105)-এ একই কথা উল্লেখ করেন। সবশেষে ১৯০৫ খ্রি: এইচ, আর, নেভিল (H. R. Neville) সম্পাদিত 'ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' (ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, এলাহাবাদ, ১৯০৫, পৃঃ ১৭৩)-এ বলা হয়, '১৫২৮ সালে বাবর এক সপ্তাহ অযোধ্যায় ছিলেন এবং তিনি প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যেটি এখনও বাবরি মসজিদ নামেই পরিচিত'।[১৪] কোন রকম ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ ব্যতিরেকে দিল্লী গেজেটিয়ারে বর্ণিত উক্ত তথ্য ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ দাবানল জ্বালিয়ে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সমর্থনে শিবসেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যানারে একশ্রেণীর ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে অযোধ্যার বাবরি মসজিদে বর্বরোচিত হামলা চালায়। উক্ত হামলার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ ও ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যে দাঙ্গায় অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণহানি ও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হয়। একাধিক ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান এরকম আরেকটি ঐতিহাসিক তিক্ততা হলো ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। ঐতিহাসিকগণের মতে, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর অধ্যায়ের সূচনা করে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত তিনশ বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ ও বিক্ষুব্ধ খ্রিস্টানজগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। ধর্মের নামে বর্মে ক্রশচিহ্ন ধারণ করে অসংখ্য হতভাগ্য খ্রিস্টান যুবককে এই ঘৃণ্যযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে পাদ্রীরা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সংঘটিত এই ধর্মযুদ্ধের কারণ যেমন বিবিধ, এর ফলাফল তেমনই ব্যাপক। এসব কারণের মূলে ছিল ধর্ম, রাজনীতি, বাণিজ্য ও মনস্তত্ত্ব। '৬৩৪ খ্রি. খলিফা ওমরের খিলাফতের সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ শুরু হয়। ইসলাম তখন শুধু আরবভূমিতে থেমে থাকেনি। আমর-ইবনুল-আস সর্বপ্রথম খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ফিলিস্তিন দখল করেন এবং খলিফা স্বয়ং জেরুজালেমে গিয়ে শহরের হস্তান্তর গ্রহণ করেন। যিশুখ্রিস্টের জন্মভূমি ফিলিস্তিন মুসলমানদের হস্তগত হলে খ্রিস্টান জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর মিরাজে গমনের স্থান এবং হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত দাউদ (আঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত হওয়ার কারণে জেরুজালেম নগরী মুসলমানদের কাছেও সমভাবে পবিত্র ছিল। তাই ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম-এই তিন সম্প্রদায়ের কাছেই জেরুজালেম ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১০০৯

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি. মিসরের ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম কর্তৃক জেরুজালেমের পবিত্র গীর্জা (Holy Sepulchre) ধ্বংস করা এবং খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতি সেলজুক তুর্কী সুলতানদের অনুদার নীতি ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে খ্রিস্টান ও মুসলিম শক্তির মধ্যে শুরু হয় ধর্মযুদ্ধ। ঐতিহাসিক আমির আলীর মতে, ধর্মান্ধতাই ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান কারণ, যদিও অন্যান্য উদ্দেশ্যও ছিল; যেমন, নতুন রাজ্য সৃষ্টি, ধনসম্পদ সংগ্রহ, অর্থলোভ, পাপাচার এবং স্বর্গলাভের আশা। এই ক্রুসেডকে তিনটি যুগে ঐতিহাসিকগণ ভাগ করেছেন : (১) ১০৯৫-১১৪৪, (২) ১১৪৪-১১৯৩ এবং (৩) ১১৯৩-১২৯১। জেরুজালেম রক্ষা ও উদ্ধার অপেক্ষা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়।'[১৫] বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসের নেপথ্যেও রয়েছে মধ্যযুগীয় ইউরোপের ১০৯৫-১২৯১ কালপর্বে সংঘটিত সেই ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের তিক্ততা। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন আফগানিস্তান ও ইরাকে যে সামরিক অভিযান শুরু করেন, তার নাম দেন 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ। অপরদিকে তার প্রতিক্রিয়ায় আল-কায়েদা ও অন্যান্য সংগঠন ব্রিটেন, মিসর, স্পেন ও ইন্দোনেশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের উপর যে পাল্টা হামলা চালায়, তার নাম দেয় 'জেহাদ'। 'কট্টরবাদী ইসলামী গোষ্ঠীগুলো যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বকে অভিহিত করে 'ক্রুসেডার শক্তি' হিসেবে। 'ক্রুসেডার'দের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার আত্মরক্ষামূলক 'জেহাদ'-এর ডাকে সাড়া দেয় অন্যান্য ইসলামী 'জেহাদী' গ্রুপগুলো। আল-কায়েদার মূল লক্ষ্য ক্রুসেডারদের হাত থেকে ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষা করা।'[১৬] এভাবেই দেখা যায়, ঐতিহাসিক কার্যকারণজনিত সমস্যা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৬) রাষ্ট্র ও সমাজের বাস্তব সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থতা ঃ মানুষ বিবর্তনশীল প্রাণী। মানব সমাজ ও সভ্যতা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই ক্রমবিবর্তনের প্রতিটি স্তরে মানুষকে নানাবিধ সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের সামনে রয়েছে অনেক নতুন নতুন সমস্যা। যেমন, গ্রিনহাউজ সমস্যা, আর্সেনিক সমস্যা, পারমাণবিক সমস্যা, এইডস রোগের সমস্যা ইত্যাদি। মানবসমাজের কাঠামোও সরল প্রকৃতি থেকে জটিল প্রকৃতিতে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলো যে সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন ছিল সরল প্রকৃতির সমাজকাঠামো। বর্তমানের জটিল সমাজের অধিকাংশ সমস্যাই তখন ছিল অনুপস্থিত। যার ফলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, ওই সকল ধর্মগ্রন্থে বর্তমান সমাজের কোন সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু কট্টরপন্থী ধর্মানুসারীগণ এবং তাদের রাজনৈতিক দলগুলো তা মানতে নারাজ। তাদের দৃষ্টিতে তাদের ধর্মগ্রন্থে যা বর্ণিত নয়, তা আদৌ কোন সমস্যা নয়। যেমন, কৃষিভিত্তিক সমাজে ধর্মের প্রবর্তন হওয়ায় বর্তমানের শিল্পভিত্তিক সমাজের মালিক-শ্রমিক বৈষম্য কোন সমস্যা নয়। এভাবে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করে এরা কেবলমাত্র ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক রাজনীতিতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখে। ইতিহাসবিদ গৌতম নিয়োগীর ভাষায়, 'ধর্মচেতনা আর সামগ্রিক গোষ্ঠীচেতনাকে একাকার করে ফেলাই সাম্প্রদায়িকতা, যার বশবর্তী হলে মানুষ সবই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে অথচ ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস রাখতে গিয়ে সংকীর্ণতার ফলে সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যা বুঝতে পারে না। ফলে একই সামাজিক সমস্যায় দীর্ণ বা অর্থনৈতিক শোষণক্লিষ্ট, একই শ্রেণীর, একই বস্তুগত পটভূমিকার মানুষও তখন অকারণে শত্রু বা বিরোধী প্রতিপন্ন হন।'[১৭] ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এই সমস্যা সম্পর্কে কান্টওয়েল স্মিথ বলেছেন, '...মূল সমস্যাটা জাতীয়তাবাদের সাথে সংঘর্ষের সমস্যা নয়; কারণ দেখা গেছে, এই সংঘর্ষ জাতীয়তাবাদের ভাবপ্রবণতার সাথে অচলায়তনের গোঁড়ামির বিরোধ নয়। এই দুই শ্রেণীর সাধু উদ্দেশ্যকে একই খাতে প্রবাহিত করা যায়। কিন্তু সমস্যাটা হলো রূঢ় বাস্তব সমস্যা-ইসলামের মূলধারার থিওরির সাথে আধুনিক ইসলামের চিন্তাধারায় বাস্তবায়নের সমস্যা, থিওরি ও প্র্যাকটিসের সমস্যা।'[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

(৭) ধর্মীয় মতপার্থক্য ও উপদলীয় কোন্দল ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি অন্যতম সমস্যা হলো, অভিন্ন ধর্মের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য ও উপদলীয় কোন্দল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতপার্থক্য সর্বপ্রথম সূচিত হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। হযরত ওসমান (রাঃ) বারো বছর (৬৪৪-৬৫৬) শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি গোষ্ঠি কলহের (হাশেমী ও উমাইয়া গোষ্ঠি) শিকার হয়ে নিজ গৃহে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু মুসলিম ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায়। কারণ, তিনি মুসলিম সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। তাঁর হত্যাকান্ডে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংহতিতে দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। 'পরবর্তীতে যারা হযরত (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, যারা কার্যত হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছিল, হত্যায় প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং তাতে সাহায্য করেছিল, এমনকি সামগ্রিকভাবে এ মহাবিপর্যয়ের দায়িত্ব যাদের ওপর পড়ে তারা সবাই হযরত আলী (রাঃ)-কে খলিফা করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে। খেলাফতকার্যে তাদের অংশগ্রহণ এক বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'[১৯] ফলে মহানবীর (সাঃ)-এর একাধিক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রাঃ)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের দুটি প্রধান পক্ষ থেকে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলা গ্রহণের দাবী উত্থাপিত হয়। একদিকে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত জোবায়ের (রাঃ) এবং অপরদিকে সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুআবিয়া (রাঃ)। এর ধারাবাহিকতায় হযরত আলী (রাঃ) ও মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হলে হযরত আলী (রা:)-এর সৈন্যদল থেকে মুসলমানদের একটি অংশ বিদ্রোহ করে বেরিয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে এরাই খারিজী নামে পরিচিত। এই 'খারিজী গ্রুপের এক সদস্যের হাতে ৬৬১ খ্রি: হযরত আলী (রাঃ) নির্মমভাবে নিহত হন।'[২০] পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ)-এর দুই পুত্রও (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পুত্র ইয়াজিদের ষড়যন্ত্রে সপরিবারে নিহত হন। তাদের হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় শিয়া ও সুন্নী-এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্তির ধারাবাহিকতায় উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতকালে সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে চারজন এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বারো জন ধর্মগুরু বা ইমামের আবির্ভাব ঘটে। সুন্নী সম্প্রদায়ের চারজন ইমাম হলেন, (১) ইমাম আবু হানিফা, (২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, (৩) ইমাম শাফেয়ী ও (৪) ইমাম মালেক। এই ইমামগণ কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার আলোকে চার প্রকার মতবাদের জন্ম দেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদগুলোকে মযহাব বলা হয়। পরবর্তীতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বিভক্তির সূত্রপাত হয়, যেমন, দ্রুজ (Druze), আলাওয়াইট (Alawite), ওয়াহাবী (Wahabi) ইত্যাদি। এই বিভক্তির প্রতিফলন ঘটে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতেও। যেমন, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে ওয়াহাবী মতবাদের প্রাধান্য এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের রাজনীতিতে সুন্নী মযহাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যুর পর চার মযহাবের উলামাগণ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, ভবিষ্যতে মোল্লা বা উলামাগণ এই চার মযহাবের সিদ্ধান্তের বাইরে নতুনভাবে কোন সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। এই মযহাবের দেয়া সিদ্ধান্তকে আইন বলে মেনে নিতে হবে।'[২১] উলামাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে ইসলাম ধর্মে ইজতিহাদ বা মুক্তচিন্তার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। গোটা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় এবং তাদের সমর্থিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন মযহাব, গোষ্ঠী বা ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্ণ ও গোত্রগত বিরোধ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব পড়েছে তাদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতেও। 'গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর (খ্রি: পূ: ৪৮৩ অব্দ) পর রাজা কনিষ্কের সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধ পন্ডিত নির্বাণ লাভের পদ্ধতির ভিত্তিতে 'মহাযান' নামক বৌদ্ধধর্মের এক নতুন মত প্রবর্তন করেন। যারা এই মত মানতেন না, তাদের নামকরণ করা হয় 'হীনযান'। বর্তমানে চীন ও জাপানের বৌদ্ধরা মহাযানী এবং থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা হীনযানী।'[২২] এসকল দেশের রাজনীতিতে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। 'ইহুদিদের মধ্যেও মোজেস-এর সময় থেকে যিশুখ্রিস্ট পর্যন্ত দুটি বিরুদ্ধ মতবাদ (doctrine) বিরাজ করতো : একেশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ। দুটি পদ্ধতির মধ্যে যে বিরোধ তা হলো 'মা'ত বিবেক পদ্ধতি' আর 'মোজেস-এর দশাদেশ (Ten Commandments) অর্থাৎ আইন বিষয়ক পদ্ধতি।'[২৩] হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'মনুসংহিতা'-র ভিত্তিতে ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 'চতুঃবর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথা' চালু করেন, যার প্রেক্ষিতে হিন্দু সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র-এই চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে যায়। এক বর্ণের হিন্দুর সাথে অন্য বর্ণের হিন্দুর বিবাহসহ সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুরু হয় নিদারুণ বর্ণবৈষম্য ও শোষণ, যার প্রভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনেও গঠিত হয় বর্ণভিত্তিক একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন। যেমন, 'তফসিলী হিন্দু ফেডারেশন'। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথার প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে খ্রিস্টানদের মধ্যেও ধর্মীয় মতানৈক্য বা আন্তঃকোন্দল প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের একটি অংশ প্রতিবাদ করে মূলধারা থেকে বেরিয়ে যায়। প্রতিবাদ করে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে এই শ্রেণীর নামকরণ করা হয় 'প্রোটেস্ট্যান্ট' যারা 'পিউরিটান' নামেও পরিচিত। মূলধারার খ্রিস্টানগণ পরিগণিত হন 'ক্যাথলিক' নামে। পরবর্তীতে এই প্রোটেস্ট্যান্টরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় বসতি গড়ে তোলে এবং সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সেখানকার রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত 'রিপাবলিকান পার্টি' সবসময় পিউরিটানদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। 'এই কট্টর পিউরিটান এবং রক্ষণশীল ব্যাংকার্স-ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ২৮ বছরের মধ্যে ২০ বছরই ক্ষমতায় থেকেছে রিপাবলিকানরা। মাঝখানের ৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন ডেমোক্রেট বিল ক্লিনটন।'[২৪] পক্ষান্তরে ক্যাথলিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে ইউরোপে, যাদের ধর্মগুরুকে বলা হয় পোপ।

৭.৩ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সম্ভাবনা ঃ উপরে বর্ণিত সমস্যা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বেশ কিছু সম্ভাবনা ও তার কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সম্ভাবনা ও তার কারণসমূহ পর্যালোচনা করা হলো :

(১) আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন ঃ প্রাথমিক ইসলামী যুগে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা ছিল বহুলাংশে গণতান্ত্রিক। জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাঁর শাসনতান্ত্রিক উপাধি ছিল 'খলিফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন একইসাথে আল্লাহ্‌র ও জনগণের প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের রব, তার ফেরেস্তাদের বলেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করছি।'[২৫] প্রফেসর স্যানটিলানা-র ভাষায়, 'Islam is the direct government of Allah, the rule of god, whose eyes are upon his people. The principle of unity and order which in other societies is called civitas, polis. State, in Islam is personified by Allah. Allah is the name of supreme power, acting in the common interest. Thus the public treasury is the `treasury of Allah the army is the army of Allah, even the public functioneries are the `employees of Allah'.[২৬] হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর ইসলামী রাষ্ট্রের পরবর্তী চারজন খলিফা (যারা ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে পরিচিত) নির্বাচনেও এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হলো এবং 'খলিফা' পদটি উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকৃত হতে থাকল। শাসকশ্রেণী দাবী করতে লাগল, খলিফা রাসুলের সব ক্ষমতার অধিকারী। ইসলামী রাজনৈতিক জুরিসপ্রুডেন্স খলিফাকে শাসক হিসেবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকার দিয়ে ফেলল আর প্রজাদের অধিকার থাকল শুধু শাসিত হবার। খলিফার নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা কিংবা নাগরিকদের অধিকার কেবলমাত্র থিওরিতে পরিণত হলো। খলিফাগণ শুধু নিজের, পরিবারের, গোত্রের এবং বংশধরদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।'[২৭] ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্রের শাসনকর্তা নির্বাচনের পদ্ধতিও রূপান্তরিত হলো মনোনয়নে। 'খলিফা' পদবী রূপান্তরিত হলো 'আমীর', 'সুলতান' কিংবা 'বাদশা'-তে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দেখা যায়, ইংরেজদের হাতে ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যিনি সর্বশেষ মোঘল বাদশা হিসেবে রাজত্ব করেছেন, সেই বাহাদুর শাহও ছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনয়নপ্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

শাসক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আইনকানুন, শাসনপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়-যার প্রভাবে একটি তরুণ, উদীয়মান শিক্ষিতশ্রেণীর উত্থান ঘটে। এই আধুনিক শিক্ষিতশ্রেণীর হাত ধরেই ভারতবর্ষে সূচিত হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যার প্রভাবে ভারতবিভক্তির পর ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে। প্রাচীন ভারতের অশোক বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতিতে গণতন্ত্রের প্রচলন না থাকায় ভারতের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য এই শাসনব্যবস্থা যতখানি নতুন ছিল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য তা ততখানি নতুন ছিল না। কারণ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপজীব্য ধর্ম হলো ইসলাম, যার মূলে ঐতিহাসিকভাবেই গণতান্ত্রিক চেতনা প্রবহমান। আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ইসলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকার কারণে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(২) সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন ঃ মানব সমাজ ও সভ্যতা ক্রমবিবর্তনশীল। এই ক্রমবিবর্তনের জন্য মানুষকে বহু সংস্কার ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কাল যা ধ্রুব, আজ তাকেই মূল্যহীন হিসেবে পরিত্যাগ করতে হয়। এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম। যে সমাজ এ নিয়মের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সে সমাজই স্থবির হয়ে গেছে। এ বিষয়টি রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মূলতঃ ইসলাম ধর্ম কেন্দ্রিক। ইসলাম ধর্মে সংস্কারবিমুখ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। হাদিস শরিফে আছে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'প্রতি একশত বছর পর পর একজন করে সংস্কারক আবির্ভূত হন। তাঁরা ধর্মের অসার কুসংস্কারগুলো দূর করতে চেষ্টা করেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার পর কোন নবুয়ত নেই, শুধু আছেন সংস্কারকগণ।[২৮] এছাড়া ইসলাম ধর্মে আইনের যে চারটি উৎস নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি হলো : (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ (৩) ইজমা ও (৪) কিয়াস। তার মধ্যে 'কিয়াস' হচ্ছে, সকল যুগে পরিস্থিতির নিরিখে সমসাময়িক আলেম ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধান। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত বিভাগোত্তর পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রথম থেকেই চরম রক্ষণশীল, অনড় ও সংস্কারবিমুখ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমসাময়িক বিশ্বকে উপেক্ষা করে নারী ও অমুসলিমদের রাজনীতির বাইরে রাখতে সচেষ্ট হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে জমিয়তে উলামার মাওলানা আবুল হাসনাত, সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী এবং তালিমাতে ইসলামিয়া বোর্ড যে সকল দাবী উত্থাপন করেন, তার সারবত্তা ছিল : (১) অমুসলিমদের জিম্মি হয়ে থাকতে হবে, (২) নির্বাচনে নারীর ভূমিকা থাকবে না। মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী দাবী করেন, 'প্রচলিত সব আইনকে ভেঙে শরিয়াহ্ আইনের সাথে সমন্বয় করতে হবে। সামরিকবাহিনীতে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোন অমুসলিম কর্মচারী থাকবে না। আইন প্রণয়নের এদের কোন অংশীদারিত্ব থাকবে না।' তালিমাতে ইসলামিয়া বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করে, 'নারী ও অমুসলিমদের ভোটের অধিকার থাকা চলবে না।'[২৯] পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এই সংস্কারবিমুখ অনড় ভূমিকার কারণে পাকিস্তানের শাসকচক্র তাদের সংবিধানে একাধিক অগণতান্ত্রিক বিধান সন্নিবেশিত করতে বাধ্য হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের আহমদিয়া সম্প্রদায়কে 'অমুসলিম' ঘোষণা করা হয়। '১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে পেনাল কোডের ২৯৮-বি এবং ২৯৮-সি ধারা সংশোধন করে 'ব্লাসফেমি আইন' নামে একটি নতুন আইন জারি করা হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে পাকিস্তানী 'অমুসলিম'দের ব্যক্তিগত কারণেও হত্যা করার বিধান চালু হয়।'[৩০] কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে এই সংস্কারবিরোধী অনড় অবস্থান থেকে সরে আসতে হয়েছে-রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়েছে। ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। বিশ্ব ফুটবলের শাসক সংস্থা ফিফার চাপে ফুটবলে মহিলাদের অংশগ্রহণকেও বৈধ ঘোষণা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও যুগের দাবির প্রেক্ষিতে উদার ও সংস্কারমুখি চরিত্র অর্জন করে বিশ্ব রাজনীতির পরিমন্ডলে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ধারা হিসেবে তার চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন ঃ মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন যে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য অপরিহার্য শর্ত। যে রাজনীতি মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় না, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে 'রাজনীতি' হিসেবে সংজ্ঞাভুক্ত করা হয় না–তাকে বলা হয় 'দুষ্টচক্র', `Contery' বা `Faction'। আমরা জানি, বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মূলত ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক। ইসলাম ধর্মের মূলনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে সকল প্রকার মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদে' জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার ও মর্যাদার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন, জীবন রক্ষণের অধিকার, সম্পদের অধিকার, মানসম্মানের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার, সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সভাসমিতির অধিকার, জীবন ধারণের মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা লাভের অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, হালাল উপার্জনের অধিকার, এতিম-অসহায়দের অধিকার ইত্যাদি। জীবন রক্ষার অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সমগ্র মানবগোষ্ঠিকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠিকে প্রাণে রক্ষা করল।'[৩১] এছাড়া ইসলাম সব মানুষের বৈধভাবে সম্পদ অর্জন, আয়, ব্যয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের অধিকার দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।'[৩২] মানসম্মানের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে।'[৩৩] ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।'[৩৪] আইনের দৃষ্টিতে সমতার ব্যাপারে পবিত্র হাদিস বর্ণিত আছে, 'উচ্চ বংশ, নিচু বংশ, প্রভাবশালী ও প্রভাবহীন সবাই আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে সমান।' নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'পুরুষ যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্য আর নারী যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্য।'[৩৫] জীবিকা গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা পবিত্র ও উত্তম বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের জীবিকারূপে দিয়েছি।'[৩৬] এতিম অসহায়দের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো, 'তোমাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী (গরিব) ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।'[৩৭] সুতরাং ইসলাম ধর্মে মৌলিক মানবাধিকারের যে বিধান রয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'জেনেভা কনভেনশন'-এর সাথে তার কোন পার্থক্য বা বিরোধ নেই। সুতরাং আধুনিক বিশ্বের মৌলিক মানবাধিকারের অঙ্গীকারকে দলীয় গঠনতন্ত্র ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ার কারণে এ রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

(৪) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী অবস্থান ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মেই সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের সমর্থন নেই। এই ধর্মগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রবর্তকদের অহিংস প্রচার, ক্ষমা ও মহানুভবতার মাধ্যমে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে নিজ গোত্র ও সমাজের লোকজন দ্বারা সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করেছেন, কিন্তু কখনও কাউকে পাল্টা আঘাত করেননি। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার কারণে তায়েফবাসী তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করে। আর মহানবী (সঃ) সিজদায় পড়ে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ্, এরা না বুঝে আমার ওপর অত্যাচার করছে, তুমি তাদের শাস্তি দিও না, তাদের ক্ষমা করো এবং সত্য উপলব্ধি করার শক্তি দান করো।'[৩৮] ইতিহাস থেকে জানা যায়, 'হাব্বার বিন আসওয়াদ মহানবীর প্রিয় দুহিতা জয়নাবকে মদীনার পথে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাশবিক অত্যাচার করেছিল। যার ফলে তিনি মারা যান। মক্কা বিজয়ের পর এহেন মহাপাপীকেও মহানবী ক্ষমা প্রদর্শন করলেন।'[৩৯] ইসলাম গ্রন্থের মূল গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় বা সন্ত্রাস করে বেড়াবে না।'[৪০] 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সমগ্র মানবগোষ্ঠিকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠিকে প্রাণে রক্ষা করল।'৪১ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।'৪২ খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট শত্রুকে ভালবাসতে বলেছিলেন।৪৩ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধও এই শিক্ষা দিয়েছিলেন।৪৪ পার্সী ধর্মের প্রবর্তক জরথুস্ত্রের মতে, 'দুঃখ, কষ্ট, বিরোধ, হত্যাকান্ড ইত্যাদি কুদেবতার সৃষ্টি।'৪৫

(৫) সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অবস্থান ঃ ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে বিশ্বের বহু দেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটলেও বিশ্বের কোন ধর্মেই সাম্প্রদায়িকতার প্রতি সমর্থন জানানো হয়নি। বরং প্রতিটি ধর্মই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্মকে মেনে নিয়েছে। আসগর খানের ভাষায়, 'যে ইসলামের মূল আহ্বান ন্যায়, বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা, তার সাথে সাম্প্রদায়িকতার বা সংকীর্ণতার কোন সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক সুবিধাবাদই ইসলামীকরণের প্রধান ভিত্তি।'৪৬ পবিত্র কুরআন মজিদে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : 'ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক। অবশেষে যে ব্যক্তি ভ্রান্তির পথ ছেড়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে, সেই প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী।'৪৭ 'এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি দেবে না, কেননা, তারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে।'৪৮ 'এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য তো একই এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'৪৯ 'মানুষ (আদিতে) ছিল একজাতি। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করলো)। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করতো।'৫০ 'এই যে তোমাদের জাতি-এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার উপাসনা কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা মতাদর্শ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করেছে।'৫১ 'এবং তোমাদের এই যে জাতি, এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।'৫২ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করার পর মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তা-ও ছিল অসাম্প্রদায়িক। উক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মদিনার ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে যে আন্তঃসম্প্রদায় চুক্তি (যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে পরিচিত) সম্পাদিত হয়, তাতে বলা হয় : 'প্রত্যেক ব্যক্তি (সে ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, সাবিয়িন হোক বা মুসলিম) তার নিজস্ব ধর্ম পালন করার অধিকার পাবে এবং রাষ্ট্রের মূল কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন সাধারণ জনগণ দ্বারা, আর সংখ্যালঘুকে দেয়া হবে সংখ্যাগুরুর মতো সমস্ত অধিকার। মানবজীবনে যে সব মূল্যমানের সৃষ্টি হবে, তারই আলোকে মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'৫৩ ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এর নজির আছে। দক্ষিণ ভারতের মহীশুরের নৃপতি টিপু সুলতান (১৭৮৩-১৭৯৯) ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। তিনি সরকারীভাবে 'খুদাদাদ সরকার', 'আহমাদি সরকার', 'আসাদ ইলাহী সরকার' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন এবং তাঁর প্রাসাদের দরজায় আরবি ভাষায় তাঁকে 'ধর্মের রক্ষক' ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠতম অসাম্প্রদায়িক শাসক। তাঁর সরকারের প্রধানমন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দুর্গের ফৌজদার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগপ্রাপ্তরা সবাই ছিলেন হিন্দু। তিনি হিন্দুদের মন্দিরে ভূমিদান করেন, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অর্থদান করেন।৫৪ বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশ, কাল ও জাতি নির্বিশেষে সকল নবী, রসুল ও অবতার একই ধর্ম প্রচার করে গেছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে : এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে রসুল প্রেরণ করা হয়নি।৫৫ তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় প্রচারকার্য চালিয়ে গেছেন।৫৬ সকল নবী অবতারের বেলায় একই সনাতন নিয়ম কার্যকর ছিল।৫৭ পরবর্তীকালে ধর্ম নিয়ে মতভেদ করে মানুষ নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে।৫৮ যারা ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের সাথে নবীর কোন সম্পর্ক নেই।৫৯ বারবার দুষ্ট শয়তান প্রকৃতির মানুষ ধর্মকে বিকৃত করেছে, আর বারবার আল্লাহ্তা'লা তা দূর করার ব্যবস্থা করেছেন।৬০ ধর্ম নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো মানুষ পূর্ব-সংস্কারের বশবর্তী হয়ে সমাগত সত্যকে গ্রহণ করে না।৬১ এই বিশ্বের স্রষ্টা এক এবং তাঁর ধর্মও এক। এইজন্যই একত্ববাদ বা তৌহিদ হলো সত্যধর্মের মেরুদন্ড। এই বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি মূলগতভাবে এক ও অভিন্ন। ৬২, কারণ, মানুষ এক আল্লাহ্রই সৃষ্টি। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সকল নবীকে মান্য করেও মাত্র একজনকেও যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে তা পূর্ণ বিশ্বাস বলে গণ্য হবে না।৬৩ 'এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী আগমন করেনি।৬৪ 'এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন না কোন দূত প্রেরণ করেছিলাম।৬৫ 'আমরা রাসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।৬৬ সনাতন বা হিন্দু ধর্মেও সাম্প্রদায়িকতা পরিহারের জন্য কঠোর নির্দেশ রয়েছে। কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে :

'যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদন্বিহ
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমোপ্নোতি
যইহনানেব পশ্যতি।'৬৭

অর্থাৎ, যা কিছু এখানে, তার সমস্তই ওখানে, যা ওখানে তার মতো সমস্তই এখানে। যে জন এখানে এবং ওখানের মধ্যে ভিন্ন করে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি
এবং ধর্মান পৃথক পশ্যংস্তানেবানু বিধাবতি।'৬৮

অর্থাৎ পর্বতের কোন উচ্চতম দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টি হলে তা যেমন নানা ধারায় বিকীর্ণ হয়ে পর্বতের নিম্নপ্রদেশে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি বিভিন্ন দেহের ধর্মানুসারে আত্মাকেও পৃথক পৃথক বলে দর্শন করে, সেও ঐ সকল ধর্মের অনুসরণ করে।'

সুতরাং, ধর্মের মূল নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুধাবন ও অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আধুনিক বিশ্বের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

(৬) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সমর্থন ঃ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মূলতঃ আবর্তিত হয়ে থাকে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে। ইসলামের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই ছিল, 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।'৬৯ পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, যে সব জাহাজ মানুষের লাভের জন্য সাগরে চলাচল করে, তাদের মধ্যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর বায়ু সকলের প্রবাহের মধ্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মেঘের গমনাগমনের মধ্যে জ্ঞানী লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।'৭০ অথচ 'সেই সময় কোন মুসলিম জ্ঞান ভান্ডার ছিল না। সুতরাং পড়া মানে ছিল যা কিছু পাওয়া যায় তা-ই পড়া। প্রথম দিকের মুসলিমরা বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ ও দার্শনিকদের লেখা পড়েছিলেন। তারা ইরানী, ভারতীয় ও চীনাদের লেখাও পড়েন। এর ফলে বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। জ্ঞান ভান্ডারে মুসলিম পন্ডিতগণ নিজেদের অবদান যোগ করেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও গণিতের বিভিন্ন শাখায় নতুন শাখা-প্রশাখা গড়ে তোলেন। তারা প্রবর্তন করেন সংখ্যা। ফলে সহজ ও সীমাহীন অংক কষা সম্ভব হয়।'৭১ সে সময় বাগদাদ-কায়রো-কর্ডোভায় খ্রিস্টান-ইহুদীরা পড়াশোনা করতে আসতো। তখন ইসলামী শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। যার স্মৃতি হিসেবে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা ১৯৩৫ সালে চাঁদের সাতটা মুখকে মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে নামকরণ করে। মার্মাডিউক পিকথলের ভাষায়, 'In its grandeur and in its decadance, Islamic Culture whether we survey it in the field of science or of art, or of literature or of social welfare has everywhere and always is religious inference, this all-pervading ideal of universal and complete theocracy...It is this which makes Islamic nationalism one with internatonalism.'৭২ কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে ইসলামের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনা সীমাবদ্ধ করা শুরু করেন। তারা শুধুই ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তারা জোরালো ভাবে দাবি করেন, যারা ধর্ম শিক্ষায় মন দেবেন, বিশেষত ইসলামী আইন পড়বেন, শুধু তারাই পরকালে লাভবান হবেন। ফলে ইসলাম এমন একটি সময়ে বুদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে, যখন ইউরোপ অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক জ্ঞান আহরণ শুরু করে। এ প্রসঙ্গে আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, 'কোরআনের সত্য এবং মৌলিক বাণীগুলো বুঝতে এবং সেসব ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়া মুসলিমদের জন্য শুধু দুর্ভাগ্যই বয়ে এনেছে। পড়া শুধু ধর্ম শিক্ষার মধ্যে সীমিত রেখে এবং আধুনিক সায়েন্সকে অবহেলা করে আমরা ইসলামী সভ্যতাকে ধ্বংস করেছি এবং পৃথিবীতে আমাদের পথ হারিয়ে ফেলেছি।'৭৩ সুতরাং ইসলামের মৌলিক নির্দেশানুযায়ী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ব্যাপক গুরুত্বারোপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তার গ্রহণযোগ্যতা ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে পারে।

(৬) ওআইসির বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন ও মক্কা ঘোষণা ঃ সৌদি আরবের বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আজিজ আল সউদের উদ্যোগে ৭ ও ৮ ডিসেম্বর পবিত্র নগরী মক্কায় অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে ৫৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে যে ঘোষণা গৃহীত হয়েছে, তাতে যে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানানো হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সেখানে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে : সদস্য রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসীদের যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য সমর্থন বা অর্থ জোগান দেয়া থেকে বিরত থাকবে। সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে কোন ধর্ম, বর্ণ বা দেশকে সম্পৃক্ত করা হবে না। উক্ত সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসবাদ দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেছে। এছাড়া সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের ওপর সমর্থন জানানো ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মক্কা ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, 'ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে কিছু দেশ মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এবং সকল ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সব সরকারকে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নিতে হবে। সদস্য দেশগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে নিরপেক্ষ স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয় মক্কা ঘোষণায়। মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি ইসলামী সনদ স্বাক্ষরের উপর জোর দেয়া হয়। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামে মানবাধিকার সংক্রান্ত 'কায়রো ঘোষণা' বাস্তবায়ন করার কথাও বলা হয় মক্কা ঘোষণায়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে কোন ধরনের সন্ত্রাস দমনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষায় টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তাব রাখেন।৭৪ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ওআইসি-র তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা (যা মক্কা ঘোষণা নামে পরিচিত) ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য এর তাৎপর্য অপরিসীম। মক্কা ঘোষণার আলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সন্ত্রাসবিরোধী সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো সকল প্রকার নেতিবাচক ভাবমূর্তির সংকট থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৮১।
২। The Writings of Ashmawy, University Press of Florida, USA, 1998।
৩। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ, ২০০৫, পৃঃ ১৮।
৪। দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০০৫।
৫। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ৯, ০৬ ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃঃ ২৬-২৭।
৬। Islam in Asia, Edited by John L. Esposito, Oxford University Press, 1987, P. 3।
৭। গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িককতা, জুন ১৯৯১, কলিকাতা, পৃ: ১৫।
৮। ওরিয়েন্ট লংম্যান, নতুন দিল্লী, ১৯৭৪
৯। গোপালকৃষ্ণ, রিলিজিয়ন ইন পলিটিক্স, ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল হিস্টরি রিভিউ, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৭১, পৃ: ৩৯২-৩৯৩।
১০। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২, সংখ্যা ১০, পৃ: ১৯
১১। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া : এ সোশাল অ্যানালিসিস, লন্ডন, ১৯৪৫,পৃ: ১৪৭
১২। ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, ইন্ডিয়া এজ আ সেকুলার স্টেট, প্রিন্সটন, ১৯৬৩, পৃ: ৪৫৪।
১৩। Hans J. Morgenthu, Military Illusions : The New Republic, Washington D.C. March 19, 1956, P.14-16।
১৪। গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, কলিকাতা, জুন ১৯৯১, পৃ: ৭২ ও ৭৯।
১৫। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ৯৮-৯৯।
১৬। ৯/১১ : চার বছরে কত নিরাপদ বিশ্ব?, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), দৈনিক প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।
১৭। গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িককতা, জুন ১৯৯১, কলিকাতা, পৃ: ১৫।
১৮। Islam in Modern History, Amentor Book, 1957, p. 90
১৯। খেলাফত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
২০। সাহাবা চরিত-১, অনুবাদ-আখতার ফারুক, ইসলাম ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ১৯৭৭।
২১। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ২২৩।
২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।
২৪। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ০৩, ১৯ অক্টোবর ২০০৪, পৃ: ৩০।
২৫। কুরআনুল করিম, ২:৩০।
২৬। Legacy of Islam, Edited by Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, P. 286।
২৭। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৫৩।
২৮। মহানবী, ডঃ ওসমান গণি, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, পৃঃ ১০।
২৯। বাংলাদেশের রাজনীতির চারদশক, এস, সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা, পৃ: ১৯, ৩৪, ৩৫।
৩০। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৩০।
৩১। কুরআনুল করিম, সুরা আল-মায়েদা, আয়াত-৩২।
৩২। কুরআনুল করিম, সুরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৮।
৩৩। কুরআনুল করিম, সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত-১১
৩৪। কুরআনুল করিম, সুরা আল-বাকারা, আয়াত-২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। কুরআনুল করিম, সুরা নিসা, আয়াত-৩২
৩৬। কুরআনুল করিম, সুরা আল-বাকারা, আয়াত-১৭২
৩৭। কুরআনুল করিম, সুরা আল-যারিয়াত, আয়াত-১৯
৩৮। *ইসলাম শান্তির ধর্ম, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির নয়,* ডঃ আ ন ম রইছ উদ্দিন, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০০৬।
৩৯। মহানবী, ডক্টর ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৮, পৃ: ৪৬২
৪০। কুরআনুল করিম, ২:৬০, ৭:৭৪, ২৬:১৮৩, ২৯:৩৬
৪১। কুরআনুল করিম, সুরা আল-মায়েদা, আয়াত-৩২
৪২। কুরআনুল করিম, সুরা মায়েদা, আয়াত-৩৩
৪৩। মথি ৫:৪৪
৪৪। Science of Religion, Muller, P. 549
৪৫। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা,* অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ৬৬
৪৬। Islam, Politics and the States : The Pakistan Experience, Edited by Mohd. Asghar Khan, Published by Zed Books, London।
৪৭। কুরআনুল করিম, সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৬
৪৮। কুরআনুল করিম, সুরা আনআম, আয়াত-১০৮
৪৯। কুরআনুল করিম, সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬
৫০। কুরআনুল করিম, সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩
৫১। কুরআনুল করিম, সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৯২
৫২। কুরআনুল করিম, সুরা মোমেনুন, আয়াত ৫২-৫৩
৫৩। সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা,* অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, পৃ: ১৮৫।
৫৪। ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা, গৌতম নিয়োগী, জুন ১৯৯১, কলিকাতা, পৃঃ ১৮৫-১৮৬।
৫৫। কুরআনুল করিম, সুরা ইউনুস : ৪৭
৫৬। কুরআনুল করিম, সুরা ইব্রাহিম : ৪
৫৭। কুরআনুল করিম, বনি ইস্রাইল : ৭৭
৫৮। কুরআনুল করিম, সুরা রুম : ৩২
৫৯। কুরআনুল করিম, সুরা আনআম : ১৫৯
৬০। কুরআনুল করিম, সুরা হজ্ব : ৫২
৬১। কুরআনুল করিম, সুরা সাদ:৭
৬২। কুরআনুল করিম, সুরা বাকারা : ২১৩
৬৩। কুরআনুল করিম, সুরা নিসা : ১৫০
৬৪। কুরআনুল করিম, ৩৫:২৫
৬৫। কুরআনুল করিম, ১৬:১৭
৬৬। কুরআনুল করিম, ২:২৮৬
৬৭। কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮১ নং শ্লোক
৬৮। কঠ উপনিষদ, ২য় অধ্যায়, ৮৫ নং শ্লোক
৬৯। কুরআনুল করিম, সুরা আলাক, আয়াত-১
৭০। কুরআনুল করিম, সুরা বাকারা, আয়াত-১৬৪
৭১। দৈনিক ব্যাংকক পোস্ট-এর ৯ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের পোস্ট-এডিটোরিয়াল, রচনা : মাহাথির মোহাম্মদ, সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ০৯, ০৬ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ: ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৭২। Marmaduke Pickthal, *Islamic Culture,* p. 20।

৭৩। দৈনিক ব্যাংকক পোস্ট-এর ৯ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের পোস্ট-এডিটোরিয়াল, রচনা : মাহাথির মোহাম্মদ, সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ০৯, ০৬ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ: ৩০।

৭৪। মক্কা ঘোষণা, সন্ত্রাস দমন এবং কিছু কথা, মোস্তফা কামাল, দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

৭.০ উপসংহার

৭.১ সাধারণ ঃ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধর্মীয় রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা মনে করতে থাকে যে, পাকিস্তান ভেঙে গেলে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে। এমনকি তারা এই সন্দেহও পোষণ করতে থাকে যে, ভারতের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে এ দেশটিকে একটি ভারত নির্ভর দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করবে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এ সকল বিষয় সামনে রেখে তারা সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ সময়ে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের (যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে) রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ বেআইনী ঘোষিত হলেও তারা পর্দার অন্তরালে গোপনে তাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জিইয়ে রাখে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান ও তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ ঘোষিত হয়। এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোও সামরিক সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখনও তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকে। এরশাদের শাসনামলে সাত দল ও পনের দলের যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে অবস্থান নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এছাড়া ইসলামী ঐক্যজোট এ নির্বাচনে ১টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলে তারা (জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট) সরকারে মন্ত্রীত্বের পদ না নিয়ে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের সরকার বিরোধী আন্দোলনকালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরীক হয়। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ করে। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে জামায়াতে ইসলামীও অন্যতম শরীক দল হিসেবে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে। অতঃপর ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরায় ১৮টি আসন লাভ করে চারদলীয় সরকারের অন্যতম শরীক দল হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধারা ক্রিয়াশীল

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে এর সকল আন্তঃস্রোত বা ধারার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব একটি এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মেলবন্ধনে যুক্ত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সে কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হচ্ছে।

৭.২ এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা প্রাপ্তিসমূহ ঃ এই গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পটভূমি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তার গতি-প্রকৃতি, ভূমিকা ও ফলাফল সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। তাছাড়া বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কেও জানা যাবে।

প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। উক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তানের অধিকাংশ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে নরহত্যা ও লুণ্ঠনে সহযোগিতা করে। যার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে, যারা ১৯৮২-১৯৯০ সালের এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন ভারতের আর্য-শাসকশ্রেণীর হাতে যে ধর্মভিত্তিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির গোড়াপত্তন, তারই ধারাবাহিকতায় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব (বাদশাহ্ আলমগীর উপাধিধারী) কর্তৃক আপন ভ্রাতাকে 'মুরতাদ' ফতোয়াদানপূর্বক ভ্রাতৃহত্যার মাধ্যমে রাজ সিংহাসন দখল করার ঘটনা ঘটে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে। উপমহাদেশের বহু ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধূর্ত ইংরেজ শাসকগণ 'Devide and rule' পদ্ধতির সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। নিজেদের দেশে সংসদীয় শাসনপদ্ধতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে তারা একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার কায়েম করে। একইভাবে নিজেদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা থাকলেও এ উপমহাদেশে তারা স্বীয় ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য কৌশলে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। ফলে ১৮৫৭ সালে তার প্রতিক্রিয়ায় সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৯৪৬ সালে সংঘটিত হয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিককতায় ১৮৮৫ সালে হিন্দু নেতৃত্বনির্ভর রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। পরবর্তীতে মুসলিম নেতৃত্বনির্ভর রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর নেতৃত্বে গঠিত হয় জামাতে ইসলামী নামক আরও একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত বিভাগের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র পবিত্র ধর্মের নামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠির উপর নানা বৈষম্য ও নিপীড়ন শুরু করে। তৎকালীন সময়ের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো শাসকশ্রেণীর এই কার্যকলাপকে

Dhaka University Institutional Repository

নানাভাবে সমর্থন জানায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। যার কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে, যারা বিগত ৩০ বছরের রাজনীতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় অধ্যায় থেকে বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদ ও নির্বাচনী ফলাফলের আলোকে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালের পঞ্চম সংশোধনীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা'-কে প্রতিস্থাপিত করা হয়। তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের পথ সুগম হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি অংশগ্রহণ করতে থাকে। সর্বশেষ ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির সাথে জোটবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীসহ বাংলাদেশের প্রধান ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের আলোকে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তার প্রশ্নে স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে বিতর্ক চলছে। সেই বিতর্কের নিরসন আজও হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭২ সালে রচিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির মধ্যে 'জাতীয়তাবাদ'কে একটি মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জাতিগতভাবে 'বাঙালি' বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানের 'পঞ্চম সংশোধনী আদেশ, ১৯৭৮' মোতাবেক বাংলাদেশের নাগরিকগণের জাতীয়তা 'বাংলাদেশী' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সংবিধানের এই পঞ্চম সংশোধনী আদেশের পর থেকে বাংলাদেশে জাতীয়তার বিতর্ক তীব্রতর হয়। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী মহল জাতীয়তার বিতর্কে জড়িয়ে সুস্পষ্ট দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক পক্ষ 'বাঙালি' এবং অন্যপক্ষ 'বাংলাদেশী' জাতীয়তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোও উক্ত বিতর্কে জড়িয়ে যায়। তাদের একটি অংশ (যেমন, মুসলিম লীগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি) 'বাংলাদেশী' জাতীয়তার পক্ষে, একটি অংশ (যেমন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ) 'বাঙালি' জাতীয়তার পক্ষে এবং অবশিষ্ট অংশ (যেমন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন) বিবদমান কোনো দলেই না গিয়ে 'মুসলিম' জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে। এই অধ্যায়ে ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়েও জানা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে জানা যায় বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও একমুখি বিশ্বব্যবস্থা বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভাবমূর্তি নির্মাণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই সাথে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসী তৎপরতাও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (যা মার্কিন জনগণের নিকট নাইন-ইলেভেন হিসেবে পরিচিত) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে পরিচালিত ভয়াবহ আত্মঘাতি সন্ত্রাসী হামলা গোটা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিধারা পাল্টে দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় আল-কায়েদার দুর্গ বলে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত আফগানিস্তানে শুরু হয় মার্কিন বাহিনীর নজিরবিহীন অভিযান। কিন্তু আল-কায়েদার প্রধান সংগঠক ও কর্ণধার ওসামা বিন লাদেন ও তার প্রধান সহযোগী মোল্লা ওমর ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। ২০০২ সালে লাদেনের সাথে সখ্য ও পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার অভিযোগে মার্কিন সামরিক হামলা চালানো হয় ইরাকে। যার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কিন্তু যে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য এত নজরদারী, এত অভিযান, তার কিছুই আল-কায়েদাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। নাইন-ইলেভেনের পর ইন্দোনেশিয়ার বালি, মিসরের শারম আল শেখ, ভারতের পার্লামেন্ট ভবন, স্পেনের মাদ্রিদ, ব্রিটেনের লন্ডন, পাকিস্তানের করাচি, বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। বাংলাদেশে সহিংস সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের ক্রমউত্থান, যার ব্যাপকতায় আন্তর্জাতিক বিশ্বের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বাংলাদেশের উপর। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে উচ্চারিত হয়েছে উদ্বেগ ও সতর্কবাণী। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৪টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনকে রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সহিংস সন্ত্রাসের পাশাপাশি ইসলামী জঙ্গী সন্ত্রাসের প্রভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালের দুটি নির্বাচনে (দিনাজপুর-১ উপনির্বাচন ও সাতকানিয়া পৌর নির্বাচন) তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পূর্বের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বিজয়ী হলেও বর্তমান নির্বাচনে তারা পরাজিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা যায়। সেই সাথে আগামী দিনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সম্ভাব্য ভূমিকা ও অবস্থান কি হতে পারে সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নিম্নলিখিত চরিত্রগত, মাত্রাগত ও গুণগত সমস্যা বিদ্যমান ঃ

(ক) নৃতাত্ত্বিক সমস্যা ঃ নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বাঙালি ছাড়াও সাঁওতাল, গারো, মুরং, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, হাজং, রাখাইন ইত্যাদি বহু উপজাতি বা এথনিক গ্রুপে বিভক্ত। প্রতিটি এথনিক গ্রুপের রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম। অপরদিকে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো কেবল মাত্র নিজ নিজ ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, যা নানা ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারছে না ।

(খ) ইমেজ সংকট ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বর্তমানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে তীব্র ইমেজ সংকটের সম্মুখীন। একদিকে ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী অব্যাহত জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের বিস্তার, অপরদিকে উক্ত সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিমা ও আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম কর্তৃক অব্যাহতভাবে ধর্মভিত্তিক যে কোন রাজনীতিকেই 'মৌলবাদী সন্ত্রাস' হিসেবে অভিহিত করার কারণে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ইমেজ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে, যা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটছে না।

(গ) ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মৌলবাদের প্রসার ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যখন যে ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, সে ধর্মকে সমাজের আর সকল ধর্মের উপর স্থান দিয়ে থাকে। নিজ ধর্মের প্রতি এই অন্ধ ও যুক্তিহীন দলীয় সমর্থন থেকে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় গোঁড়ামি বা মৌলবাদ যা শেষ বিচারে সহিংস হানাহানির জন্ম দেয়।

(ঘ) সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি ও বিকাশ ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই রাজনীতি একই সময়ে একাধিক ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে ধর্মভিত্তিক একাধিক বিভাজন সৃষ্টি হয়। উক্ত বিভাজন থেকে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উন্মাদনা যা সমাজকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়।

(ঙ) ঐতিহাসিক কার্যকারণজনিত সমস্যা ঃ বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে সকল ধর্মকে আশ্রয় করে আবর্তিত হয়, সে সকল ধর্মের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তিক্ততা রয়েছে- যা এ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এই ঐতিহাসিক তিক্ততা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে পাশাপাশি আন্দোলনরত একাধিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের 'রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ' বিতর্ক এবং খ্রিস্টীয় ১০৯৫-১২৯১ কালপর্বের মুসলিম বনাম খ্রিস্টান শক্তির ক্রুসেডের কথা বলা যায়।

(চ) রাষ্ট্র ও সমাজের বাস্তব সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থতা ঃ বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের সামনে যে সকল নতুন নতুন সমস্যা রয়েছে, যেমন, গ্রিনহাউজ সমস্যা, আর্সেনিক সমস্যা, পারমাণবিক সমস্যা, এইডস রোগের সমস্যা ইত্যাদির উল্লেখ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে না থাকায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর চোখে তা আদৌ কোন সমস্যা নয়। এভাবে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করে এরা কেবলমাত্র ধর্মীয় ইস্যুভিত্তিক রাজনীতিতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখছে। ফলে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

(ছ) ধর্মীয় মতপার্থক্য ও উপদলীয় কোন্দল ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি অন্যতম সমস্যা হলো, অভিন্ন ধর্মের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য ও উপদলীয় কোন্দল। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-এর হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে গোটা মুসলিম বিশ্ব শিয়া ও সুন্নী-এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্তির ধারাবাহিকতায় উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতকালে সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে চারজন এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বারো জন ধর্মগুরু বা ইমামের আবির্ভাব ঘটে। এই ইমামগণ কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার আলোকে নানা প্রকার মতবাদ বা মযহাবের জন্ম দেন। পরবর্তীতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বিভক্তির সূত্রপাত হয়, যেমন, দ্রুজ (Druze), আলাওয়াইট (Alawite), ওয়াহাবী (Wahabi) ইত্যাদি। এই বিভক্তির প্রতিফলন ঘটে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতেও। যেমন, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে ওয়াহাবী মতবাদের প্রাধান্য এবং অন্যান্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের রাজনীতিতে হানিফী মযহাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরে বর্ণিত সমস্যা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বেশ কিছু সম্ভাবনা রয়েছে :

(ক) আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন ঃ প্রাথমিক ইসলামী যুগে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা ছিল বহুলাংশে গণতান্ত্রিক। জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাঁর শাসনতান্ত্রিক উপাধি ছিল 'খলিফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি। সুতরাং আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ইসলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকার কারণে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(খ) সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন ঃ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মূলতঃ ইসলাম ধর্ম কেন্দ্রিক। ইসলাম ধর্মে সংস্কারবিমুখতার কোন স্থান নেই। ইসলামের বিধান অনুযায়ী হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রতি শতাব্দীতে একজন করে সংস্কারক আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ইসলাম ধর্মে

Dhaka University Institutional Repository

আইনের যে চারটি উৎস নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি হলো : (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ (৩) ইজমা ও (৪) কিয়াস। তার মধ্যে 'কিয়াস' হচ্ছে, সকল যুগে পরিস্থিতির নিরিখে সমসাময়িক আলেম ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত বিধিবিধান। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিও যদি ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও যুগের দাবির প্রেক্ষিতে উদার ও সংস্কারমুখি চরিত্র অর্জন করতে পারে, তাহলে বিশ্ব রাজনীতির পরিমন্ডলে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ধারা হিসেবে তার চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

(গ) মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন ঃ ইসলাম ধর্মের মূলনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে সকল প্রকার মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যার সাথে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'জেনেভা কনভেনশন'-এর কোন পার্থক্য বা বিরোধ নেই। সুতরাং আধুনিক বিশ্বের মৌলিক মানবাধিকারের অঙ্গীকারকে দলীয় গঠনতন্ত্র ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ঘ) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী অবস্থান ঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মেই সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের সমর্থন নেই। এই ধর্মগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রবর্তকদের অহিংস প্রচার, ক্ষমা ও মহানুভবতার মাধ্যমে। সুতরাং, বর্তমানে বাংলাদেশে ও বহির্বিশ্বে ধর্মের নামে সংঘটিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তার অবস্থান পাকাপোক্ত করতে পারে।

(ঙ) সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অবস্থান ঃ ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে বিশ্বের বহু দেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটলেও বিশ্বের কোন ধর্মেই সাম্প্রদায়িকতার প্রতি কোন সমর্থন নেই। বরং প্রতিটি ধর্মই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্মকে মেনে নিয়েছে। সুতরাং, ধর্মের মূল নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুধাবন ও অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আধুনিক বিশ্বের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

(চ) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সমর্থন ঃ বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মূলতঃ আবর্তিত হয়ে থাকে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে যার প্রথম অবতীর্ণ বাণীই ছিল, 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' এর ফলে ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সুতরাং ইসলামের মৌলিক নির্দেশানুযায়ী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ব্যাপক গুরুত্বারোপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তার গ্রহণযোগ্যতা ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে পারে।

(ছ) ওআইসির বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন ও মক্কা ঘোষণা ঃ ২০০৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর সৌদি আরবের মক্কায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) যে বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ। উক্ত সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে নিরপেক্ষ স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি ইসলামী সনদ স্বাক্ষরের উপরও জোর দেয়া হয়। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য এর তাৎপর্য অপরিসীম। মক্কা ঘোষণার আলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সন্ত্রাসবিরোধী সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো সকল প্রকার নেতিবাচক ভাবমূর্তির সংকট থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সুপারিশ ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ভূমিকা গ্রহণের কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অতঃপর নানা ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর থেকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। তার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৫৩টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে যারা এরশাদের সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন (১৯৮২-১৯৯০) এবং ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তিক্ততার পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মতাদর্শিক ও আন্তর্জাতিক সংকটের কারণে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বর্তমানে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখের সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কি-না সেই প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে। এই উদ্ভূত সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকার ও জনগণকে আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার সাথে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যে কোন প্রকার চরম ও হঠকারী সিদ্ধান্ত সংকট সমাধানের পরিবর্তে সংকট আরও ঘনীভূত করবে। উগ্র ধর্মীয় সন্ত্রাসের জন্য ধর্মকে যেমন এককভাবে দায়ী ও নিষিদ্ধ করা যাবে না, তেমনি বহু ধর্মভিত্তিক সমাজে একটিমাত্র ধর্মকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য প্রদান করাও সমীচীন হবে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে গ্রহণ করতে হবে মধ্যপন্থা। ধর্মের নামে পরিচালিত সন্ত্রাসের জন্য ধর্মকে এককভাবে দায়ী ও নিষিদ্ধ করা হলে তার ফল হতে পারে ভয়াবহ। বাংলাদেশের মুজিব হত্যাকান্ড (১৯৭৫), ইরানে শাহের পতন (১৯৭৯) এবং আফগানিস্তানে তালেবানী অভ্যুত্থান (১৯৮৩) তার প্রমাণ। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলে ধর্ম একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে সমাজে ঠিকই টিকে থাকবে এবং বিকৃত উপায়ে স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। সুতরাং, ধর্মের নামে পরিচালিত সন্ত্রাসের জন্য ধর্মকে নয়, চিহ্নিত করতে হবে সন্ত্রাসীকে। পাশাপাশি ধর্মের সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র তুলে ধরতে হবে। এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই। তাদেরকে বহির্বিশ্বের কাছে সুস্পষ্ট করতে হবে যে, তারা জঙ্গী ইসলামী রাষ্ট্র বা 'তালেবান সরকার' চায় না। তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজমের প্রভাব বাড়ছিল, তখন তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামকে ব্যবহার করেছিল এবং ইসলামপন্থী সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামবিরোধী অবস্থানে চলে গিয়েছে। এর পরিণতিতে লিবিয়ার গাদ্দাফি-কে নীরব হতে হয়েছে এবং লকারবি প্লেন ক্র্যাশের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। এর পরিণতিতে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে বিদায় নিতে হয়েছে। এর পরিণতিতে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পতন হয়েছে। এর পরিণতিতে লেবানন থেকে সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে বিদায় নিতে হচ্ছে। সুতরাং, দেশের স্বার্থেই জঙ্গী ইসলাম নয়, একটি উদার ও প্রগতিশীল ইসলামী মতবাদ গ্রহণ করতে হবে সকল ইসলামপন্থীদের। নিকট অতীতে এর নজিরও আছে। জন এফ কেনেডির আগে কেউ ভাবতেও পারেননি একজন ক্যাথলিক হতে পারেন পিউরিটান আমেরিকানদের প্রেসিডেন্ট। সেখানে ২০০৮ সালে উগ্র রক্ষণশীল রিপাবলিকান পার্টি থেকে একজন নারীর প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। যিনি হতে পারেন শ্বেতাঙ্গ হিলারি ক্লিনটন অথবা কৃষ্ণাঙ্গ কন্ডোলিৎসা রাইস। এটা থেকে বোঝা যায়, একটা দেশের রাজনৈতিক দলে কত বড় আদর্শগত পরিবর্তন সম্ভব। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকেও তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে আধুনিক ও গণতান্ত্রিক দল হিসেবে দর্শন ও লক্ষ্যে বড় পরিবর্তন আনতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ধর্মীয় ইমাম ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত 'মক্কা ঘোষণা' অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সন্ত্রাসীদের সকল প্রকার অস্ত্র ও অর্থের উৎস

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ করে দিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে আরও কঠোর 'মানি লন্ডারিং আইন' প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। সেই সাথে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত চৌকির (BOP) সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিডিআর সদস্যদের অধিকতর উন্নত ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। এছাড়া অবশিষ্ট আন্তর্জাতিক সীমান্তও দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে।

(খ) 'মক্কা ঘোষণা' অনুযায়ী 'সন্ত্রাসবাদ দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংক্রান্ত 'ইসলামী সনদ' স্বাক্ষর এবং 'কায়রো ঘোষণা' বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ওআইসি-র উপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পেশকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশেও জঙ্গী সন্ত্রাসবিরোধী অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের জন্য পৃথক টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(গ) ধর্মের সন্ত্রাসবিরোধী বক্তব্য ও নির্দেশনা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সকল মহলের নিকট তুলে ধরার জন্য স্ব-স্ব ধর্মীয় নেতা, ইমাম ও ধর্মগুরুদের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

(ঘ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করতে হবে। মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও উদার গণতান্ত্রিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। সেই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষাকে অঙ্গীভূত করতে হবে। এ বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঙ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে এক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বাজেট ও জনবল সৃজন করতে হবে। ন্যূনতম এসএসসি লেভেল পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে যাতে উক্ত পর্যায়ে `Dropout'-এর শিকার তরুণশ্রেণী বেকারত্বের কারণে ধর্মীয় সন্ত্রাসের দিকে পা না বাড়ায়।

(চ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে ব্যয়-বৈষম্য সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে, যাতে দারিদ্র্যের কারণে জনগণ সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়।

(ছ) ধর্মের নামে স্বল্পশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মোল্লাশ্রেণীর পক্ষ থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা ও ওয়াজ মাহফিলে সকল প্রকার হঠকারী ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান কঠোর হস্তে প্রতিহত করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান ফৌজদারী আইনের স্থলে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।

(জ) সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে সকল ধর্মের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিয়মিত 'শান্তি ও সম্প্রীতি সম্মেলন'-এর আয়োজন করতে হবে। উক্ত সম্মেলনে সকল ধর্মের পরস্পরের প্রতি সমর্থনের বিষয়টি তথ্যপ্রমাণসহ জনসমক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) গতানুগতিক বক্তব্যের পরিবর্তে ধর্মের জনকল্যাণমুখী, সংস্কারমুখী, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক চরিত্র স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরতে হবে। এ কাজে ধর্ম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পাবলিক লাইব্রেরী এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথ্য অধিদপ্তরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এ কাজে সঞ্চালকের (Catalyst) দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে রাজনীতির জন্ম হলেও সময় ও সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে রাজনীতির উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনীতি এখন শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যম নয়, বরং তা এখন ব্যাপক জনকল্যাণের একটি স্বীকৃত মাধ্যম। তাই যে রাজনীতি জনকল্যাণের পক্ষে কাজ করে না, তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'রাজনীতি'র স্বীকৃতি দেয়া হয় না—তাকে বলা হয় 'দুষ্টচক্র' (Contery' বা `Faction')। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেও সত্যিকার অর্থে জনকল্যাণমুখী, অসাম্প্রদায়িক, সংস্কারমুখী, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক চরিত্র অর্জন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে মুক্তমন ও দূরদৃষ্টির সাথে কাজ করতে হবে যাতে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

মানচিত্র-১ঃ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

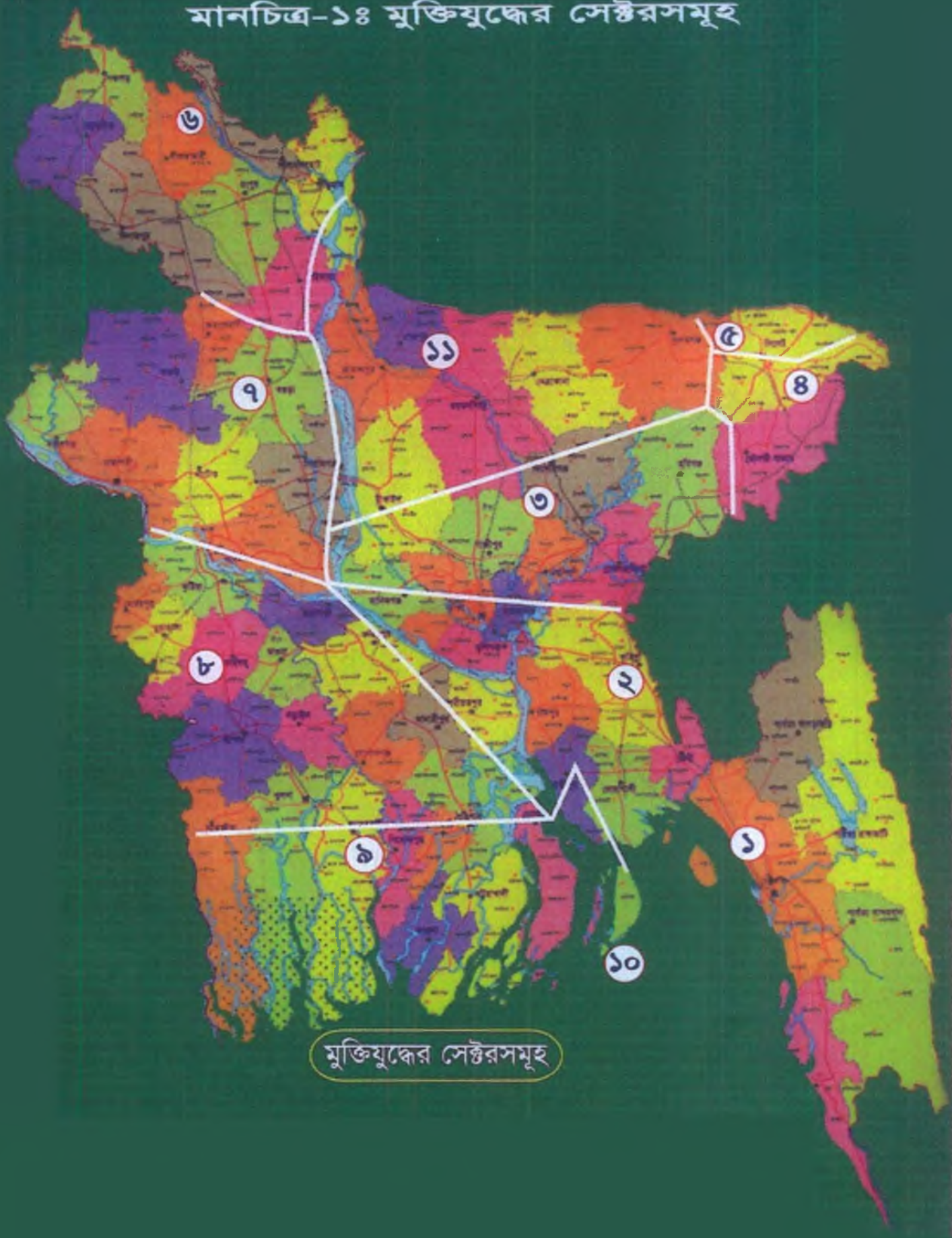

পরিশিষ্ট-২

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-২ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সীমানা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

মানচিত্র-৩ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব

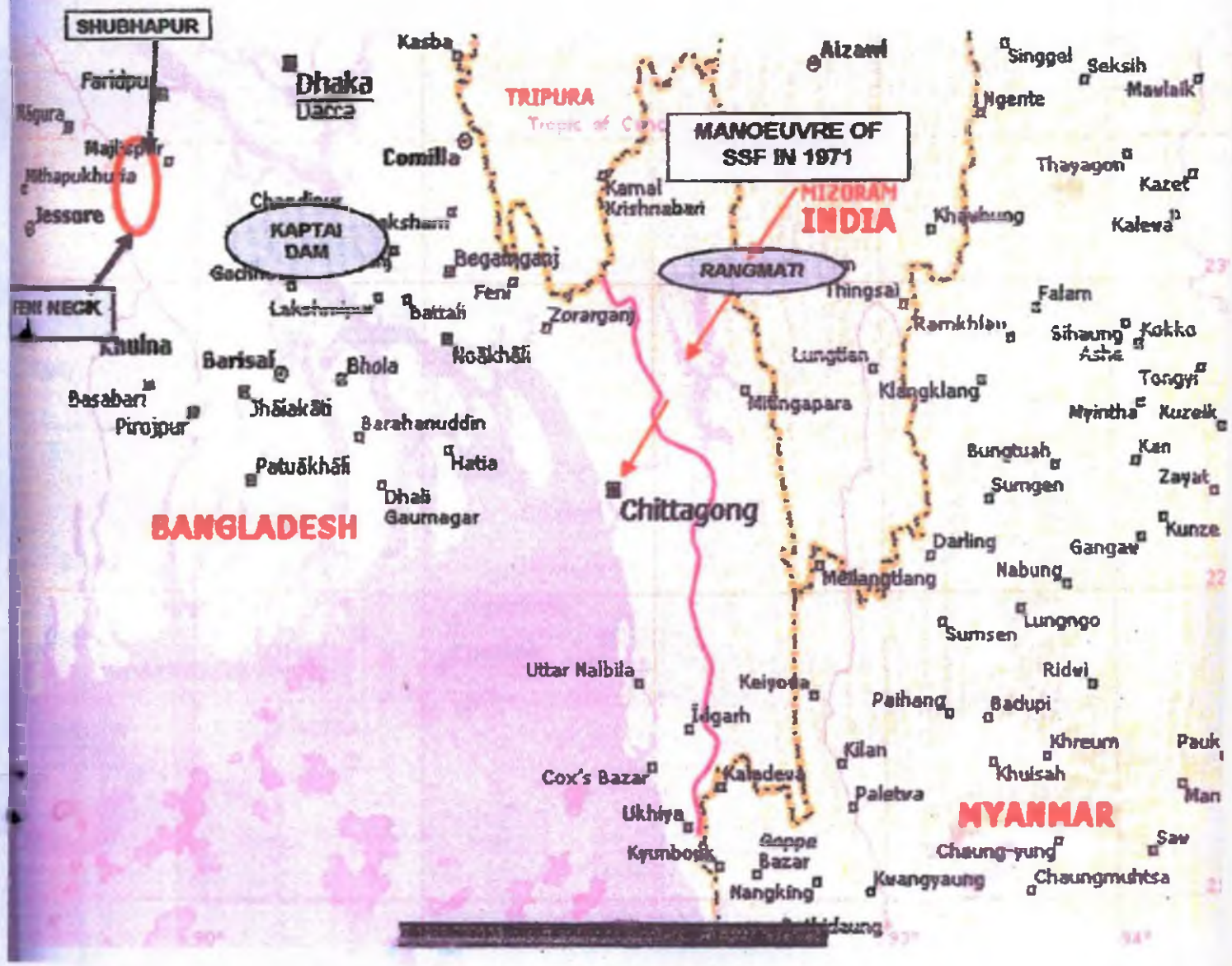

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

মানচিত্র-৪ঃ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বে আঞ্চলিক ও আন্তঃজাতিক উপাদান

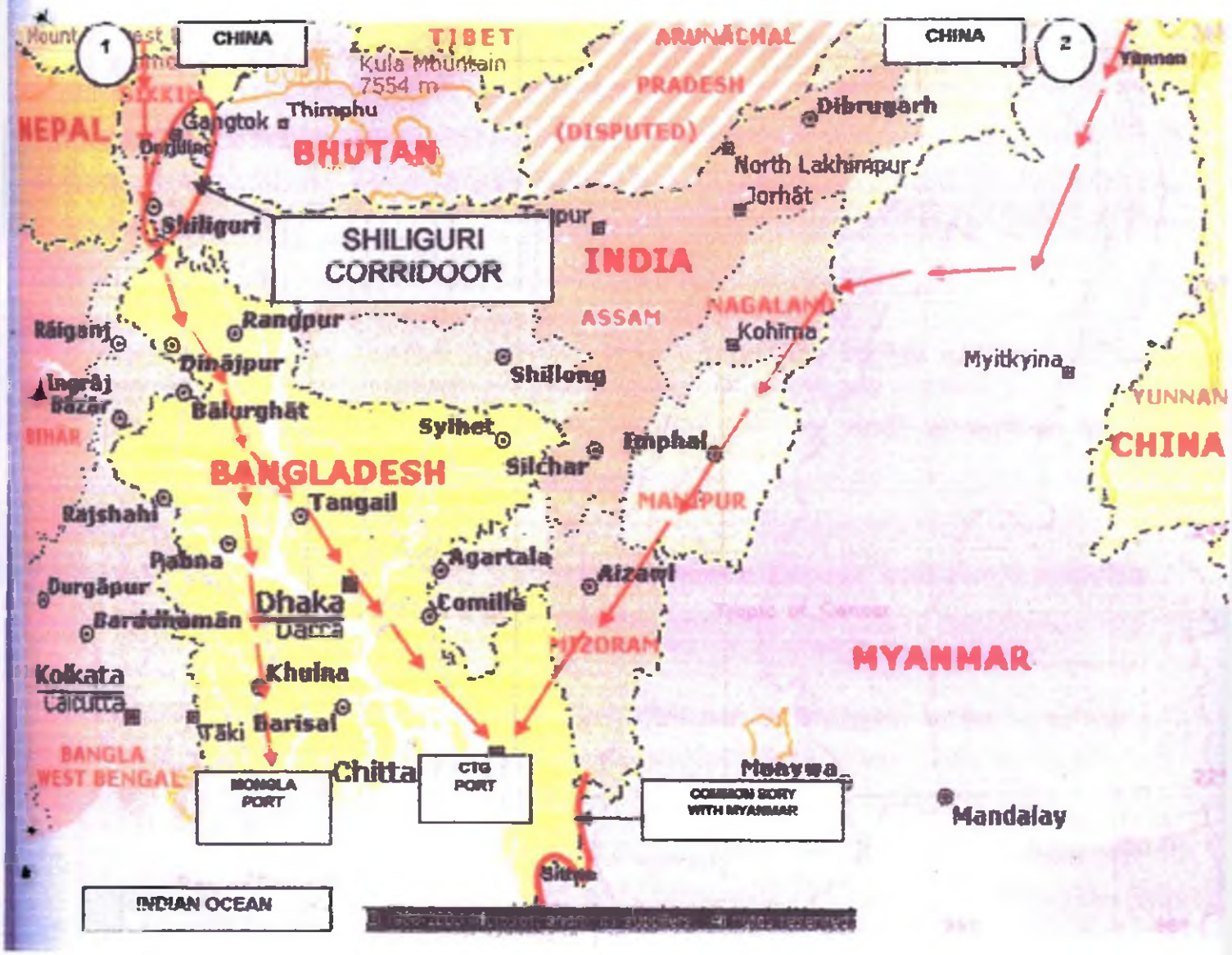

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-৫ঃ পার্বত্য এলাকায় অবৈধ অস্ত্রের পথ ও ট্রানজিট পয়েন্টসমূহ

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৩, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

মানচিত্র-৬ : একনজরে সারাদেশে ১৭ আগস্টের বোমা হামলা

সৌজন্যে প্রথম আলো, ১৮ আগষ্ট-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

আত্মঘাতী বিমান হামলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত টুইন টাওয়ার

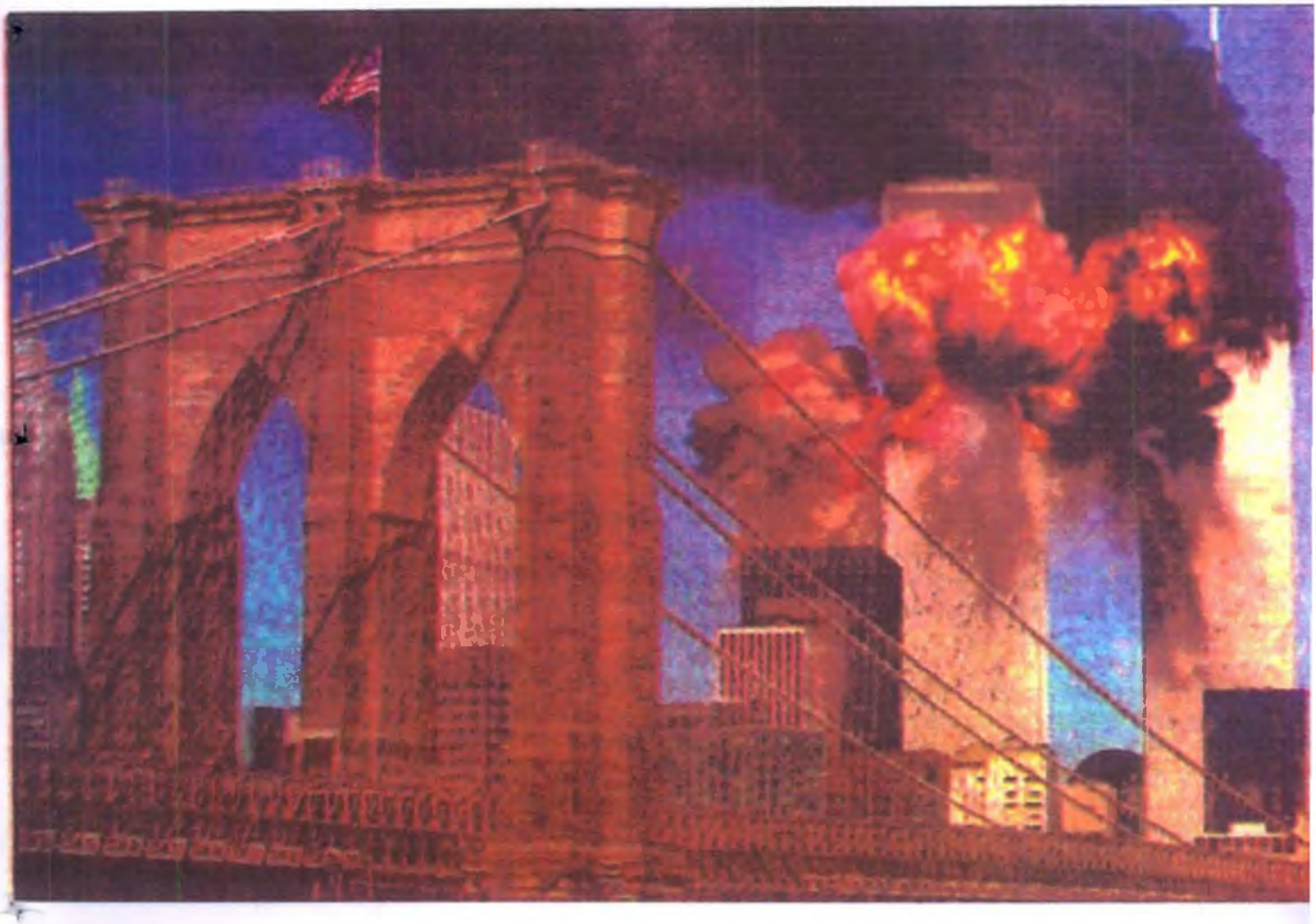

সৌজন্যে প্রথম আলো, ১১সেপ্টেম্বর-২০০৩

পরিশিষ্ট–চ

Dhaka University Institutional Repository

THE PARLIAMENT

Speaker

Barrister Mohammad Jamiruddin Sarker

Deputy Speaker

Md. Akhter Hamid Siddique

Chief Whip

Khandaker Delwar Hossain

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
1.	Panchagar-1	Barrister Mohammad Jamiruddin Sarkar	BNP
2.	Panchagar-2	Md. Mozahar Hossain	BNP
3.	Thakurgaon-1	Mirza Fakhrul Islam Alamgir	BNP
4.	Thakurgaon-2	Alhaj Md. Dabirul Islam	AL
5.	Thakurgaon-3	Hafizuddin Ahmed	IJOF
6.	Dinajpur-1	Md. Abdullah Al-kafi	Jamaat
7.	Dinajpur-2	Lt. General (Rtd.) Mahbubur Rahman	BNP
8.	Dinajpur-3	Kharshid Jahan Haq	BNP
9.	Dinajpur-4	Md. Aktaruzzaman (Miah)	BNP
10.	Dinajpur-5	Advocate Md. Mustafizur Rahman	AL
11.	Dinajpur-6	Md. Azizur Rahman Chowdhury	Jamaat
12.	Nilphamari-1	Dr. Hamida Banu Shova	AL
13.	Nilphamari-2	Asaduzzaman Noor	AL
14.	Nilphamari-3	Md. Mizanur Rahman Chowdhury	Jamaat
15.	Nilphamari-4	Md. Amjad Hossain Sarker	BNP
16.	Lalmonirhat-1	Md. Motahar Hossain	AL
17.	Lalmonirhat-2	Md. Mujibur Rahman	IJOF
18.	Lalmonirhat-3	Asadul Habib (Dulu)	BNP
19.	Rangpur-1	Md. Masiur Rahman Ranga	IJOF
20.	Rangpur-2	Mohammad Ali Sarker	IJOF
21.	Rangpur-3	Golam Mohammad Kader	IJOF
22.	Rangpur-4	Alhaj Md. Karimuddin Bharsha	IJOF
23.	Rangpur-5	Shah Md. Solaiman Alam	IJOF

বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ

সূত্র : নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
24.	Rangpur-6	Md. Noor Mohammad Mondal	IJOF
25.	Kurigram-1	A.K.M. Mustafizur Rahman	IJOF
26.	Kurigram-2	Alhaj Md. Tajul Islam Chowdhury	IJOF
27.	Kurigram-3	Md. Matiur Rahman	IJOF
28.	Kurigram-4	Md. Golam Habib (Dulal)	IJOF
29.	Gaibandha-1	Moulana A. Aziz	Jamaat
30.	Gaibandha-2	Md. Lutfur Rahman	AL
31.	Gaibandha-3	Dr. TIM Fazle Rabbi Chowdhury	IJOF
32.	Gaibandha-4	Md. Abdul Motalib Akand	BNP
33.	Gaibandha-5	Begum Roushan Ershad	IJOF
34.	Joypurhat-1	Abdul Alim	BNP
35.	Joypurhat-2	Abu Yusuf Md. Khalilur Rahman	BNP
36.	Bogra-1	Kazi Rafiqul Islam	BNP
37.	Bogra-2	Md. Rezaul Bari Dena	BNP
38.	Bogra-3	Md. Abdul momin Talukder	BNP
39.	Bogra-4	Dr. Ziaul Haq Mollah	BNP
40.	Bogra-5	Golam Mohammad Siraj	BNP
41.	Bogra-6	Begum Khaleda Zia	BNP
42.	Bogra- 7	Md. Helaluzzaman Talukder Lalu	BNP
43.	Chapai Nawabganj-1	Prof. Md. Shahjahan Miah	BNP
44.	Chapai Nawabganj-2	Syed Monzur Hossain	BNP
45.	Chapai Nawabganj-3	Md. Harunur Rashid (Harun)	BNP
46.	Naogaon-1	Dr. Md. Salek Chowdhury	BNP
47.	Naogaon-2	Md. Shamsuzzoha Khan	BNP
48.	Naogaon-3	Md. Akhter Hamid Siddique	BNP
49.	Naogaon-4	Shamsul Alam Paramanik	BNP
50.	Naogaon-5	Md. Abdul Jalil	AL
51.	Naogaon-6	Alamgir Kabir	BNP
52.	Rajshahi-1	Barrister Md. Aminul Huq	BNP
53.	Rajshahi-2	Md. Mizanur Rahman Minu	BNP
54.	Rajshahi-3	Mohammad Abu Hena	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
55.	Rajshahi-4	Advocate Md. Nadim Mostafa	BNP
56.	Rajshahi-5	Md. Kabir Hossain	BNP
57.	Natore-1	Md. Fazlur Rahman (Patal)	BNP
58.	Natore-2	Advocate Ruhul Quddus Talukder (Dulu)	BNP
59.	Natore-3	Alhaj Prof. Kazi Golam Morshed	BNP
60.	Natore-4	Md. Mozammel Haq	BNP
61.	Sirajganj-1	Mohammad Nasim	AL
62.	Sirajganj-2	Iqbal Hasan Mahmood	BNP
63.	Sirajganj-3	Md. Abdul Mannan Talukdar	BNP
64.	Sirajganj-4	M. Akbar Ali	BNP
65.	Sirajganj-5	Md. Mozammel Haq	BNP
66.	Sirajganj-6	Major (Retd) manzur Kader	BNP
67.	Sirajganj-7	Prof. M. A. Matin	4 Party Alliance
68.	Pabna-1	Matiur Rahman Nezami	Jamaat
69.	Pabna-2	A.K.M Selim Reza Habib	BNP
70.	Pabna-3	K.M Anwarul Islam	BNP
71.	Pabna-4	Md. Shamsur Rahman Sharif	AL
72.	Pabna-5	Abdus Sobhan	Jamaat
73.	Meherpur-1	Masud Arun	BNP
74.	Meherpur-2	Md. Abdul Gani	BNP
75.	Kushtia-1	Md. Ahsanul Huq.Mollah	BNP
76.	Kushtia-2	Prof. Shahidul Islam	BNP
77.	Kushtia-3	Alhaj Md. Sohrabuddin	BNP
78.	Kushtia-4	Syed Mehedi Ahmed Rumi	BNP
79.	Chuadanga-1	Md. Shahidul Islam Biswas	BNP
80.	Chuadanga-2	Hazi Md. Mozammel Huq	BNP
81.	Jhenidah-1	Md. Abdul Hai	AL
82.	Jhenidah-2	Md. Mashiur Rahman	BNP
83.	Jhenidah-3	Md. Shahidul Islam	BNP
84.	Jhenidah-4	Md. Shahiduzzaman (Beltu)	BNP
85.	Jessore-1	Alhaj Md. Ali Kader	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
86.	Jessore-2	Abu Syeed Shahadat Hossain	Jamaat
87.	Jessore-3	Tariqul Islam	BNP
88.	Jessore-4	M. M. Aminuddh	4 Party Alliance
89.	Jessore-5	Matti Mohammad Wakkas	4 Party Alliance
90.	Jessore-6	ASHK Sadek	AL
91.	Magura-1	Prof. Dr. Md. Sirajul Akbar	AL
92.	Magura-2	Kazi Salimul Hoque	BNP
93.	Narail-1	Dhirendra Nath Shalla	BNP
94.	Narail-2	Mohammad Shahidul Islam	IOJ
95.	Bagerhat-1	Sheikh Helaluddin	AL
96.	Bagerhat-2	MAH Selim	BNP
97.	Bagerhat-3	Talukder A. Khaleque	AL
98.	Bagerhat-4	Mufti Moulana Abdus Sattar Akan	Jamaat
99.	Khulna-1	Panchanan Biswas	AL
100.	Khulna-2	Md. Ali Asgar (Loby)	BNP
101.	Khulna-3	Md. Ashraf Hossain	BNP
102.	Khulna-4	M. Nurul Islam	BNP
103.	Khulna-5	Mia Golam Porwar	Jamaat
104.	Khulna-6	Shah Md. Ruhul Quddus	Jamaat
105.	Satkhira-1	Md. Habibul Islam Habib	BNP
106.	Satkhira-2	Moulana Abdul Khaleque mondal	Jamaat
107.	Satkhira-3	A M Riasat Biswas	Jamaat
108.	Satkhira-4	Kazi Alauddin	4 Party Alliance
109.	Satkhira-5	Gazi Nazrul Islam	Jamaat
110.	Barguna-1	Md. Delwar Hossain	IND
111.	Barguna-2	Md. Alhaj Nurul Islam Moni	BNP
112.	Barguna-3	M. Motiur Rahman Talukdar	BNP
113.	Patuakhali-1	Alhaj Altaf Hossain Chowdhury	BNP
114.	Patuakhali-2	Md. Shahidul Alam Talukder	BNP
115.	Patuakhali-3	AKM Jahangir Hossain	AL
116.	Patuakhali-4	Alhaj Md. Mahbubur Rahman	AL
117.	Bhola-1	Mosharraf Hossain Shahjahan	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
118.	Bhola-2	Md. Hafiz Ibrahim	BNP
119.	Bhola-3	Hafizuddin Ahmed, Bir Bikram	BNP
120.	Bhola-4	Md. Nazimuddin Alam	BNP
121.	Barisal-1	Zahiruddin Swapan	BNP
122.	Barisal-2	Syed Moazzem Hossain Aalal	BNP
123.	Barisal-3	Alhaj Mosharraf Hossain Mongu	BNP
124.	Barisal-4	Shah Mohammad Abul Hossain	BNP
125.	Barisal-5	Advocate Md. Mojibur Rahman Sarwar	BNP
126.	Barisal-6	Abul Hossain Khan	BNP
127.	Jhalakathi-1	Mohammad Shajahan Omar Bir uttam	BNP
128.	Jhalakathi-2	Mst. Ishrat Sultana (Elena Bhutto)	BNP
129.	Pirojpur-1	Moulana Delwar Hossain Sayeedi	Jamaat
130.	Pirojpur-2	Anwar Hossain Manju	JP (m)
131.	Pirojpur-3	Dr. Md. Rustam Ali Faraji	BNP
132.	Barisal+Pirojpur	Syed Shahidul Hoq Jamal	BNP
133.	Tanqail-1	Dr. Md. Abdur Razzak	AL
134.	Tangail-2	Md. AQdus Salam Pintu	BNP
135.	Jangail-3	Md. Lutfur Rahman Khan (Azad)	BNP
136.	Tangail-4	Shajahan Siraj	BNP
137.	Tangail-5	Mjor General (Retd) Mahmudul Hasan	BNP
138.	Tangail-6	Advocate Gautam Chakravarty	BNP
139.	Tangail-7	Md. Ekabbar Hossain	AL
140.	Tangail-8	Bangabir Kader Siddique Bir Uttam	KSJL
141.	Jamalpur-1	M. Rasiduzzaman Millat	BNP
142.	Jamalpur-2	Md. Sultan Mahmud Babu	BNP
143.	Jamalpur-3	Mirza Azam	AL
144.	Jamalpur-4	Anwarul Kabir Talukder	BNP
145.	Jamalpur-5	Md. Rezaul Karim Hira	AL
146.	Sherpur-1	Md. Atiur Rahman Atiq	AL
147.	Sherpur-2	Md. Alhaj Zahed Ali Chowdhury	BNP
148.	Sherpur-3	Mahmudul Hoque(Rubel)	BNP
149.	Mymensingh-1	Advocate Promod Mankin	AL

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
150.	Mymensingh-2	Shah Shahid Sarwar	BNP
151.	Mymensingh-3	Muzibur Rahman Fakir	AL
152.	Mymensingh-4	Md. Delwar Hossain Khan Dulu	BNP
153.	Mymensingh-5	A.K.M. Mosharraf Hossain	BNP
154.	Mymensingh-6	Eng. Shamsuddin Ahmed	Ind
155.	Mymensingh- 7	Abdul Matin Sarker	AL
156.	Mymensingh-8	Shah Nurul Kabir (Shaheen)	BNP
157.	Mymensingh-9	Khurram Khan Chowdhury	BNP
158.	Mymensingh-10	Alhaj Altaf Hossain Golandaj	AL
159.	Mymensingh-11	Prof. Dr. M. Amanullah	AL
160.	Mymensingh+ Netrokona	Alhaj Dr. Mohammad Ali	BNP
161.	Netrokona-1	Md. Abdul Karim Abbasi	BNP
162.	Netrokona-2	Abdul Momin	AL
163.	Netrokona-3	Md. Nurul Amin Talukdar	BNP
164.	Netrokona-4	Md. Lutfuzzaman Babar	BNP
165.	Kishoregonj-1	Dr. Alauddin Ahmed	AL
166.	Kishoregonj-2	Alhaj Prof. Dr.M. A. Mannan	AL
167.	Kishoregonj-3	Syed Ashraful Islam	AL
168.	Kishoregonj-4	Dr. M Osman Faruq	BNP
169.	Kishoregonj-5	Advocate Md. Abdul Hamid	AL
170.	Kishoregonj-6	Md. Muzibur Rahman Manju	BNP
171.	Kishoregonj-7	Md. Zillur Rahman	AL
172.	Manikganj-1	Khandaker Delwar Hossain	BNP
173.	Manikganj-2	Shamsuddin Ahmed	IND
174.	Manikganj-3	Haroon-ur-Rashid Khan Monno	BNP
175.	Manikganj-4	Shamsul Islam Khan	BNP
176.	Munshiganj-1	Mahi B. Chowdhury	BNP
177.	Munshiganj-2	Mizanur Rahman Sinha	BNP
178.	Munshiganj-3	M. Shamsul Islam	BNP
179.	Munshiganj-4	Abdul Hye	BNP
180.	Dhaka-1	Barrister Nazmul Huda	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
181.	Dhaka-2	Abdul Mannan	BNP
182.	Dhaka-3	Amanullah Aman	BNP
183.	Dhaka-4	Alhaj Salauddin Ahmed	BNP
184.	Dhaka-5	Major (Retd). Kamrul Islam	BNP
185.	Dhaka-6	Mirza Abbus	BNP
186.	Dhaka-7	Sadek Hossain Khoka	BNP
187.	Dhaka-8	Nasiruddin Ahmed Pintu	BNP
188.	Dhaka-9	Khandaker Mahbubuddin Ahmed	BNP
189.	Dhaka-10	Major (Retd). Abdul Mannan	BNP
190.	Dhaka-11	SA. Khaleque	BNP
191.	Dhaka-12	Dr. Dewan Md. Salauddin	BNP
192.	Dhaka-13	Barrister Ziaur Rahman Khan	BNP
193.	Gazipur-1	Alhaj Advocate Md. Rahmat Ali	AL
194.	Gazipur-2	Md. Ahsanullah	AL
195.	Gazipur-3	Md. A K M Fazlul Haque	BNP
196.	Gazipur-4	Tanjim Ahmed (Sohel Taj)	AL
197.	Narsingdi-1	Shamsuddin Ahmed Eshak	BNP
198.	Narsingdi-2	Dr. Abdul Moyeen Khan	BNP
199.	Narsingdi-3	Abdul Mannan Bhuiyan	BNP
200.	Narsingdi-4	Sarder Sakhawat Hossain Bakul	BNP
201.	Narsingdi-5	Raziuddin Ahmed Raju	AL
202.	Narayanganj-1	Abdul Matin Chowdhury	BNP
203.	Narayanganj-2	Ataur Rahman Khan	BNP
204.	Narayanganj-3	Prof. Md. Rezaul Karim	BNP
205.	Narayanganj-4	Mohammad Giasuddin	BNP
206.	Narayanganj-5	Advocate Abul Kalam	BNP
207.	Rajbari-1	Ali Newaz Mahmud Khoium	BNP
208.	Rajbari-2	Md. Nasirul Hoque Sabu	BNP
209.	Faridpur-1	Kazi Sirajul Islam	AL
210.	Faridpur-2	K.M. Obidur Rahman	BNP
211.	Faridpur-3	Chowdhury Kamal Ibne Yusuf	BNP
212.	Faridpur-4	Chowdhury Akmal Ibne Yusuf	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
213.	Faridpur-5	Kazi Zafrullah	AL
214.	Gopalganj-1	Md. Faruque Khan	AL
215.	Gopalganj-2	Sheikh Fazlul Karim Selim	AL
216.	Gopalganj-3	Sheikh Hasina	AL
217.	Madaripur-1	Nur-E-Alam Chowdhury (Liton)	AL
218.	Madaripur-2	Shahjahan Khan	AL
219.	Madaripur-3	Alhaj Syed Abul Hussain	AL
220.	Shariatpur-1	K. M Hemaytullah Auranga	Ind
221.	Shariatpur-2	Col. (Retd) Shawkat Ali	AL
222.	Shariatpur-3	Abdur Razzak	AL
223.	Sunamgonj-1	Nasir Hossain	BNP
224.	Sunamgonj-2	Sree Suranjeet sen Gupta	AL
225.	Sunamgonj-3	Alhaj Abdus Samad Azad	AL
226.	Sunamgonj-4	Md. Fazlul Haq (Ashpiya)	BNP
227.	Sunamgonj-5	Kalimuddin Ahmed	BNP
228.	Sylhet-1	Md. Saifur Rahman	BNP
229.	Sylhet-2	M. Elias Ali	BNP
230.	Sylhet-3	Alhaj Safi Ahmed Chowdhury	BNP
231.	Sylhet-4	Dildar Hossain Selim	BNP
232.	Sylhet-5	Fariduddin Chowdhury	Jamaat
233.	Sylhet-6	Dr. Syed Moqbul Hossain (Lesu mia)	Ind
234.	Maulavibazar-1	Ebadur Rahman Chowdhury	BNP
235.	Maulavibazar-2	M.M. Shahin	Ind
236.	Maulavibazar-3	M. Naser Rahman	BNP
237.	Maulavibazar-4	Alhaj Vice Principal M. A. Shaheed	AL
238.	Habiganj-1	Dewan Farid Gazi	AL
239.	Habiganj-2	Nazmul Hasan Jahed	AL
240.	Habiganj-3	Shah AMS Kibria	AL
241.	Habiganj-4	Enamul Huq	AL
242.	B. Baria-1	Mohammad Sayedul Haque	AL
243.	B. Baria-2	Mufti Fazlul Haq Amini	4 Party Alliance
244.	B. Baria-3	Advocate Harun-al-Rashid	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
245.	B. Baria-4	Mushfikur Rahman	BNP
246.	B. Baria-5	Kazi Md. Anwar Hossain	4 Party Alliance
247.	B. Baria-6	Abdul Khaleque	BNP
248.	Comilla-1	M.K. Anwar	BNP
249.	Comilla-2	Dr. Khandakar Masharraf Hossain	BNP
250.	Comilla-3	Kazi Shah Moffazzal Hossain Kaikobad	BNP
251.	Comilla-4	Alhaj Eng. Manzurul Ahsan Munshi	BNP
252.	Comilla-5	Prof. Md. Younus	BNP
253.	Comilla-6	Redwan Ahmed	BNP
254.	Comilla-7	AKM Abu Taher	BNP
255.	Comilla-8	Lt. Col. (Retd) Akbar Hossain	BNP
256.	Comilla-9	Md. Monirul Huq Chowdhury	BNP
257.	Comilla-10	Col. (Retd) M. Anwarul Azim	BNP
258.	Comilla-11	Md. Abdul Gafur Bhuiyan	BNP
259.	Comilla-12	Dr. Syed Abdullah Md. Taher	Jamaat
260.	Chandpur-1	ANM Ahsanul Haq	BNP
261.	Chandpur-2	Md. Nurul Huda	BNP
262.	Chandpur-3	G.M. Fazlul Haque	BNP
263.	Chandpur-4	S.A. Sultan	BNP
264.	Chandpur-5	M. A. Matin	BNP
265.	Chandpur-6	Md. Alamgir Haider Khan	BNP
266.	Feni-1	Major (Retd) Sayeed Eskander	BNP
267.	Feni-2	Prof. Zainul Abedin	BNP
268.	Feni.3	Md. Mosharraef Hossain	BNP
269.	Noakhali-1	Zainul Abedin Faruk	BNP
270.	Naakhali-2	M. A. Hashem	BNP
271.	Noakhali-3	Advocate Mahbubur Rahman	BNP
272.	Noakhali-4	Md. Shahjahan	BNP
273.	Noakhali-5	Barrister Moudud Ahmed	BNP
274.	Noakhali-6	Mohammad Ali	Ind
275.	Laksmipur-1	Ziaul Haq Zia	BNP
276.	Laksmipur-2	Abul Khair Bhuiyan	BNP

Dhaka University Institutional Repository

Members

SL. No.	Name of Constituency	Name of Member	Party affiliation
277.	Laksmipur-3	Md. Shahiduddin Chowdhury Anny	BNP
278.	Laksmipur-4	ABM Asrafuddin	BNP
279.	Chittagong-1	Mohammad Ali Jinnah	BNP
280.	Chittagong-2	Eng. L. K. Siddiqui	BNP
281.	Chittagong-3	Mustafa Kamal Pasha	BNP
282.	Chittagong-4	Rafiqul Anwar	AL
283.	Chittagong-5	Alhaj Syed Wahidul Alam	BNP
284.	Chittagong-6	ABM Fazle Karim Chowdhury	AL
285.	Chittagong-7	Salauddin Kader Chowdhury	BNP
286.	Chittagong-8	Amir Khasru Mahmud Chowdhury	BNP
287.	Chittagong-9	Abdullah Al Noman	BNP
288.	Chittagong-10	M. Morshed Khan	BNP
289.	Chittagong-11	Gazi Md. Shahjahan	BNP
290.	Chittagong-12	Sarwar Jamal Nizam	BNP
291.	Chittagong-13	Oli Ahmed Bir Bikram	BNP
292.	Chittagong-14	Shajahan Chowdhury	Jamaat
293.	Chittagong-15	Jafrul Islam Chowdhury	BNP
294.	Cox's Bazar-1	Salah uddin Ahmed	BNP
295.	Cox's Bazar-2	Alamgir Md. Mahafuzullah Farid	BNP
296.	Cox's Bazar-3	Eng. Shahiduzzaman	BNP
297.	Cox's Bazar-4	Shajahan Chowdhury	BNP
298.	Khagrachhari	Wadud Bhuiyan	BNP
299.	Rangamati	Moni Swapon Dewan	BNP
300.	Bandarban	Bir Bahadur	AL

Note:
BNP = Bangladesh Nationalist Party
Al = Awami League
IJOF = Islamic Jatiya Oikya Front Led by JP (Ershad)
Jamaat = Jamaat-E-Islami Bangladesh
Ind = Independent
KSJL = Krishak Sramik Janata League
4 Party Alliance = BNP, Jamat, Islamic Oikya Jot and Jatiya Party (NF)
JP(M) = Jatiya Party (Manju)

Source : Election Commision.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের তালিকা

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
৩. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)
৪. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)
৫. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর)
৬. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৮. ওয়ার্কার্স পার্টি
৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)
১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)
১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (মহিউদ্দিন)
১২. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)
১৩. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মাহবুব)
১৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)
১৫. গণফোরাম
১৬. গণতন্ত্রী পার্টি
১৭. গণআজাদী লীগ (সামাদ)
১৮. গণআজাদী লীগ (আলম)
১৯. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
২০. জনমুক্তি পার্টি
২১. বাংলাদেশ পিপলস লীগ
২২. ঐক্য প্রক্রিয়া
২৩. প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল
২৪. ফ্রিডম পার্টি (ফারুক)
২৫. ফ্রিডম পার্টি (রশীদ)
২৬. ডেমোক্রেটিক লীগ
২৭. ডেমোক্রেটিক লীগ (অলি আহাদ)
২৮. কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)
২৯. কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজ)
৩০. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)
৩১. জাতীয় দল (হুদা)
৩২. যুক্তফ্রন্ট
৩৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)
৩৪. ইউপিপি (সাদেক)
৩৫. ইউপিপি (আবেদিন)

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. জাতীয় জনতা পার্টি (নুরুন)
৩৭. জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)
৩৮. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি
৩৯. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৪০. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (জাহিদ)
৪১. বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি
৪২. বাংলাদেশ জনতা দল
৪৩. মুসলিম লীগ (কাদের)
৪৪. মুসলিম লীগ (মতিন)
৪৫. মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
৪৬. মানবতাবাদী দল
৪৭. বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি
৪৮. বাকশাল
৪৯. জাতীয় খেলাফত পার্টি
৫০. ফ্রিডমেটিক পার্টি
৫১. বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
৫২. পাকমন পিপলস পার্টি
৫৩. ফ্রিডম লীগ
৫৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
৫৫. স্বাধীনতা পার্টি
৫৬. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৫৭. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজ)
৫৮. খেলাফত আন্দোলন (আশরাফ)
৫৯. খেলাফত আন্দোলন (হাবিবুল্লাহ)
৬০. বাংলাদেশ ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি
৬১. বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন
৬২. জাতীয় ওলামা ফ্রন্ট
৬৩. জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
৬৪. জাস্টিস পার্টি
৬৫. লেবার পার্টি (মোস্তফা)
৬৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার পার্টি
৬৭. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
৬৮. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৬৯. মুসলিম লীগ ঐক্য
৭০. নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি
৭১. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন
৭২. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
৭৩. বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট
৭৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি
৭৬. আওয়ামী উলেমা পার্টি
৭৭. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি
৭৮. মুসলিম জাতীয় দল
৭৯. বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি
৮০. বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোতালেব)
৮১. মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল
৮২. বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা-ই-ইসলামী
৮৩. জাতীয় উলেমা দল
৮৪. বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ
৮৫. বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)
৮৬. বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ
৮৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৮৮. বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাইদ)
৮৯. নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)
৯০. নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ)
৯১. বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
৯২. বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি
৯৩. বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি
৯৪. বাংলাদেশ কংগ্রেস
৯৫. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল
৯৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস
৯৭. জাতীয় পল্লী দল
৯৮. ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি
৯৯. বাংলাদেশ পিপলস লীগ (কাজী)
১০০. বাংলাদেশ পিপলস লীগ (মাহবুব)
১০১. ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি
১০২. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (সুক্কু মিয়া)
১০৩. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (শরাফত)
১০৪. জাতীয় জনতা পার্টি (খান)
১০৫. জাতীয় জনতা পার্টি (ওয়াদুদ)
১০৬. জাতীয় জনতা পার্টি (সুজাত)
১০৭. গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট
১০৮. সাম্যবাদী দল (বড়ুয়া)
১০৯. প্রোগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্ট পার্টি
১১০. বাংলাদেশ ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক দল
১১১. জেহাদ পার্টি
১১২. বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ
১১৩. বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল

Dhaka University Institutional Repository

১১৪. জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট
১১৫. নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি
১১৬. বাংলাদেশ বেকার পার্টি
১১৭. জাতীয় বিপ্লবী পার্টি
১১৮. বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল
১১৯. বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ
১২০. বাংলাদেশ ক্রিভন লীগ
১২১. বাংলাদেশ বেকার সমাজ
১২২. জাতীয় শ্রমজীবী পার্টি
১২৩. বাংলাদেশ আদর্শ পার্টি
১২৪. মুসলিম পিপলস পার্টি
১২৫. সমতা পার্টি
১২৬. বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি
১২৭. পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি
১২৮. বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (আ.নে.)
১২৯. বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি
১৩০. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্ম সংঘ
১৩১. বাংলাদেশ গরীব দল
১৩২. পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি
১৩৩. পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি
১৩৪. বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ
১৩৫. কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৩৬. বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট
১৩৭. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন
১৩৮. বাংলাদেশ জনপরিষদ
১৩৯. জাতীয় বিপ্লবী পার্টি
১৪০. আদর্শ পার্টি
১৪১. মুসলিম পিপলস পার্টি
১৪২. পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি
১৪৩. গণআজাদী লীগ
১৪৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)
১৪৫. বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি
১৪৬. বাংলাদেশ প্রগতিশীল পার্টি
১৪৭. বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনীতিক পার্টি
১৪৮. বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
১৪৯. জামায়াত-ই-রাব্বানিয়া-আসমা পার্টি
১৫০. গণতান্ত্রিক কর্মীশিবির
১৫১. বাংলাদেশ জাতীয় সেবক দল
১৫২. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩. বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তি আন্দোলন
১৫৪. ন্যাশনাল ইয়ুথ লিবারেল পার্টি
১৫৫. ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি
১৫৬. হুকুমতে রাব্বানী পার্টি
১৫৭. ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি
১৫৮. ইসলামী গণআন্দোলন
১৫৯. ইসলামী কৃষক পার্টি
১৬০. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি
১৬১. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
১৬২. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের তালিকা

১. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
২. মুসলিম লীগ (কাদের)
৩. মুসলিম লীগ (মতিন)
৪. মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
৫. মুসলিম লীগ (জমির আলী)
৬. জাতীয় খেলাফত পার্টি
৭. বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
৮. পাকমন পিপলস পার্টি
৯. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
১০. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (মুফতি আমিনী)
১১. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজুল হক)
১২. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আশরাফ)
১৩. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (ইজাহারুল ইসলাম)
১৪. বাংলাদেশ ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি
১৫. বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন
১৬. জাতীয় ওলামা ফ্রন্ট
১৭. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
১৮. মুসলিম লীগ ঐক্য
১৯. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন
২০. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
২১. বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট
২২. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
২৩. বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি
২৪. আওয়ামী উলেমা পার্টি
২৫. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি
২৬. মুসলিম জাতীয় দল
২৭. বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি
২৮. মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল
২৯. বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা-ই-ইসলামী
৩০. জাতীয় উলেমা দল
৩১. বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ
৩২. বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)
৩৩. বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ
৩৪. বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাইদ)

Dhaka University Institutional Repository

৩৫.নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)
৩৬.নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ)
৩৭.বাংলাদেশ ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক দল
৩৮.জেহাদ পার্টি
৩৯.বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ
৪০.মুসলিম পিপলস পার্টি
৪১.বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি
৪২.বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট
৪৩.মুসলিম পিপলস পার্টি
৪৪.বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনীতিক পার্টি
৪৫.জামায়াত-ই-রাব্বানিয়া-আসমা পার্টি
৪৬.ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি
৪৭.হুকুমতে রাব্বানী পার্টি
৪৮.ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি
৪৯.ইসলামী গণআন্দোলন
৫০.ইসলামী কৃষক পার্টি
৫১.বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি
৫২.ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট
৫৩.বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর বই এবং প্রবন্ধ

1. Parliamentary Elections in Bangladesh, 27 February, 1991, The Report of the Commonwealth Observer Group
2. S. R. Chakravarty, *Bangladesh : The Nineteen Seventy Nine Election* (South Asian Publishers, New Delhi, 1988)
3. Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics- The Shahabuddin Interregnum* (UPL., Dhaka, 1993)
4. The History of Religions, E.O. James
5. Bible Dictionary
6. Encyclopedia of Religions and Ethics
7. Father Leo Booth, When God Becomes A Drug
8. Robertson Smith, Religion of the Semites
9. Jevons, An Introduction to the History of Religions, 1896
10. Bible
11. Marret, Threshhold of Religion
12. J. Caird, Introduction to the Philosophy of Religion
13. *Insights to Islamic Beliefs for non-Muslims-Published by the Muslim* Converts Association of Singapore, April 1997
14. The Eternal Quest
15. Buddha and Early Buddhism
16. Aryan Sun-Myths
17. Sacred Origins of Profound Things-Published by Penguin Group, USA, 1996
18. AL. Basham, The wonder that was India, Rupa & Co. 1995, New Delhi
19. Discovery of India, Signet Press, Calcutta, 2nd edition, August 1946
20. Legacy of Islam, Edited by Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume
21. `Imperialism'-by Michael Parenti in `Encyclopedia of Government and Politics, Vol.2
22. Karl Marx, The British Rule in India, Volume-1, Moscow
23. Karl Marx's article in `NewYork Daily Tribune', Published on 8 August, 1853)।
24. Lucian W. Pye, `South-east Asia's Political Systems', NewJersey, 1967
25. Hans J. Morgenthu, Military Illusions : The New Republic, Washington D.C. March 19, 1956

Dhaka University Institutional Repository

26. Rupert Emerson, Representative Government in South-East Asia, Cambridge, Harvard University Press, 1955
27. Bangladesh Document, Karachi : Government of Pakistan, Ministry of External Affairs, n.d., Vol.-1
28. G.G.M. Badruddin, Election Handbook 1970, Karachi, 1970
29. Peter Hazelhurst, The Times, London, 4 June, 1971
30. G.W. Chowdhury, The Last Days of United Pakistan, University of Western Australia Press, 1974
31. Kabir Uddin Ahmed, Breakup of Pakistan : Background and Prospects of Bangladesh, London, Social Science Publishers, 1972
32. Tamonash Chandra Dasgupta, `Aspects of Bengali Society From Old Bengali Literature' in Journal of the Department of Letters, University of Calcutta, Vol. XIV, Calcutta, 1927
33. Muhammad Enamul Huq, A History of Sufism in Bengal, Dhaka 1975
34. Bipan Chandra, Communalism in Modern India, Bikash Publishing, New Delhi, 1984
35. Keneth Jones, Communalism in the Panjab, Journal of Asian Studies, 28 (1978)
36. Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India : A Social Analysis, London, 1945
37. Donald Ugin Smith, India As A Secular State, Princeton, 1963
38. Orient Longman, NewDelhi, 1974
39. Gopalkrisna, Religion in Politics, Indian Economic and Social History Review, December, 1971
40. G. R. Thrasbi, Hindu-Muslim Relations in British India, E.J. Bril, Leyden, 1975
41. A.K.Vokil, Three Dimensions of Hindu-Muslim Relations, Minarva Associates, Colculla, 1981
42. Islam, Politics and the States : The Pakistan Experience, Edited by Mohd. Asghar Khan, Published by Zed Books, London ।
43. Ekbal Ahmad, *Islam, Politics and the States* : The Pakistan Experience, Edited by Mohd. Asghar Khan, Published by Zed Books, London ।
44. The Writings of Ashmawy, University Press of Florida, USA, 1998 ।
45. Islam in Asia, Edited by John L. Esposito, Oxford University Press, 1987
46. Islam in Modern History, Amentor Book, 1957
47. Legacy of Islam, Edited by Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume
48. Science of Religion, Muller

Dhaka University Institutional Repository

49. Islam, Politics and the States : The Pakistan Experience, Edited by Mohd. Asghar Khan, Published by Zed Books, London
50. Marmaduke Pickthal, *Islamic Culture*
51. A Commentary of the Holy Bible : Rev. T.R. Dummelow
52. Encyclopaedia Britanica

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর বই এবং প্রবন্ধ

১। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পল্লব পাবলিশার্স, আগস্ট ১৯৮৯, ঢাকা।
২। রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অনন্যা প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৯, ঢাকা।
৩। ড. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ডিসেম্বর ১৯৯৪, ঢাকা।
৪। মওলানা আবদুল আউয়াল, জামাতের আসল চেহারা, ডিসেম্বর ১৯৮৮, ঢাকা।
৫। ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আষাঢ় ১৩৭৯
৬। তরজমানুল কোরআন, ১৯৩৪, ডিসেম্বর সংখ্যা
৭। জামায়াতে ইসলামী প্রচার পুস্তিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
৮। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় প্রচারপত্র
৯। পাঁচদলের ঘোষণা ও কর্মসূচি, ৩ জানুয়ারী ১৯৮৭
১০। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর গঠনতন্ত্র, ডাইনামিক প্রেস, ঢাকা।
১১। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর গঠনতন্ত্র, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯৭
১২। এস, সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, ঢাকা, ২০০৪
১৩। ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা, সা'দ উল্লাহ্, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০০, ঢাকা
১৪। মারেফতের গোপন কথা, ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বাঈমান আল সুরেশ্বরী
১৫। ধর্ম দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
১৬। কুরআন শারীফ, অনুবাদ-মাওলানা মোবারক করীম জওহর, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৪
১৭। শিশুভারতী
১৮। যাত্রাপুস্তক
১৯। ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস
২০। জীবনদর্শনের পুনর্গঠন, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।
২১। দ্রোণ
২২। মহাভারতের কথা, বুদ্ধদেব বসু
২৩। মতিউর রহমান নিজামী, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ২য় সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩
২৪। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, সিয়াসী কাশমকাশ
২৫। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, নজরুল ইসলাম, শারদীয় আজকাল, ১৪০২ সাল, ১৯৯৫ খ্রি:।
২৬। শরৎ সাহিত্য সমগ্র, সুকুমার সেন সম্পাদিত।
২৭। সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট, কংকর সিংহ

Dhaka University Institutional Repository

২৮। মওলানা মওদুদী কি তাহরীকে ইসলামী
২৯। মাকাতিবে জিন্দান
৩০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
৩১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯
৩২। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামের জীবন পদ্ধতি, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০২
৩৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮০
৩৪। ইতিহাসের সন্ধানে, সালাহউদ্দীন আহমদ, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৫
৩৫। রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত 'আবদুল হাকিম রচনাবলী', ঢাকা, ১৯৮৯
৩৬। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৫
৩৭। আমাদের জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশী না বাঙালী, রুহুল আমিন, সূচনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ, ঢাকা, ২০ অক্টোবর, ১৯৯২
৩৮। ছাত্রবোধ অভিধান, আশুতোষ দেব সংকলিত, ১৯৩৯
৩৯। গুয়ানতানামোয় বন্দী নির্যাতন এবং জর্জ বুশ, মাহমুদ হাসান, সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৭, ১৯ এপ্রিল, ২০০৫।
৪০। উপনিষদ, আবদুল আযীয আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা।
৪১। গৌতম নিয়োগী, ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িককতা, জুন ১৯৯১, কলিকাতা
৪২। মহানবী, ডঃ ওসমান গণি, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা
৪৩। ৯/১১ : চার বছরে কত নিরাপদ বিশ্ব?, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), দৈনিক প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।
৪৪। মাওলানা উবায়দুর রহমান খান, 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহ্‌কে দেখেছি', কিতাব কেন্দ্র, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
৪৫। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী হুমকির ব্যাপারে সাবধান, অ্যান্থনি পল, সিনিয়র রাইটার, দি স্ট্রেইটস টাইমস, ভাষান্তর : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ ২০০৫
৪৬। ৯/১১ : চার বছরে কত নিরাপদ বিশ্ব?, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), দৈনিক প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫।
৪৭। খেলাফত ও রাজতন্ত্র, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, অনুবাদ-জি এস সিদ্দিকী, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩, ঢাকা।
৪৮। সাহাবা চরিত-১, অনুবাদ-আখতার ফারুক, ইসলাম ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ১৯৭৭।
৪৯। বাংলাদেশের রাজনীতির চারদশক, এস, সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা
৫০। *ইসলাম শান্তির ধর্ম, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির নয়,* ডঃ আ ন ম রইছ উদ্দিন, দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০০৬।
৫১। দৈনিক ব্যাংকক পোস্ট-এর ৯ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের পোস্ট-এডিটোরিয়াল, রচনা : মাহাথির মোহাম্মদ, সৌজন্যে : সাপ্তাহিক যায়যায়দিন, বর্ষ ২২ সংখ্যা ০৯, ০৬ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ: ৩০।
৫২। মক্কা ঘোষণা, সন্ত্রাস দমন এবং কিছু কথা, মোস্তফা কামাল, দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক সংবাদপত্র/সাপ্তাহিকী

দৈনিক প্রথম আলো

১। ১৮ অক্টোবর, ২০০৫, পৃঃ ২
২। ১৯ আগস্ট ২০০৫
৩। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫।
৪। ১৮ অক্টোবর ২০০৫
৫। ১৮ অক্টোবর, ২০০৫।
৬। ২৩ জুন ২০০৩।
৭। ১৯ আগস্ট ২০০৫।
৮। ২৯ জুলাই, ২০০৪।
৯। ১৯ আগস্ট ২০০৫।
১০। ১৮ অক্টোবর, ২০০৫।
১১। ১৪ আগস্ট, ২০০৫।
১২। ১৯ আগস্ট ২০০৫।

দৈনিক ইত্তেফাক

১। ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১
২। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০
৩। ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১
৪। ৩০ জানুয়ারী, ১৯৯১
৫। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দৈনিক সংবাদ

১। ১ জুন, ১৯৮১
২। ৯ এপ্রিল, ২০০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

১। ৪ মে ১৯৯৭
২। ১০ জুলাই, ১৯৯৪

দৈনিক পাকিস্তান

১। ৭ এপ্রিল, ১৯৭১
২। ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১

দৈনিক বাংলা

১। ১১ জানুয়ারী, ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ভোরের কাগজ
১। ৩ মে ১৯৯৭।

দৈনিক ইনকিলাব
১। ৫ জানুয়ারী, ১৯৮৮

সাপ্তাহিক যায়যায়দিন
১। বর্ষ ২২, সংখ্যা ১২, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫।
২। বর্ষ ২২, সংখ্যা ১০, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।
৩। বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৩, ০৩ জানুয়ারী, ২০০৬।
৪। বর্ষ ২১, সংখ্যা ৪১, ২৬ জুলাই ২০০৫।
৫। বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ, ২০০৫।
৬। বর্ষ ২২, সংখ্যা ০৬, ১৫ নভেম্বর ২০০৫
৭। বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ, ২০০৫।
৮। বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫।
৯। বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪৫, ২৩ আগস্ট, ২০০৫।
১০। বর্ষ ২২ সংখ্যা ৯, ০৬ ডিসেম্বর, ২০০৫।
১১। বর্ষ ২১ সংখ্যা ১২, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৪।
১২। বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫।
১৩। বর্ষ ২১ সংখ্যা ২০, ০১ মার্চ ২০০৫।
১৪। বর্ষ ২২ সংখ্যা ০১, ০৪ অক্টোবর ২০০৫।
১৫। বর্ষ ২২ সংখ্যা ০১, ০৪ অক্টোবর ২০০৫।
১৬। বর্ষ ২১ সংখ্যা ২২, ১৫ মার্চ, ২০০৫।
১৭। বর্ষ ২২ সংখ্যা ৯, ০৬ ডিসেম্বর, ২০০৫।
১৮। বর্ষ ২১ সংখ্যা ০৩, ১৯ অক্টোবর ২০০৪।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা
১। ১৭ জানুয়ারী, ১৯৮৬

The Bangladesh Observer
1. January 29, 1991

The Pakistan Times
১। 22 December, 1970

Pakistan Observer
1. 17 February, 1971

Dhaka University Institutional Repository

The Times, London
1. 17 August, 1971

Newsweek
1. 16 March, 2005

Far Eastern Economic Review (Hongkong)
1. March 14, 1991), p. 12

যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে

১। মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।
২। মুফতি ইজাহারুল ইসলাম, আমীর, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (ইজাহারুল ইসলাম)।
৩। সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী, সভাপতি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন।
৪। আলহাজ্ব জমির আলী, সভাপতি, মুসলিম লীগ (জমির আলী)।
৫। মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৬। মোঃ শেহাবউদ্দিন খান, পরিচালক (পরিকল্পনা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
৭। মোঃ শেখ আলাউদ্দিন, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান।
৮। মোঃ আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কক্সবাজার।
৯। মোঃ হারুনউজ্জামান ভুঁইয়া, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কক্সবাজার।
১০। মোঃ তাহসিনুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা (Questionnaire)

প্রশ্নমালা-১

(রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য)

১. আপনার প্রতিষ্ঠান/রাজনৈতিক দলের নাম কি?

২. আপনার প্রতিষ্ঠান/রাজনৈতিক দল গঠনের কারণ কি?

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আপনার দলের মূল্যায়ন কি?

৪. ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

৫. বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রয়োজন আছে কি?

৬. বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কোন প্রভাব আছে কি?

৭. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে কোন শ্রেণী ও পেশার অংশগ্রহণ সর্বাধিক?

৮. কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সর্বাধিক?

৯. বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি?

১০. বাংলাদেশ ও বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

১১. সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ সম্পর্কে আপনার দলের মূল্যায়ন কি?

১২. বর্তমান বিশ্বের ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাস সম্পর্কে আপনার দলের বক্তব্য কি?

১৩. বাংলাদেশের বর্তমান ধর্মভিত্তিক সহিংসতার জন্য কারা দায়ী বলে মনে করেন?

১৪. জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ ও অন্যান্য গুপ্ত সন্ত্রাসী সংগঠন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

১৫. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কোন বিরোধ আছে কি?

১৬. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের নেপথ্যে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা আছে কি?

১৭. বাংলাদেশের বর্তমান ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের নেপথ্যে কি কি কারণ আছে বলে মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

১৮. আপনি কি মনে করেন ধর্মীয় সহিংসতা ও জঙ্গীবাদের পেছনে ধর্মের কোন সমর্থন আছে?

১৯. বাংলাদেশ ও বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আবেদন কি হ্রাস পেয়েছে?

২০. বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনার দলের অবস্থান ও ভূমিকা কি?

২১. ধর্মের সন্ত্রাসবিরোধী বক্তব্য প্রচার ও প্রসারে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা (Questionnaire)

প্রশ্নমালা-২

(সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য)

১. আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কি?

২. আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনার অবস্থান কি?

৩. বাংলাদেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি?

৪. প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের মতবিনিময়ভিত্তিক কার্যক্রমে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি?

৫. ধর্মভিত্তিক সহিংসতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আছে কি?

৬. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের পেছনে অর্থের জোগানদাতা হিসেবে কাউকে শনাক্ত করা গেছে কি?

৭. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের পেছনে অস্ত্রের জোগানদাতা হিসেবে কাউকে শনাক্ত করা গেছে কি?

৮. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের পেছনে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা আছে কি?

৯. বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসের পেছনে কোন শ্রেণী ও পেশার অংশগ্রহণ সর্বাধিক?

১০. আপনি কি মনে করেন ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূলে ধর্মের যথাযথ জ্ঞান ও অনুশীলন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে?

১১. ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূলে অরাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

১২. ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

১৩. ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূলে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

১৪. ধর্মের সন্ত্রাসবিরোধী বক্তব্য প্রচার ও প্রসারে সরকার কি ভূমিকা পালন করতে পারে?